আত্মদীপ

ISSN: 2454–1508
DOI Prefix: 10.69655

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-১, সংখ্যা-২, নভেম্বর, ২০২৪

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

https://www.atmadeep.in/

Volume-I, Issue-II
November, 2024

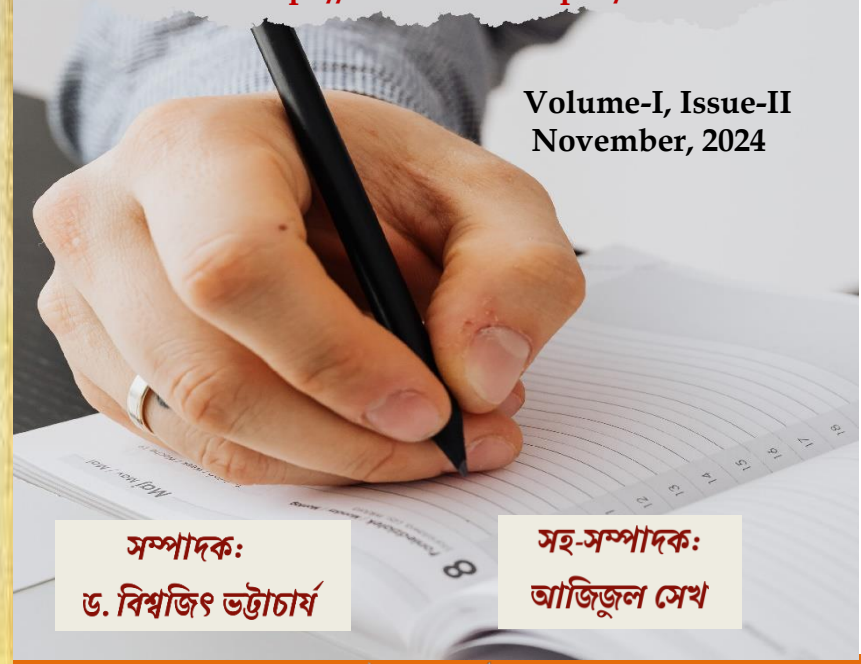

সম্পাদক:
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক:
আজিজুল সেখ

UTTARSURI
Published by:
UTTARSURI
Sribhumi (Karimganj), Assam, India

ATMADEEP
OPEN ACCESS
Crossref
doi

আত্মদীপ

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-১, সংখ্যা-২

নভেম্বর, ২০২৪

সম্পাদক

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক

আজিজুল সেখ

প্রকাশক:

উত্তরসূরি

শ্রীভূমি (করিমগঞ্জ), আসাম, ভারত

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024

Published by:
Uttarsuri, Sribhumi (Karimganj), Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/
Email: editor@atmadeep.in

Editor-in-Chief
Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Associate Editor
Azizul Sekh

Printed at:
Scholar Publications
Sribhumi (Karimganj), Assam, India, 788710

Cover Page:
Bishwajit Bhattacharjee

Price: Rs. 500.00

© Uttarsuri

The views and contents of this Journal are solely of the authors. This Journal is being sold on the condition and understanding that its contents are merely for information and reference and that neither the author nor the publishers, Printers or Sellers of this Journal are engaged in rendering legal, accounting or other professional service.
The publishers believe that the contents of this Journal do not violate any existing copyright/intellectual property of others in any manner whatsoever. However, in the event the author has been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.
Atmadeep, is a Bi-monthly electronic & Print journal of open Access Category. The Readers do not need to pay/register themselves to read and download the articles in the journal. However, it is only for scholarly/academic purpose that is non-commercial. Users while using excerpts from Atmadeep, must cite the author, content and the journal by including the link of the content. Individuals/ Companies/ Organizations intending to use contents from Atmadeep, for commercial purpose must contact the Editor-in-Chief.

Editorial Board

Advisor

Dr. Tapadhir Bhattacharjee
Former Vice-Chancellor, Assam University, Silchar, Assam
President, Uttarsuri, Karimganj, Assam
Mo: +919435566494

Dr. Nirmal Kumar Sarkar
Former Associate Professor, Karimganj College, Karimganj, Assam
Vice-President, Uttarsuri, Karimganj, Assam
Mo: +919435375599

Editor-in-Chief

Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Asst. Professor, Karimganj College
Karimganj, Assam, 788710
Mo: +919435750458, +917002548380
Email: bishwajit@karimganjcollege.ac.in

Associate Editor

Azizul Sekh
Research Scholar, Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura
Mo: +919126261414
Email: azizul.bengali@tripurauniv.ac.in

Editorial Board Member:

Dr. Debasish Bhattacharjee
Professor & Head, Dept. of Bengali
Assam University, Silchar
Email: debashish.bhattacharya@aus.ac.in

Dr. Rupasree Debnath
Assistant Professor, Department of Bengali
Gauhati University, Assam, India
Email: rupasree@gauhati.ac.in

Dr. Malay Deb
Assistant Professor, Dept. of Bengali
Tripura University, Tripura, India
Email: malaydeb@tripurauniv.ac.in

Dr. Madhumita Sengupta
Asst. Professor, Dept. of Bengali
Arya Vidyapeeth College, Guwahati, Assam, India
Email: madhumita.sengupta@avcollege.ac.in

Dr. Debjani Bhowmick (Chakraborty)
Associate Professor, Dept. of Bengali,
Sripat Singh College, Murshidabad, West Bengal, India
Email: dbhowmick@sripatsinghcollege.edu.in

Romana Papri
Lecturer, Department of Pali and Buddhist Studies
University of Dhaka, Bangladesh
Email: romanapapri@du.ac.bd

Dr. Rajarshi Chakrabarty
Assistant Professor, Dept. of History
University of Burdwan, West Bengal, India
Email: rchakrabarty@hist.buruniv.ac.in

Dr. Mumit Al Rashid
Associate Professor and chairman
Department of Persian Language and Literature
University of Dhaka, Bangladesh
Email: mumitarashid@du.ac.bd

Dr. Barnali Bhowmick Ghosh
Associate Professor and HOD
Department of Bengali
Bir Bikram Memorial College, Agartala, Tripura

প্রথম পর্ব, প্রথম সংখ্যায় যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে

১। **সেলিম মুস্তাফার কবিতায় কবি সত্তার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব**
শান্তনু ভট্টাচার্য, **৮-২০**

২। **বাংলা কবিতায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিভাবনার স্বতন্ত্রতা: বিষয়ে ও আঙ্গিকে**
দেবপ্রসাদ গোস্বামী, ২১-৩৬

৩। **হাইডেগারের দর্শনে Dasein: একটি সমীক্ষা**
আসলাম মল্লিক, ৩৭-৪৭

৪। **শোষণে এবং বৈষম্যে চা-বাগানের নারী: নির্বাচিত গল্পের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা**
আজিজুল সেখ, ৪৮-৫৮

৫। **অনুরূপা বিশ্বাসের 'নানা রঙের দিন': অব্যক্ত ইতিহাসের গ্রন্থিমালা**
ড. মধুমিতা সেনগুপ্ত, ৫৯-৭২

৬। **দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার দর্পণে ১৯৪২-৪৩ সালের কাঁথির দুর্ভিক্ষ**
মৌসুমী খাতুন, ৭৩-৮৪

৭। **ভাষাচার্য সুনীতিকুমার: একটি আলোকিত জীবন**
ড. দেবযানী ভৌমিক (চক্রবর্তী), ৮৫-৯৩

৮। **মল্লিকা সেনগুপ্তের সীতায়ন: নারী ভাবনার নবতর ভাষ্য**
ড. অরূপা চক্রবর্তী, ৯৪-১০১

৯। **কোশলরাজ প্রসেনজিত ও বৌদ্ধধর্ম**
রোমানা পাপড়ি ও শিরীন আক্তার, ১০২-১১৫

১০। **দেবেশ রায়ের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উপন্যাসের চ্যারকেটু চরিত্র: নিম্নবর্গীয় চরিত্রের আধারে একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন**
জানকী প্রসাদ দেবনাথ, ১১৬-১২৯

১১। **প্রকৃতি সচেতনতা ও পরিবেশ ভাবনা: আসামের ছোটগল্পে**
নয়ন দে, ১৩০-১৪৪

১২। **অমিতাভ দেব চৌধুরীর গল্পে দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িকতা**
প্রিয়াংকা ধর ও ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, ১৪৫-১৫৯

১৩। **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ভুবন: প্রতিবাদ ও নির্বাসিতের প্রতিবেদন**
অমিত দেব, ১৬০-১৭২

১৪। **মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে নিম্নবর্গ তথা অন্ত্যজ আদিবাসীদের বয়ান**
অনুরাধা দাস, ১৭৩-১৮৮

সূচিপত্র

Editorial Board		**ঈ-উ**
প্রথম পর্ব, প্রথম সংখ্যা: সূচিপত্র		**ঊ**
সম্পাদকীয়		**ঐ**
১।	**ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান** অঙ্কুর দেববর্মা	১৮৯-২০২
২।	**রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আদলে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা'** ড. দেবযানী ভট্টাচার্য্য	২০৩-২২১
৩।	**'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এর শকুন্তলা ও 'বীরাঙ্গনা'র শকুন্তলার তুলনাত্মক পর্যালোচনা** জয়দেব পাল	২২২-২৩৫
৪।	**ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলা ভাষা** মো: রিপন মিয়া	২৩৬-২৫৪
৫।	**জহির রায়হানের গল্প: রাজনৈতিক চেতনার বিপ্রতীপে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বিবর্ণ দিনলিপি** ড. প্রতাপ ব্যাপারী	২৫৫-২৭৫
৬।	**বাণী বসুর অন্তর্ঘাত: 'ময়না তদন্তের হ্যাজাক আলোকে'** ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী	২৭৬-২৯৩
৭।	**কাকদ্বীপের ভাষা** রিক্তা সরদার	২৯৪-৩০৫
৮।	**সংখ্যার উদ্ভব ও সংখ্যা পদ্ধতির বিবর্তন** মো. তাহমিদ রহমান	৩০৬-৩২৮
৯।	**কাজী নজরুল ইসলামের 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' : প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার সমন্বয়** তাপস মণ্ডল	৩২৯-৩৩৯

১০। **হুমায়ূন আহমেদের 'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসের মনঃসমীক্ষণাত্মক সমালোচনা**
ড. প্রসেনজিৎ দাস ৩৪০-৩৫১
১১। **কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারের নির্বাচিত ছোটগল্পে রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা** ৩৫২-৩৬৯
মাসুদ আলী দেওয়ান
১২। **অশরীরী চিন্তা-চেতনায় শীর্ষেন্দুর কিশোর উপন্যাস: ভূত ও মানুষের পারস্পারিকতায় এক স্বতন্ত্র মাত্রা** ৩৭০-৩৮১
নমিতা হালদার
১৩। **ঔপনিবেশিক আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক একটি পর্যালোচনা** ৩৮২-৩৯৯
মেহেবুব হোসেন
১৪। **বেলা বসুর 'স্মৃতিপট': নারীশিক্ষা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং সমকাল** ৪০০-৪১২
পর্ণা মণ্ডল
১৫। **দিনাজপুরের গ্রামীণ সমাজে মনোহলী জমিদারির সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা** ৪১৩-৪২৪
সুরাট সরকার ও কামানুজ্জামান
১৬। **বাউল মতাদর্শ: উৎস, বিকাশ ও সাধক-শিল্পীদের অবদান** ৪২৫-৪৩৬
নিরঞ্জন মণ্ডল
১৭। **ভারতবর্ষের নাট্য-ঐতিহ্যে থার্ড থিয়েটার**
প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী ৪৩৭-৪৪৪
১৮। **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আখ্যানের বিনির্মাণ**
ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন ৪৪৫-৪৫৫
Guidelines, Review Process & Publication Ethics ৪৫৬-৪৫৭
Publication Charge ৪৫৮

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষায় উত্তরসূরি থেকে প্রকাশিত এটি প্রথম গবেষণামূলক পত্রিকা। এই পত্রিকায় শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখা প্রকাশিত হবে এমন নয়, বাংলাতে লেখা যে কোনো গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে। পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় যারা লেখালেখি করছেন এবং গবেষণা করছেন তাদের একটি লেখার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়া। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গবেষণামূলক জার্নালের সংখ্যা খুব একটা নেই। প্রিন্টেড জার্নাল কিছু থাকলেও তা সহজলভ্য নয় এবং সেখানে প্রকাশ করাও খুব কঠিন। আত্মদীপ অনলাইন এবং প্রিন্ট দুভাবেই প্রকাশিত হবে তাই গবেষক এবং লেখকদের এক্ষেত্রে অনেকটাই সাহায্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদক মন্ডলীর উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রেও আমরা সবার সম্পূর্ণ সহায়তা পেয়েছি। ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে যারা লেখা দিয়েছেন এবং সম্পাদক মন্ডলীতে আমদের ডাকে সাড়া দিয়ে যোগ দিয়েছেন প্রত্যেকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জার্নালে বর্তমানে প্রিন্ট ISSN রয়েছে, খুব শীঘ্রই অনলাইন ISSN এর আবেদন করা হবে। প্রতিটি প্রবন্ধ DOI সহ প্রকাশিত হয়েছে, যা এই প্রবন্ধটির স্থায়ী ওয়েব ঠিকানা হয়ে থাকবে। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও সবার সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য
সম্পাদক

আজিজুল সেখ
সহ-সম্পাদক

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 189-202
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.015

ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান

অঙ্কুর দেববর্মা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাঞ্চনপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়, কাঞ্চনপুর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত

Received: 13.10.2024; Accepted: 25.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Tripura is a historically significant region, and texts related to the Chronicle of the Tripura Kingdom testify to its ancient roots. The Chronicle of the Tripura Kingdom is primarily written in Bengali and Sanskrit. Some literary critics believe that one version of the chronicle, called 'Rajabali,' is the earliest extant work of Bengali literature, predating the 'Charyapada,' and that it was written in prose. The Sanskrit version of the chronicle, called 'Rajratnakar,' is also considered one of the oldest works of literature. One of the Bengali versions of the chronicle is titled 'Rajmala,' which is believed to have been written in the mid-15th century. Critics like Sukumar Sen and Dinesh Chandra Sarkar have expressed the view that the Bengali version of 'Rajmala' was not written before the 18th century. There are various versions of 'Rajmala,' written at different times under the patronage of different kings, which leads to some ambiguity about its exact composition. Many scholars have shared differing opinions regarding the composition period of the 'Rajmala' chronicle. This research paper aims to discuss the Bengali and Sanskrit versions of the texts related to the Chronicle

of the Tripura Kingdom, examining their composition periods and their historical accuracy.

Keyword: Tripura, Rajmala, Rajratnakar, Rajabali, chronicle of Tripura kingdom, ambiguity, truthiness.

ত্রিপুরা একটি প্রাচীন জনপদ। ত্রিপুরার রাজাদের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থগুলি ত্রিপুরার প্রাচীনতার সাক্ষী বহন করে আসছে। বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সন্দর্ভে মূলত সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় রচিত ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান করা হয়েছে। ইতিবৃত্তমূলক যে গ্রন্থগুলির নাম এক্ষেত্রে উঠে এসেছে সেগুলি হলো- রাজাবলী, রাজমালিকা, রাজমালা, সংস্কৃত রাজমালা, রাজরত্নাকর প্রভৃতি।

ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক প্রথম গ্রন্থ হিসেবে 'রাজাবলী'র নাম জানা যায়। যদিও এর কোন পুঁথি যেমন মেলে নি তেমনি এর অস্তিত্বের অন্য কোন সুদৃঢ় প্রমাণও পাওয়া যায় নি। 'শ্রীরাজমালা'র (১৯২৬-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত) সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনের উক্তিতে 'রাজাবলী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর মতে "কোন কোন রাজবংশের ইতিহাস 'রাজাবলী' নামে পরিচিত। শেষোক্ত নামে ত্রিপুরায়ও এক প্রাচীন ইতিহাস ছিল, তাহা আটশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এখন সেই গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।"[১] তিনি এও দাবী করেন যে-

> "এতকাল উক্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষার আদি গ্রন্থ বলিয়া কীর্তিত হইতেছিল।"[২]

'রাজাবলী' গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে তিনি প্রমাণস্বরূপ রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩ খ্রি:) গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। যদিও রামগতি ন্যায়রত্ন উক্ত গ্রন্থে কোথাও বলেন নি যে এটি বাংলা সাহিত্যের 'আদি গ্রন্থ'। 'রাজাবলী' গ্রন্থ সম্পর্কে রামগতি ন্যায়রত্নের মত-

> "শুনিতে পাওয়া যায়, ত্রিপুরার রাজাবলী ও রামরামবসুর প্রণীত প্রতাপাদিত্য-চরিত, এই দুইখানি গদ্যগ্রন্থ ঐকালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল - কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহার একখানিও দেখিতে পাওয়া গেল না...।"[৩]

তিনি বাংলা সাহিত্যের আলোচনাকালে সাহিত্যকে আদিকাল, মধ্যকাল এইভাবে ভাগ করেছিলেন। উদ্ধৃতিটিতে 'ঐকালের' বলতে মধ্যকালের কথা বলতে চেয়েছেন।

ত্রিপুরার রাজাদের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তমূলক আদি গ্রন্থ হিসেবে 'রাজাবলী'কে যারা মান্যতা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রাবন্ধিক সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর 'ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন,

> "সাহিত্যক্ষেত্রে ত্রিপুরার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজাবলী'। বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুরার দ্বিতীয় অবদান একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান'।"[৪]

উদ্ধৃতিটিতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে লেখক এখানে 'রাজাবলী'কে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ববর্তী রচনা বলে উল্লেখ করতে চাইছেন। কিন্তু মতামতটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। নৃতাত্ত্বিক দিক বিচারে ত্রিপুরার রাজারা অনার্য শ্রেণীভুক্ত। এই অনার্য রাজবংশের ইতিবৃত্ত একাদশ শতাব্দীর সমসাময়িক বাংলা ভাষায় লেখা হচ্ছে, যে ভাষা কিনা সদ্য মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নিজরূপ ধারণ করছিল মাত্র, তাও আবার গদ্যের আকারে, এই বিষয়টি ভাবা কষ্টকল্পিত। বাংলা ভাষা চর্চার তথাকথিত মূলভূমি অখণ্ড বাংলায় যেখানে গদ্যের আকারে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয়েছে সেখানে একাদশ শতাব্দী কিংবা তারও পূর্বে বাংলা গদ্যের আকারে ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ লেখা হচ্ছে – এই মতটি যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনাকল্পে ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য আহরণের জন্য ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২৩ বৈশাখ তৎকালীন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের (জন্ম- ১৮৩৯ খ্রি:- মৃত্যু ১৮৯৬ খ্রি:) সমীপে চিঠি লিখেন। প্রত্যুত্তরে মহারাজা যে চিঠি লিখেন সেখানে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ 'রাজরত্নাকর' এবং বাংলা ভাষায় রচিত 'রাজমালা' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই চিঠিতে তিনি লিখেন-

> "'রাজরত্নাকর' নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম-মাণিক্যের রাজত্ব সময়ে সংকলিত হইতে আরম্ভ হয়। ...উক্ত রাজরত্নাকরে আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত

> ভাষায় লিখিত 'রাজমালা'র উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই প্রাচীন রাজমালা এখন কোথাও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। রাজমালা বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত এবং বাংলা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় 'রাজমালা' রচিত হইয়াছে।"[৫]

উক্ত ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৪৩১-১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ তারও পূর্বে 'রাজমালা' নামাঙ্কিত আরেকটি সংস্কৃত রাজমালা ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। উদ্ধৃতাংশে 'দ্বিতীয় রাজমালা' বলতে তিনি বাংলা 'রাজমালা'র কথা বলতে চাইছেন বলে মনে হয়, যা নাকি তাঁর বয়ানে সংস্কৃত 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এ প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সেনের মতামতটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

> "(রাজাবলী ব্যতীত) ত্রিপুরার অন্য প্রাচীন ইতিহাসের নাম 'রাজ-রত্নাকর'। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতায় দুইখানা গ্রন্থ রচিত হয়, উক্ত উভয় গ্রন্থের নাম 'রাজমালা'।... এতদ্বারা জানা যায় যে, চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্র এবং পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কর্তৃক রাজ-রত্নাকর রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা রাজমালাও মহারাজ ধর্মমাণিক্যের অনুজ্ঞায় ইঁহারাই রচনা করেছিলেন, সুতরাং রাজরত্নাকর এবং রাজমালা সমসাময়িক গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। তবে, রাজরত্নাকর অগ্রে ও রাজমালা তাহার পরে রচিত হওয়া অসম্ভব নহে।"[৬]

আবার কালীপ্রসন্ন সেন 'শ্রীরাজমালা'র ১ম লহরের 'প্রস্তাবনা' অংশে 'রাজমালিকা' নামে আরেকটি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। সেই গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সেন পাদটীকায় যে তথ্যটি দেন তাতে করে ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক সংস্কৃত গ্রন্থের রচনা সংখ্যা আরো বেড়ে যায়-

> "এটি (রাজমালিকা) সংস্কৃত ভাষায় রচিত ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস। পণ্ডিত মুকুন্দ ১৬৭৪ শকে এই গ্রন্থের এক সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ করেছিলেন। এটি 'সংস্কৃত রাজমালা' নামে অভিহিত হয়েছে। মূল রাজমালিকা গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।"[৭]

সম্ভবত এই 'মূল রাজমালিকা'র কথা-ই মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য দুষ্প্রাপ্য আদি সংস্কৃত 'রাজমালা' বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন।

এইসকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাজাদের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বাংলা ভাষায় রচিত ধারাবাহিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের সন্ধানও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি মূলত 'রাজমালা' নামেই বিভিন্ন সময়ে রচিত হতে দেখা যায়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো -

১। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্ম-মাণিক্যের রাজত্বকালে চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্রের সহায়তায় পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কর্তৃক রচিত 'রাজমালা'।

১। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে রামনারায়ণ দেব দ্বারা অনুলিখিত চারখণ্ডে বিভক্ত 'রাজমালা'। এই রাজমালার মূল লেখক কিংবা মূল গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কিত কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। এর পুঁথিটি জনৈক মণীন্দ্র গাঙ্গুলী কোনও এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত পুঁথিটি ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার অধিকর্তার গোচরে নিয়ে এলে পর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার দ্বারা তা মুদ্রিত হয়।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংকলিত দুর্গামণি উজীরের 'রাজমালা'।

৩। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, গদ্যে লিখিত কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস'।

৪। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ৬ খণ্ডে মুদ্রিত 'রাজমালা'।

৪। ১৯২৬-৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'শ্রীরাজমালা' যা নাকি দুর্গামণি উজীরের 'রাজামালা'রই পরিবর্ধিত রূপ। তিনি মোট ৬টি লহরের পরিকল্পনা নিয়ে গ্রন্থটির সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। প্রথম তিনটি লহর সার্থকতার সাথে মুদ্রণের পর চতুর্থ লহরের পাণ্ডুলিপি রচনা করে তিনি লোকান্তরিত হন।

৫। ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা গদ্যে লিখিত ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজমালা'। এই বইয়ে তৎকাল পর্যন্ত রাজাদের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে রচিত এই সকল গ্রন্থগুলির রচনাকাল কিংবা রচনার উদ্দেশ্য দিয়ে মতদ্বৈধতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রাজমালা' উল্লেখ করা যায়। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্পাদিত রাজমালা সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সেন লিখেছেন-

> "...মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর রাজমালা প্রকাশের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এতদ্বিষয়ক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে রাজমালার প্রুফ কপিস্বরূপ অল্প সংখ্যক মূলগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল মাত্র। নানা কারণে তিনি এই কার্যে এতদতিরিক্ত অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। ... মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অকালে আকস্মিক পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে এইবার রাজমালার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, পণ্ডিত মহাশয় কার্য্যান্তরে যাইতে বাধ্য হন।"[৮]

অথচ কালীপ্রসন্ন সেনের সমসাময়িক ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত 'রাজমালা' গ্রন্থের 'পূর্বকথা' অংশে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের রাজমালা সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন–

> "রাধাকিশোর মাণিক্যের দরবার হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ কতৃক রাজমালা ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়।"[৯]

তাহলে এই গ্রন্থ সম্পাদনার কয়েকবছর পর বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৯০৯ খ্রি: - ১৯২৩ খ্রি:) কেন কালীপ্রসন্ন সেনকে আবার তা সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হলো? সে বিষয়ে ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত 'রাজমালা'র অন্তর্গত 'পূর্বকথা' অংশে লিখছেন-

> "...ঐতিহাসিক তথ্য সংযোজিত হইয়া রাজমালা গ্রন্থ সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায়...।"[১০]

সম্ভবত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্পাদিত 'রাজমালা'য় ঐতিহাসিক তথ্যের খামতি ছিলো কিংবা অন্য কোনও কারণবশত এই 'রাজমালা' সর্বসমক্ষে আনতে রাজবাড়ি কর্তৃপক্ষ রাজি ছিলেন না। তৎকালীন সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, যিনি ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত 'শিলালিপি সংগ্রহ'র (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ) মত গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই ব্যক্তির রচনায়

ঐতিহাসিক তথ্যের অনুপস্থিতি মনে সন্দেহ জাগায়। আসলে ঐ সময় রাজমালা সম্পাদনা নিয়ে কিছুটা রহস্য দানা বাঁধতে দেখা যায়, কেননা কালীপ্রসন্ন সেনের পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেও রাজমালা সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো এবং তিনি তা সম্পন্নও করেছিলেন (ত্রিপুরা এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, ১৩২৯ ত্রিং - ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তৎকালীন ত্রিপুরেশ্বর তা ছাপান নি। সম্ভবত ত্রিপুর রাজপরিবারের ঐতিহাসিকতা নিয়ে সন্দেহ করে কোনও কিছু লিখেছিলেন বলে এবং রাজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছানুযায়ী মতামত পোষণ করেন নি বলে। কালীপ্রসন্ন সেন তাঁর সম্পাদিত 'রাজমালা'র ১ম লহরের 'নিবেদন' অংশে কোথাও চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত 'রাজমালা' কিংবা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'রাজমালা'র থেকে সাহায্য নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন নি। তবে যাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন তাদের নামের এক দীর্ঘ তালিকার মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন, তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত অপ্রকাশিত 'রাজমালা'র নাম উল্লেখ না করলেও পরোক্ষে তা স্বীকার করে নিয়েছেন-

> "অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে কোনও কোনও বিষয়ে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি।"[১১]

এই অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রাজমালা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত 'রাজমালা' পূর্ণাঙ্গতা না পাওয়ার কারণ হিসেবে কালীপ্রসন্ন সেন প্রথম বলছেন যে 'নানা কারণে' এবং পরক্ষণেই বলছেন যে-

> "মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অকালে আকস্মিক পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে এইবার রাজমালার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।"[১২]

অন্যদিকে অমূল্যচরণ বিদ্যাবিনোদের 'রাজমালা' (অর্থাৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'রাজমালা') পূর্ণাঙ্গতা না পাওয়ার প্রসঙ্গে লিখছেন–

> "অমূল্যবাবু দীর্ঘকাল এই কার্য্যে ব্যাপৃঃত ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হইয়াছে।"[১৩]

উভয় রাজমালা সম্পাদনার ক্ষেত্রেই এই 'নানা কারণ' সন্ধানী আলোক নিক্ষেপের অপেক্ষা রাখে। এত বিদ্বজ্জনকে বাদ দিয়ে কালীপ্রসন্ন সেনকে রাজমালা সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়ায় তিনি নিজেও বিস্মিত হয়ে যান–

> "তখন ভ্রমেও ভাবি নাই, রাজমালা সম্পাদনার গুরুভার আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির হস্তে পতিত হইবে।"[১৪]

যদিও উক্তিটির মধ্য দিয়ে তাঁর বিনয়ভাবই প্রকাশিত হয়েছে তবুও তাঁর বিস্ময়-ভাব যে অমূলক নয়, বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে চর্চাকারী লেখকগণ আরো বেশ কিছু 'রাজমালা'র উল্লেখ করেছেন যা রীতিমত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যেমন – দুর্গামণি উজীর তাঁর সম্পাদিত 'রাজমালা'র চতুর্থ খণ্ডে লিখছেন–

> "পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত/প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত।"[১৫]

এই 'পুরাতন রাজমালা' বলতে তিনি কোন্ রাজমালার কথা বলছেন তা গবেষণা সাপেক্ষ। যদি প্রকৃত অর্থে ধর্মমাণিক্যের আমলে (রাজত্বকাল আনুমানিক ১৪৩১ খ্রি: – ১৪৬২ খ্রি:) প্রথম বাংলা রাজমালা রচিত হয় তাহলে এটি সেই পুঁথিও হতে পারে। তবে তার সম্ভাবনা কম কেননা দুর্গামণি উজির 'রাজমালা' রচনার পূর্বে অমরমাণিক্যের আমলে (১৫৭৭ খ্রি: - ১৫৮৬ খ্রি:) একবার 'রাজমালা' পরিবর্ধিত হয়েছিল। সেই 'রাজমালা'কেই সম্ভবত তিনি কুৎসিত বলে এর পরিমার্জনার প্রয়োজন অনুভব করে তার উপর হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এটি রামানারণ দেবের 'রাজমালা' হওয়ার সম্ভাবনাও কম কেননা এই রাজমালা 'অলগ্নিক' বা 'কুৎসিত' কোনও দোষেই দুষ্ট নয়। অমরমাণিক্যের আমলে 'রাজমালা' পরিবর্ধনের প্রসঙ্গে কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর রচিত 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখছেন যে, ১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস 'রাজমালা' পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর দ্বারা রচিত হয়েছিল যা দুষ্প্রাপ্য এবং মহারাজা অমরমাণিক্যের আমলে রাজমালা পরিবর্ধিত হয়েছিলো যা 'প্রাচীন রাজমালা' বলে খ্যাত।[১৬] রামনারায়ণ দেব নকলকৃত 'রাজমালা'য়ও অমরমাণিক্যের আমলে রাজমালা পরিবর্ধিত হওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় –

> "এই জদি রণচতুর নারায়ণে কৈল।

অমর মাণিক্য রাজা সন্তোষ হইল।।
পূর্ব্ব ২ নৃপতির সুনিলেক কথা।
দত্যখণ্ড পুথি তবে করিলেক গাঁথা।।
দুর্য্যখণ্ড বলিয়া পুস্তক নাম রাখে।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে।।"[১৭]

যদিও উদ্ধৃতিটির মধ্যে পরিবর্ধনের বিষয়টি ততটা স্পষ্ট নয়, বরং নতুন করে পুঁথি লেখার কথা উঠে আসছে। কৈলাসচন্দ্র সিংহ উদ্ধৃত 'প্রাচীন রাজমালা'কেই সম্ভবত দুর্গামণি উজীর 'পুরাতন রাজামালা' বলে উল্লেখ করে এর পরিমার্জনা করেছেন। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে প্রচলিত মতে ধর্মমাণিক্যের আমলে রচিত প্রথম বাংলা 'রাজমালা'র যে উপরিউক্ত লেখকদ্বয়ের মধ্যে কেউই সন্ধান পান নি তা বলা-বাহুল্য।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর গদ্যে রচিত 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর রচনার উৎস হিসেবে তিনটি 'রাজমালা'র পুঁথির কথা উল্লেখ করেছেন - প্রাচীন রাজমালা, সংক্ষিপ্ত রাজমালা ও সংস্কৃত রাজমালা। লক্ষণীয় যে তিনি 'রাজরত্নাকর' না বলে শুধু 'সংস্কৃত রাজমালা' বলেছেন, অথচ কালীপ্রসন্ন সেনের বয়ানে 'রাজরত্নাকর' অনেক প্রাচীন গ্রন্থ, মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে রাজেচ্ছায় তা কিছুটা পরিবর্ধিত হয়ে মুদ্রিত হয় শুধু। কৈলাসচন্দ্র সিংহ জানতে পারেন যে বীরচন্দ্র মাণিক্য (রাজত্বকাল- ১৮৬২ খ্রি:-১৮৯৬ খ্রি:) সংস্কৃতে লেখা ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তকে (অর্থাৎ রাজত্নাকর) নতুনভাবে পরিবর্ধন করে মুদ্রণের প্রয়াস নিয়েছেন যেখানে ইতিহাস বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই উষ্মাবশত ইচ্ছাকৃত ভাবে হয়তো 'রাজরত্নাকর' নামটি তিনি অনুল্লেখিত রেখেছেন কিংবা এও হতে পারে যে 'রাজমালিকা'র সংক্ষিপ্তরূপ 'সংস্কৃত রাজমালা'কেই বীরচন্দ্র মাণিক্য 'রাজরত্নাকর' বলে নামাঙ্কন করছেন এবং এই নামাঙ্কন কোনও প্রাচীন নাম নয়। এ বিষয়ে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার মূল কারণ রবীন্দ্রনাথকে লেখা বীরচন্দ্র মাণিক্যের চিঠির মধ্যেই নিহিত আছে। 'রাজমালিকা'র সংক্ষিপ্তরূপ 'সংস্কৃত রাজমালা' সম্পর্কে বীরচন্দ্র কেন কিছু উল্লেখ না করে শুধু 'রাজরত্নাকর'এর কথা বললেন! কালীপ্রসন্ন সেনের মত অনুযায়ী 'রাজরত্নাকর' যদি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা রাজমালার পূর্বে রচিত হয় তাহলে পরবর্তিকালে রচিত বাংলা

রাজমালা কিংবা অন্য কোনো গ্রন্থে 'রাজরত্নাকর' নামটির উনুল্লেখও মনে সন্দেহ জাগায়। আবার বীরচন্দ্রের চিঠির বয়ান অনুযায়ী 'দ্বিতীয় রাজমালা' অর্থাৎ দুর্গামণি উজীরের লেখা 'রাজমালা' যদি 'রাজরত্নাকরের' সংক্ষিপ্তসার হয় তাহলে তাতেই বা কেন 'রাজরত্নাকর' এর কথা উল্লেখিত নেই? এই প্রশ্নগুলি উঠে আসা স্বাভাবিক।

এবার আসা যাক কৈলাসচন্দ্র সিংহ কথিত 'সংক্ষিপ্ত রাজমালা' প্রসঙ্গে। রামনারায়ণ দেব অনুলিখিত 'রাজমালা'র সাথে যদি কৈলাসচন্দ্র সিংহের পরিচয় থাকে তাহলে 'সংক্ষিপ্ত রাজমালা' বলতে এই রামনারায়ণ দেবের 'রাজমালা'র কথা-ই বোঝানো হচ্ছে বলে মনে হয় কেননা দুর্গামণি উজীরের 'রাজমালা'র তুলনায় রামানারায়ণ দেবের 'রাজমালা'র কাহিনি অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। যদিও এ নিয়ে ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। প্রাবন্ধিক মৃণাল কান্তি দেবরায় কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও বীরচন্দ্র মাণিক্যের উক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 'সংক্ষিপ্ত রাজমালা' বলতে দুর্গামণি উজীর রচিত 'রাজমালা'র অখণ্ড সংস্করণকে বোঝানো হচ্ছে যার রচনাকাল ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ।[১৮]

উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও কৈলাস চন্দ্র সিংহ তাঁর রচিত গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে গোবিন্দমাণিক্য ও ছত্রমাণিক্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনাকালে আরো দুটো 'রাজমালা'র কথা উল্লেখ করছেন। এক্ষেত্রে গোবিন্দমাণিক্যের বংশধর ও ছত্রমাণিক্যের বংশধরের কাছে পৃঃথক পৃঃথক দুটো 'রাজমালা' রক্ষিত থাকার তথ্য তথা পক্ষপাতযুক্ত পাঠান্তরের কথাও তিনি বর্ণনা করেছেন (কৈলাসচন্দ্র সিংহ, 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস', অক্ষর পাবলিকেশন্স, আগরতলা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ- ৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য)। এই দুটো 'রাজমালা' রামানারায়ণ দেব অনুলিখিত 'রাজমালা' থেকে পৃঃথক কেননা রামনারায়ণ দেবের 'রাজমালা'য় গোবিন্দমাণিক্য কিংবা নক্ষত্ররায়কে নিয়ে আলোচনা সংক্ষিপ্ত। নক্ষত্ররায়কে নিয়ে শুধু একটি পঙ্কতির সন্ধান মিলে – 'ছত্রমাণিক্য রাজা কতদিন ছিল।"[১৯] এছাড়াও রাজমালার যে অনেক পুঁথি একসময় ত্রিপুরার রাজদরবারে কিংবা ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিলো তার প্রমাণ রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ত্রিপুরায় কর্মরত ইংরেজ কর্মচারী J.P wise এর মারফৎ তার ভাই Dr. T.S Wise 'রাজমালা'র একটি প্রতিলিপি এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠান। 'রাজমালা'র এই পুঁথি পাওয়ার পরই রেভ. জেমস লঙ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে 'Analysis of the

Bengali Poem Rajmala, or Chronicles of Tripura' নামে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রবন্ধ লেখেন। এই লেখা প্রকাশ পাওয়ার মাধ্যমে 'রাজমালা' সর্বপ্রথম বিদ্বজ্জন সমক্ষে চলে আসে। কালীপ্রসন্ন সেন 'রাজমালা' সম্পাদনার পর গ্রন্থটির 'নিবেদন' অংশে এক-জায়গায় লিখেন "রাজমালার পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে"। কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা তাঁর 'দেশীয় রাজ্য' (১৯২২ খ্রি:) প্রবন্ধের অন্তর্গত 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখছেন যে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী ১১টি পুরাতন রাজমালার পুঁথি পাঠের মাধ্যমে 'রাজমালা' সম্পাদনার কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলা 'রাজমালা' কবে নাগাদ প্রথম প্রথম রচিত হয়েছিল তা নিয়েও মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (১৯১৭ খ্রি:) প্রণেতা অচ্যুতচরণ চৌধুরীর মতে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে রাজমালা রচনা করেন। কৈলাস চন্দ্র সিংহও একই মত পোষণ করেছেন। আসলে ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালকে নিয়ে বিভ্রান্তি এই মতানৈক্যের অন্যতম কারণ। কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে '১৩২৯ শকাব্দে মহারাজ ধর্মমাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন।'[২০] কালীপ্রসন্ন সেন তাঁর 'রাজমালার প্রণেতাগণ' নামক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে ধর্মমাণিক্যের সময়কাল ১৪৩১-১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ এবং এই সময়কাল মধ্যেই প্রথম বাংলা 'রাজমালা' রচিত হয়। 'রাজমালা'র প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সেনের উক্তি - "বাঙ্গালা রাজমালার প্রথমাংশ যে পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন, এ বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলও একথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।"[২১] কিন্তু এই বিষয়ে আবার অনেক সমালোচকই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বাংলা রাজমালার রচনাকাল নিয়ে বিভিন্ন সমালোচকদের মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো -

১। Rev. James Long – The Raj Mala is a curiosity as presenting us the oldest specimen of Bengali composition extant, the first part of it having been compiled in the beginning of the 15th century, the subsequent portions were composed at a most recent date. We may consider this then as the most ancient work in Bengali that has come down to us. [২২]

২। কৈলাসচন্দ্র সিংহ, 'ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস' গ্রন্থ প্রণেতা শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখরা 'রাজমালা'র প্রাচীনত্বের কথা স্বীকার করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন দুর্গামণি উজীরের 'রাজমালা'র বয়ানকে অবিশ্বাস করেন নি। তিনি লিখেছেন – "প্রথমভাগের ইতিহাসভাগ সংস্কৃতে ছিলো – সে বৃত্তান্ত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রাজপণ্ডিতদ্বয় ভাষায় অনুবাদ করিতে স্বীকার করিলেন না। অগত্যা ধর্মমাণিক্য চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। ইনি ত্রিপুর ভাষায় রচিত ইতিহাস হইতে বাংলা করিয়া যে কাহিনি শুনাইলেন, তাহাই শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর বাংলা পয়ারে অনুবাদ করিয়া লইলেন।"[২৩]

৩। পুরাতত্ত্ববিদ দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে রাজমালা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত। তার মতের স্বপক্ষে তিনি রাজামালায় উল্লেখিত 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থটি যেহেতু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত সেহেতু 'রাজমালা' তার পরে রচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

৪। ভাষাচার্য সুকুমার সেন মনে করেন কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের আমলে (১৮২৯-১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ) দুর্গামণি উজীর অন্যকোনো গ্রন্থের সহায়তায় 'রাজমালা' লেখেন।

উপরে উল্লেখিত যেসকল বিদ্বজ্জন রাজমালার প্রাচীনত্বে সন্দিহান তার মধ্যে অধিকাংশই মূলত দুর্গামণি উজীর কৃত 'রাজমালা'কে অনুসরণ করেছেন। অপরপক্ষে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত 'রাজমালা'র পুঁথির মধ্যে রামনারায়ণ দেব দ্বারা নকলকৃত পুঁথিই প্রাচীন। যদিও এর কোনও খণ্ডের ভাষা-ই পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষার সম্ভাব্যরূপের সাথে মেলে না, অর্থাৎ যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত সেই রাজামালার পরিবর্ধিত রূপ, তাহলে এর উপর যে আধুনিকীকরণ কিংবা তথাকথিত পরিমার্জনের জন্য অনেক হস্তক্ষেপ হয়েছে তা বলাবাহুল্য। এই তথাকথিত পরিমার্জনের প্রবণতা যে ত্রিপুরায় ছিলো তার প্রমাণ আমরা দেখেছি দুর্গামণি উজির রচিত 'রাজমালা'র পরিবর্ধিত রূপের মধ্যে, যেখানে তিনি নিজেই পরিবর্ধনের কারণ হিসেবে বলছেন–

"পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত/প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত।"[২৪]

এতদসত্ত্বেও ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ হিসেবে রাজমালার প্রাচীনত্বকে অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই, কেননা ত্রিপুরার ইতিহাসে সাহিত্য, ইতিহাসচর্চা নতুন কিছু নয়। রাজ পৃঃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য কিংবা শিল্প সৃষ্টির পেছনে রাজবংশের স্থায়িত্ব, রাজতন্ত্রের তুলনামূলক স্থিতিশীলতাও একটি মূল ভূমিকা রাখে। সেক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজবংশ যে সুপ্রাচীন এবং তার যে একটি দীর্ঘকালের ইতিহাস আছে- বিশেষত ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে, সে কথা ত্রিপুরার বাইরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থেও প্রামাণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে মূল পুঁথি বা অন্য কোনও আদি পুঁথি কিংবা সে সম্পর্কিত নতুন কোনও তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজাদের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের রচনাকাল, রচয়িতা প্রভৃতি নিয়ে মতান্তর চলতে থাকাই স্বাভাবিক। একই গ্রন্থের বেশ কিছু পাঠান্তর, আবার তার উপর হস্তক্ষেপ, লেখকের স্বাধীন মতপ্রকাশের উপর রাজ কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলির ফলে প্রকৃত ইতিহাস অনেকক্ষেত্রেই ধোয়াচ্ছন্ন।

তথ্যসূত্র:

১। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পা:), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, 'পূর্ব্বভাষ' অংশ

২। সেন, কালীপ্রসন্ন, 'রাজমালার প্রণেতাগণ', শতাব্দীর ত্রিপুরা, রমাপ্রসাদ দত্ত ও নির্মল দাশ (সম্পা:), অক্ষর পাবলিকেশনস, দ্বিতীয় সংস্করণ – ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃঃ-৩১

৩। ন্যায়রত্ন, রামগতি, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', বুধোদয় যন্ত্র, হুগলী, ১৯৩০, পৃঃ-১৬৬

৪। ভট্টাচার্য, সুচিন্ত্য, 'ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি', উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ২০১৭, পৃঃ-২

৫। 'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ

৬। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পাঃ), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, 'পূর্ব্বভাষ' অংশ

৭। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পা:), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ - ৪

৮। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পা:), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, নিবেদন অংশ

৯। চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রচন্দ্র, 'রাজমালা', টিচার্স এন্ড কোং, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ - ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, পূর্ব্বকথা অংশ

১০। তদেব

১১। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পা:), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, নিবেদন অংশ

১২। তদেব

১৩। তদেব

১৪। তদেব

১৫। ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চন্দ্র, ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য, প্রকাশক : রঞ্জিত চন্দ্র ভট্টাচার্য, পশ্চিম জয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ - ১১

১৬। সিংহ, কৈলাসচন্দ্র, 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস', অক্ষর পাবলিকেশন্‌স, আগরতলা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ-২৪

১৭। 'রাজমালা', শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, পৃঃ- ৪৬

১৮। দেবরায়, মৃণালকান্তি, 'রাজমালা', জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা, ২০০৮, পৃঃ- ৮১

১৯। 'রাজমালা', শিক্ষাঅধিকার, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, পৃঃ- ৭৯

২০। সিংহ, কৈলাসচন্দ্র, 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস', অক্ষর পাবলিকেশন্‌স, আগরতলা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ-৪৫ দ্রষ্টব্য

২১। সেন, কালীপ্রসন্ন (সম্পা:), 'শ্রীরাজমালা'- প্রথম লহর, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, পূর্ব্বভাষ অংশ

২২। Rev. James Long, 'Analysis of the Rajmala or Chronicles of Tripura', The Asiatic Society of Bengal, Kolkata, 1850, p- 6

২৩। সেন, দীনেশচন্দ্র, 'ত্রিপুরা রাজ্য', ত্রিপুরার ইতিহাস, কমল চৌধুরী (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃঃ- ১৮

২৪। ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চন্দ্র, 'ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য', প্রকাশক : রঞ্জিত চন্দ্র ভট্টাচার্য, পশ্চিম জয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃঃ- ১১

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 203-221
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.016

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আদলে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’

ড. দেবযানী ভট্টাচার্য্য, *সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ এম. বি. বি. কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 14.10.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https:..creativecommons.org.licenses.by.4.0.)

Abstract

Bijan Bhattacharya and Tulsi Lahiri, and the other being Digindra Bandyopadhyay, are the three names associated with the Bengali 'Gananatya Andolan' that are mentioned in the same breath. Playwright Digindra Chandra Banerjee was born on July 5, 1908, in Adabari, Vikrampur, Dhaka District, East Bengal, undivided Bengal. Being a child of lower middleclass family. Drama and politics have been involved in Digindrachandra's life since the beginning. However, even though he kept pace with the anti-British national politics of the time for a period of his life, he did not tread the path later. But drama remained an integral part of his life forever. A large part of childhood and adolescence was spent in Adabari. And there, after seeing the theater in Durgamandap, a deep passion for drama was born. Non-cooperation movement was going on in the country while studying in Malkhanagar. The mind of the thirteen-year-old boy became agitated. The movement despises education Joined

Digindrachandra had a rebellious nature from childhood. So whenever he got any such movement, he jumped on it, so he joined the Congress civil disobedience movement in 32. Perhaps this nature of his made him enthusiastic about the communist ideology. He did not

withdraw from the world of Bengali drama amid hundreds of marital problems. He passed away on April 12, 1990 AD. He has written about 20 complete plays, about 35-36 in total. There were also half a dozen children's dramas. His notable play 'Vastuvita'

The protagonist of the play 'Bastuvita' (1947) wanted to remain in his paternal bhadras, clinging to his Pathshala as a means of housing and livelihood, even after the creation of Partition-based East Pakistan. Hujuge did not want to leave Mete Bast. But where the country has been divided on the basis of religion, in front of the aggressive sectarian animosity, he had to leave his home in the end. Even though some of his Muslim friends were quite sympathetic to him, how long can the sand dam survive the black waves of the sea? And my article is about this play. Under the pressure of political situation, many Bengali families have to come and start living in different states like Tripura, Assam, West Bengal in India. Apart from that, many Bengali families had to die at the hands of Muslims when their sons ran away from home, an attempt has been made in this article to analyze the various aspects.

Key words: political context, contemporary movement, middle-class society-family, partition, coordination.

বাংলা 'গণনাট্য আন্দোলনে'র সঙ্গে যুক্ত যে তিনটি নাম একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়, তাদের দু'জন বিজন ভট্টাচার্য ও তুলসী লাহিড়ী, অপর নামটিই দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নাট্যরচনা প্রচেষ্টা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সাহিত্যাধ্যাপক এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের রসজ্ঞ লেখক ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় দৃষ্টিতে বলেছেন :

> "সাম্প্রতিক নাট্যকারদের মধ্যে যাহারা বাংলা নাটককে ভাব-বিলাসহীন বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন তাহাদের মধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী। যুদ্ধোত্তর বাঙালী জীবনে যে সব প্রশ্ন ও সমস্যার আবর্ত-বিপ্লব দেখা দিয়াছে সেইগুলিই তাহার নাটকের পটভূমিতে বলিষ্ঠ রূপরেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। সেজন্য আর্থিক সঙ্কট, শ্রমিক ও মালিক বিরোধ, মেকি জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বন্দ্ব প্রভৃতি অনিবার্যভাবেই তাহার নাটকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ....নাটক রচনা তাহার পক্ষে আর্টের বিলাস নহে তাহা দুঃখব্রত সত্যসন্ধিৎসা। পরিবেশ রচনা, বাস্তবানুগ সংলাপপ্রয়োগ, আবেগ-

> দ্বন্দ্বের বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য এবং ক্ষিপ্রগতি ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার নাটকে সার্থক নাট্যরস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"[১]

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম তাঁর ১৯০৮-এর ৫ জুলাই, অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আদাবাড়িতে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। দিগিন্দ্রচন্দ্রের জীবনে নাটক আর রাজনীতি প্রথম থেকেই জড়িত। তবে জীবনের একটা পর্ব পর্যন্ত তৎকালীন ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চললেও, পরে আর ও পথ মাড়াননি। কিন্তু নাটক তাঁর জীবনে আমৃত্যু এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছিল। বাল্য ও কৈশোরের অনেকটা অংশ কেটেছিল আদাবাড়িতে। আর সেখানেই দুর্গামণ্ডপে থিয়েটার দেখে দেখে নাটকের প্রতি জন্মে গিয়েছিল গাঢ় অনুরাগ। তিনি একটু বড় হতে চলে আসেন পিতৃভূমি পাউলদিয়াতে। ভর্তি হন মালখানগরে, পরে সেখান থেকে রাজদিয়া হাইস্কুল। ১৯২৮-এ ম্যাট্রিক পাশ করেন, দু-দুটো বিষয়ে লেটার নিয়ে। মালখানগরে পড়ার সময় দেশে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। তেরো বছরের কিশোরের মন তাতে উদ্বেল হয়ে উঠল। পড়াশোনা তুচ্ছ করে আন্দোলনে সামিল হলেন।

আদাবাড়িতে থাকবার সময়ে নাটক দেখতে দেখতে অভিনয়ের নেশা পেয়ে বসল কিশোর দিগিন্দ্রচন্দ্রকে। রাজদিয়া স্কুলে পড়ার সময় সহপাঠীদের নিয়ে নাটক করার ইচ্ছে জাগল। কিন্তু তেমন জমল না। মহান সাহিত্যিকদের সাহিত্য পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে নাটককে। তাই নিজেই শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সব রচনার নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাঁরই নেতৃত্বে মঞ্চস্থ হল 'মেজদিদি', 'রামের সুমতি', 'পরিণীতা'র মতো অমর কাহিনি। ম্যাট্রিক পাশের পর ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকার বিখ্যাত জগন্নাথ কলেজে। সারা কলেজ দাপিয়ে বেড়ানো ছেলেটি তখন ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি। ঠিক এই সময় ১৯৩০-এ বাপুজির ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল সারা দেশ। স্থির থাকতে পারলেন না দিগিন্দ্রচন্দ্র। তার ফল বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার ও দেড় বছরের কারাদণ্ড। ১৯৩১-৩২ সাল কাটে তাঁর দমদম সেন্ট্রাল জেলে। জেলের মধ্যে চুপচাপ বসে ছিলেন না তিনি। রীতিমত পড়াশোনা করেছেন, আর করেছেন নাট্যচর্চা। সহবন্দি নিয়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন রবীন্দ্রনাথের

'শেষরক্ষা'। জেলে বসেই তিনি লেখেন 'আহুতি'। এই নাটক তাঁর নাট্যকার জীবনের এক মোড়। এতদিন তাঁর নাট্যচিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ছিলেন বাংলা সাহিত্যের দিকপালরা, এ নাটক থেকে তাঁর সেই ঘোর কাটল। নাটকে নতুন যুগের বার্তা বহনের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি। তবে সে-ভাবনা রূপ পেতে মাঝে কেটে গেল একটা যুগ। ১৯৩৩-এ কারামুক্তি ঘটল তাঁর।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আর কখনো রাজনীতিতে ফিরে আসেননি। মাসখানেক বাড়িতে কাটিয়ে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। শুরু হল তাঁর আত্মবিস্তারের পর্ব। জীবিকার তাগিদটাই তখন বড়ো। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একাধিক সংবাদপত্রের অফিসে তাঁকে চাকুরি নিতে হয়েছে। অবশেষে থিতু হলেন 'আনন্দবাজার'-এ। এখানে সাংবাদিক হিসেবে ছিলেন ১৯৫৩ সালের নভেম্বর অব্দি। বোধহয় শ্রমিক ইউনিয়ন করবার অপরাধে কর্তৃপক্ষের রোষ-নজরে পড়ে বরখাস্ত হন। এরপর বাকি জীবনটা দিগিন্দ্রচন্দ্রের আর্থিকভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে। তবুও শত সাংসারিক সমস্যার মধ্যে পড়েও বাংলা নাটকের জগৎ থেকে তিনি সরে আসেননি। দিগিন্দ্রচন্দ্র প্রয়াত হন ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল। লিখে গেছেন খান কুড়ির মতো পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক প্রায় ৩৫-৩৬টি। এছাড়া রয়েছে দেড় ডজন শিশুনাটক।

নাট্যসংগঠক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। 'গণনাট্য সংঘ'-এ যোগ দেন ১৯৪৬ সালে। নাট্যশাখার সম্পাদক থেকে ধীরে ধীরে হন সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি। পরে ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে দিগিন্দ্রচন্দ্র গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করেন। যতদিন দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনটিকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন শহর থেকে গ্রামের দিকে। সহযোগী কয়েকটি নাট্য সংগঠন নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাট্যোৎসব করার। ১৯৪৯-এ গড়ে তোলেন 'নাট্যচক্র'। কেবল নাটক অভিনয় নয়, শিল্প-সাহিত্যের অন্য দিক নিয়েও এই সংগঠনটি চর্চা করত। এর তিন বছর পর নবনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী পথিক 'অশনি চক্র'-এর সৃষ্টি হয় দিগিন্দ্রচন্দ্রের হাত ধরে। ১৯৫৬ সালে 'নাটমহল' নামে এক নাট্যসংস্থার জন্ম দেন। এ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল তরুণ নাট্যোৎসাহীদের অভিনয় বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা। নাট্যকারদের নিয়ে সংগঠন বানান ১৯৫৮-য়, নাম দেন 'নাট্যকার

সংঘ'। এই সংগঠনটি নাট্য আন্দোলন ও নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদে ছিল সোচ্চার। সবশেষে গড়ে তোলেন 'গণসংস্কৃতি সংঘ'। সেটা ১৯৭০ সালে। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। এই তথ্যগুলির সূত্রেই বলা যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নাট্যঅন্তঃপ্রাণ এক ব্যক্তিত্ব। মানুষের প্রতি সংবেদনশীল, তার বিপন্নতা ও সংকটের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই নিঃসীম দরদ তাঁকে মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহী করে তোলে এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জন্য কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ করে।

তাঁর লেখায় Socialist realism-এর ছাপ গভীরভাবে মুদ্রিত। তিনি সারাজীবন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাই সংগ্রামী মেহনতি মানুষদের জন্য আবেগ, সহানুভূতি, দরদ নাট্যকারের কলমের মুখ দিয়ে ঝরে পড়েছে। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। নাটকে যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই প্রগতিশীল মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ১৯৪৩-এ রচিত 'দীপশিখা' নাটকে একদিকে মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ প্রভাবে কৃষক-জীবনের বিপর্যস্ত জীবন ও অন্যদিকে কৃষক-আন্দোলনের সহায়তার সমস্যা-সমাধানের জন্য আন্দোলন। এটিতেও কম্যুনিস্ট প্রভাব বর্তমান।

তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'অন্তরাল' ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে রচিত হলেও প্রথম অভিনীত হয় '৪৪-এ। নাটকের এক অংশে শ্রমিক-মালিক বিরোধ এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মার্ক্সবাদী মতকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা এবং অন্য অংশে কানীন সন্তান ও কুমারী মাতার সমস্যায় লেখকের মানবিকতাবোধ ও সামাজিক ন্যায়নীতি-বোধের প্রতিই আগ্রহ প্রকাশ পায়।

পরবর্তী নাটক 'তরঙ্গে' একদিকে কৃষক-বিপ্লবের সহিংস আন্দোলন এবং অপর দিকে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন—উভয়ের ব্যাপকতা পারস্পরিক বিরোধ এবং মাঝেমধ্যে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র মিলে মিশে রয়েছে।

১৯৪১-এ রচিত 'মোকাবিলা' নাটকে মুখ ঘুরিয়েছেন মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর। বাইরের রাজনৈতিক সংঘাত কীভাবে একটা পরিবারকে সমূহ

বিপর্যয়ের মুখে ফেলে কীভাবে তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছে, তারই বিশ্বস্ত, বিবরণ।

'মশাল' নাটকে (১৯৫৪) মূলত পুঁজিবাদী মিল মালিকদের প্রারোচনা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চিত্র ফুটিয়েছেন। কিন্তু এতে রয়েছে একদেশবর্তিতা—দীর্ঘকাল পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাস, জমিদার শ্রেণী এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার চিত্র অনুপস্থিত।—এগুলি ছাড়াও দিগিন্দ্রচন্দ্র 'জীবনস্রোত'-আদি নাটক এবং অসংখ্য 'একাঙ্কিকা' রচনা করেছিলেন। যেমন—'বেওয়ারিশ' (৪৭), 'একাঙ্ক সপ্তক', 'অভিনব একাঙ্কগ্রন্থ', 'পাকাদেখা', 'পুনর্জীবন', 'দাম্পত্য কলহে চৈব', 'সীমান্তের ডাক' প্রভৃতি। সর্বহারার মানবতাবাদ তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর নাট্যবিষয় গৃহীত হয়েছে সমকালের সমাজ-বাস্তবতা থেকে। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, জন্মভূমির মাটি থেকে শিকড় উপড়ে চলে আসার মর্মান্তিক যন্ত্রণা তাঁর নাটকে বারবার বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের অন্যান্য সমস্যা, মেকি স্বাধীনতার স্বরূপ ও সর্বোপরি নরনারীর হৃদয়-রহস্য তাঁর নাটকগুলিতে যত্নের সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে।

'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭) নাটকের নায়ক বঙ্গবিভাগ-জাত পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির পরও বাস্তুভিটা এবং জীবিকা সংস্থানের উপায় তার পাঠশালাটিকে আঁকড়ে ধরে পৈতৃক ভদ্রাসনেই থেকে যেতে চেয়েছিলেন। হুজুগে মেতে বাস্তু ত্যাগ করতে চান নি। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে যেখানে দেশভাগ হয়েছে, সেই আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক বিরূপতাকে সামনে রেখে তার শেষ পর্যন্ত বাস্তুত্যাগ করতেই হলো। তার কোন কোন মুসলমান বন্ধু তার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রের কালোচ্ছাসের ধাক্কায় বালির বাঁধ আর কতক্ষণ টিকতে পারে? আর এই নাটকের বিষয় নিয়েই আমার উক্ত প্রবন্ধ। রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে অজস্র বাঙালি পরিবার কীভাবে ওপার বাংলা থেকে এবার বাংলায় অর্থাৎ ভারতবর্ষের ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গের মতো বিভিন্ন রাজ্যে এসে বসবাস শুরু করতে হয়েছে। তার বাইরেও কত বাঙালি পরিবারকে বাড়ি-ঘর ছেলে পালিয়ে আসার সময় মুসলমানদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে, তারই বিভিন্ন দিকগুলো বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে।

'বাস্তুভিটা' নাটকের রচনাকাল ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকে আগস্ট; প্রথম অভিনয় হয় ১৫ অক্টোবর ১৯৪৭, দীপায়ন সংঘ কর্তৃক ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। বই হিসেবে বেরিয়েছিল ওই বছরেই। ১৯৪৭ সাল আমাদের দেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বৎসর। আক্ষরিক অর্থেই। ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধ থেকে ধরলে ১৯৪৭-এ শেষ হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনের ১৯০ বছরের একটি জমানা, যা ঔপনিবেশিকতার যুগ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। বাংলা তথা ভারতের ক্ষেত্রে এটা আধুনিক যুগও বটে। কিন্তু সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসন বিদেশি শাসন, যার প্রতি পদে লাঞ্ছনা অপমান অত্যাচার। এগুলি পরাধীনতার লজ্জাচিহ্ন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে স্বদেশ-চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হলেও, তা ক্রমশ বৃক্ষে রূপান্তরিত হতে থাকে ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের পর। প্রায় নব্বই বছর একটানা আন্দোলন চালিয়ে অবশেষ জয়লাভ। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের মধ্যরাত্রে অবসান ঘটছে ১৯০ বছরের এক অপশাসনের। ভারতবর্ষ লাভ করছে তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দেশ জুড়ে অভূতপূর্ব উন্মাদনা, সানন্দ উল্লাস। কিন্তু এ কোন্ স্বাধীনতা, কাদের স্বাধীনতা! স্বাধীনতার আগে-পরের কান্না-ঘাম-রক্ত ঝরার ইতিহাসটাকে মনে রাখলে স্বাধীনতার সব আনন্দ তেতো হয়ে যায়। অনেক মৃত্যুর মিছিল পেরিয়ে আমরা পৌঁছাই এক খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত ভূখন্ডে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে তৈরি হয় হিন্দু-মুসলমানের ভেতর পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, হানাহানি, একে অন্যকে নিঃশেষ করে দেবার নিষ্ঠুর মানসিকতা। স্বাধীনতা জন্ম দেয় দুই স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের-হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে দুই নিকটবর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দেওয়া হয় রাতারাতি। ইতিহাসই বলছে, এসব ঘটনার পিছনে ছিল কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের লোভ, দর্প, অহমিকা, স্বার্থসাধনের গোপন অভিলাষ। কিন্তু দেশভাগের বলি হল যারা তাদের কথা খুব একটা ইতিহাসে লেখেন না। দিগিন্দ্রচন্দ্র সেই বিপন্ন ত্রস্ত আতঙ্কিত শিকড়-ছেঁড়া মানুষদের নিয়ে, তাদের দুঃখ কষ্ট আর্তিকে ঘিরে লিখলেন 'বাস্তুভিটা'র মতো বাস্তব-নির্ভর এক সামাজিক নাটক, যার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে দেশভাগের ফলে প্রায় ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া মানুষদের অকথ্য যন্ত্রণা।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সূত্র ধরেই বুঝতে পারা যায় যে, কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতার হঠকারিতায় দেশভাগের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছিল। যারা ধর্মান্ধ ও সম্প্রদায়গত ভাবে আত্মকেন্দ্রিক তারাই ছিলেন দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থক এবং ধর্মের জিগির তুলে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়ে দিতে তাঁরা ভুল করেননি। অথচ দেশ দ্বিখন্ডিত হলে সবচেয়ে সংকটে পড়ে সাধারণ মানুষ, যারা ধর্ম নিয়ে কখনই মাতামাতি করে না; যারা সুভদ্র সামাজিকতায় সুদীর্ঘকাল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্রের মূল লক্ষ্য এদের জীবন, এদের সমস্যা, এদের সংঘাত ও সমন্বয়। নাটকে মহেন্দ্র অধিকারী ও তাঁর পরিবার এই অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে ব্যবহৃত।

মোট সাতটি দৃশ্যে বিন্যস্ত এ নাটকে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা হিন্দুদের জীবনের অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাবোধের অভাবজনিত আতঙ্ক ও সংকটের পটভূমিতে বিপন্ন মানুষের জন্মভূমির প্রতি নিদারুণ মায়া ও অপরিসীম টান বর্ণিত হয়েছে। দেশভাগ হলে সাধারণ মানুষের চেতনায় এই বোধ কাজ করতে থাকে যে, বিধর্মী হিসেবে এখন তারা এদেশে অবাঞ্ছিত। সুতরাং যে-কোনো সময়েই তাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। তাই জান-মান-ইজ্জৎ রক্ষার তাগিদে এতদিনের স্বদেশ ছেড়ে চলে আসাটা স্বাভাবিক এবং একই সঙ্গে বেদনাদায়ক। এই বেদনার বাণী বহন করে নিয়ে এসেছে 'বাস্তুভিটা'নাটক। যারা রাজনৈতিক কৌশলে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করল, তাদের মধ্যে জন্ম নিল বিজয়ীর অহমিকা, গড়ে তুলল অসহিষ্ণু উদ্ধত মনোভঙ্গি। বিধর্মীদের দেশ থেকে তাড়াতে পারলেই যেন তারা বাঁচে। তাদের নির্দয়তা কখনো কখনো চরম নৃশংসতার রূপ নেয়। বিধর্মীদের ওপর আক্রমণ কিংবা অত্যাচারের কালে তারা একবারও ভাবে না পূর্বের সম্প্রীতি সৌহার্দ্যের কথা। মনুষ্যত্বকে গলা টিপে মেরে তখন তারা পরিণত হয় ধর্মান্ধ নরঘাতকে। এ নাটকে তাদেরও উপস্থিতি দেখিয়েছেন নাট্যকার। বস্তুত নাটকটি দাঁড়িয়ে আছে এই দুই শ্রেণির মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর।

নাট্যকার নাটকের সূচনায় রাখেন পূর্ববাংলা থেকে কলকাতায় পালিয়ে যাবার টুকরো ছবি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে গেছে, তাই এদেশ আজ হিন্দুর কাছে নিরাপদ নয় বুঝে চৌধুরি, মুখুজ্যে, মিত্তিররা একের পর এক

চলে যাচ্ছে সীমানার ওপারে পশ্চিমবাংলায়। মহেন্দ্র অধিকারী একেবারেই সাধারণ স্তরের ছাপোষা নিম্ন মধ্যবিত্তের গেরস্থ মানুষ। তিনি গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত। স্ত্রী মানদা আর কন্যা কমলাকে নিয়ে তাঁর নিত্য অভাবের সংসার। তিনি স্কুলের বেতন পাননি কয়েকমাস। তাতে সংসারের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। সুতরাং মহেন্দ্রের পক্ষে অন্য সকলের মতো দেশগাঁয়ের বাড়িঘর ছেড়ে হঠাৎ চলে আসা সম্ভব নয়। মানদা এতটা বুঝতে চান না। তাঁর যত ভাবনা কন্যা কমলাকে নিয়ে। উঠতি বয়েস তার, সুতরাং মুসলমান যুবকদের নোংরামির ভয়ে সর্বদা সিঁটিয়ে থাকেন তিনি। তাই মান্দার উক্তিতে পাওয়া যায় —

১। "ভাবনা তো আমাদের জন্য নয়, ভাবনা মেয়েটার জন্যে। পুকুর-ঘাটে ওর যাবার উপায় নেই, দেখলেই মোল্লাবাড়ীর ছেলে দুটো যা তা ইশারা করে।"[২]

২। "না থাকবে না, সব দেবতা হয়ে যাবে! তোমার মাস্টারিবুদ্ধি রাখ। মেয়েদের ওরা কবে সম্মান দিয়েছে!"[৩]

৩। "...পাকিস্তান পেয়ে যেন ওরা আরো মাথায় চড়ে বসেচে!"[৪]

দেশভাগের পর পরিস্থিতি যে অনেক বদলে গেছে সেটা চর্মচক্ষু দিয়েই বুঝতে পারেন এবং এ ব্যাপারে অন্ধ স্বামীর চোখ ফোটানোর দুর্মর চেষ্টা করেন মানদা।

মানদা প্রতিবেশী হিন্দু গেরস্থদের দেশ ছেড়ে পালানোর সংবাদ দিয়ে আতঙ্কিত হয়ে স্বামীর কাছে জানতে চান, —

"গ্রাম ছেড়ে সবাই চলে গেলে আমরা থাকব কি করে?"[৫]

এ প্রশ্নে মহেন্দ্র নির্বিকার। কারণ তাঁর কোনো গত্যন্তর নেই। যে আর্থিক সংগতি অন্যদের চলে যেতে ভরসা যোগাচ্ছে মহেন্দ্রর তা নেই। সুতরাং তিনি স্ত্রীকে বলেন,—

"পাকিস্তান হোক, গোরস্থান হোক, এখানেই আমাদের থাকতে হবে। গরীবের যাবার জায়গা আছে নাকি?"[৬]

এমনই অকূল সমুদ্রে যেন কূল খুঁজে গেলেন মানদা। প্রতিবেশী মিত্তির বাড়ির শচীন এসে হাজির হল এসময়। শচীন অনেকদিন হল গাঁ ছেড়েছে। সে

থাকে কলকাতায় তার স্ত্রী ও বিধবা মাকে নিয়ে। কলকাতার সাম্প্রতিক গণ্ডগোলে তাদেরকে শ্বশুরবাড়ি ধানবাদে পাঠিয়ে এখন এসেছে দেশে। জন্মভূমির টানে নয়, অন্য উদ্দেশ্য আছে তার। দেশভাগের ফলে তাদের বাস্তুভিটে, জমি-জিরেত সব এখন পাকিস্তানে পড়েছে। এ সম্পদ এবার বেহাত হবে। তার আগেই সে বেচে দিয়ে যতটুকু যা পাওয়া যায় সেই পাওনা-গণ্ডা নিয়ে চিরতরে জন্মভূমি ছাড়তে চায়। শচীনই এখন মানদাদের লোভ দেখায়, আশ্বাস দেয় ভিটেমাটি ছেড়ে তার সঙ্গে কলকাতায় চলে যেতে। ডুবন্ত মানদা যেন স্রোতের মুখে কুটো খুঁজে পান। কিন্তু মহেন্দ্রর তাতে সায় নেই। কারণ তিনি জেনেছেন, এখানকার বড় ঘরবাড়ি-পুকুর-খামার বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে সে টাকায় কলকাতায় সাকুল্যে কাঠা দুই জমি মিলতে পারে। এছাড়া মহেন্দ্র এখান থেকে পা ওঠাতে নারাজ আরও একটি বড় কারণে। তিনি গাঁয়ের পাঠশালাটির একমাত্র শিক্ষক। তিনি চলে গেলে পাঠশালাটাই চিরতরে উঠে যাবে, এখানকার ছেলেপুলেদের পড়াশোনা মাটি হবে। তাই মহেন্দ্রের কণ্ঠে শুনা যায় বেদনাপূর্ণ আর্তনাদ, —

> "মাস্টারি ক'রে তো চুল পাকালাম-কিন্তু পেট ভরেচে কোনদিন। তশীলদারীটা ছিল বলেই যে-ভাবে হোক এতদিন সংসার চালাতে পেরেচি। তা ব'লে মাস্টারিকে আমি কোনদিনই ঘৃণা করিনি।... গবরমেন্ট আর মাইনে দিচ্ছে কতদিন-তার আগেও তো কত ছেলে আমার কাছে বিনে মাইনেয় পড়ে যেত।"[৭]

মানদা স্বামীর এসব কথা শুনে ক্ষুব্ধ হন, অভিমান করেন, করেন তীক্ষ্ণ বিদ্রুপও। মহেন্দ্রর একাকী ভিটে পাহারা দেবার কথা শুনে মানদা শচীনকে সাক্ষী মেনে বলেন, —

> "শুনলে ত বাপু কথার ধরণ। থাক ওর ভিটে নিয়ে ও পড়ে- মেয়েকে নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে যাব"[৮]

কিন্তু 'যাব' বললেই মানদার যাওয়া হয় না। মহেন্দ্রও থাকেন না একই অবস্থানে। তাঁর মধ্যে দোলাচলতার সৃষ্টি হয়। নাট্যকার একাধিক ঘটনায় মহেন্দ্রর দোদুল চিত্তকে স্পষ্ট করেছেন। গ্রামের অবস্থাপন্ন মাতব্বর কৃষক সোনা মোল্লার ছেলে খালেক জোর করে মহেন্দ্রর আমগাছের আম পেড়ে নিয়ে যায়। নালিশ জানাতে মহেন্দ্র যান সোনা মোল্লার কাছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার

হয় না তার। তিনিও একটা সময় বুঝতে পারেন দেশকালের আগেকার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পালটে যাচ্ছে যেন, নতুন করে ভাবতে হবে সব কিছু। আর শচীন নিত্য প্ররোচনা দিয়ে যায় সাপের চেয়েও ক্রুর বিশ্বাসঘাতক মুসলমানদের বিরুদ্ধে, অতীত ইতিহাসের নজির তুলে প্রমাণ করতে চায় এই জাতটার খুনি স্বভাব। তাই সে বলে,

> "...সাপকে বিশ্বাস করতে আছে মাস্টারকাকা, তবু এ জাতকে বিশ্বাস করতে নেই। এদিকে আপনার কাছে এসে ভাল মানুষটি সাজছে, ওদিকে দেখুন গিয়ে তলে তলে লীগের পান্ডাগিরি কচ্ছে।"[৯]

কিন্তু মুসলমান প্রতিবেশীদের দীর্ঘদিনের সহাবস্থানে থাকা আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ মহেন্দ্রর মন সেকথা মানতে চায় না। তাঁরই এক শিক্ষক-বন্ধু মক্তবের মাস্টার আমীন মুনশির সঙ্গে তিনি নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে অকৃত্রিম আন্তরিকতায় গল্প করেন, সুখ-দুঃখের কথা বলেন, আমীনের ছেলে অসুস্থ হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও গভীর রাত্রিতে তার চিকিৎসা করতে যান। এসব ব্যাপারে তিনি কারুরই কোনো বারণ মানেন না, কারণ মহেন্দ্রর মধ্যে কাজ করতে থাকে দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী মুসলমান ভাইদের জন্য দরদ, সহানুভূতি ও গভীর একাত্মতা। তার কাছে দেশভাগ কতকগুলো স্বার্থান্বেষী নেতার শয়তানি। এতে দেশের মানুষের অন্তরকেই দু'ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ভাবা হয়নি সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখ, সুদীর্ঘকালে গড়ে-ওঠা প্রীতির বন্ধনের কথা। তাছাড়া মহেন্দ্র গাঁ ত্যাগ করতে পারেন না তাঁর তুলনায় আরো নীচুস্তরের গরিব-পূর্বোদের কথা ভেবে। নিজেরা কোনোক্রমে পালিয়ে গেলেও রতনের মতো হতদরিদ্র জেলে কিংবা মহানন্দের মতো নিরতিশয় অভাবী গ্রাম ভাষিরা তো কোনো মতেই ভিটে ছেড়ে যেতে পারবে না। তাদের এই অসহায়তা মহেন্দ্রকে পীড়িত করে।

'বাস্তুভিটা' নাটকটি মুলত হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। মধ্যযুগ থেকেই এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বাস করে এসেছে। সম্পর্ক কখনো গরম, কখনো নরম। দুই ধর্মেরই গোঁড়া ধর্মধ্বজীরা নিজেদের সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে বিরুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসীদের সম্পর্কে হিংস্র প্ররোচনায় উত্তেজিত করেছে। আবার কোথাও কোথাও একত্র সহাবস্থানের ফলে তাদের ভিতর গড়ে উঠেছে পারস্পরিক নির্ভরতা, সম্প্রীতি। এ নাটকে মহেন্দ্র ও

শচীনের কথোপকথন থেকে ইতিহাসের সেই অতীত অধ্যায়ে গিয়ে পৌঁছুই আমরা, আর শচীন ও সোনা মোল্লার উত্তপ্ত বাক্-বিনিময়ে ধরা পড়ে স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের চেহারা। মহেন্দ্রর চোখে শত অনৈক্যের মাঝখানেও হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্পর্কটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে শচীন আর সোনা মোল্লার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে দুই বিরুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসীর পার্থক্য, সামাজিক ভেদ এবং তার সূত্রে শত্রুতা। শচীন ভয়ংকরভাবে মুসলমান বিদ্বেষী। সে মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের দৃষ্টান্তে বুঝতে চায় বর্তমান কালের মুসলমানদের চরিত্র। দেশভাগের পিছনে সে দায়ী করে মুসলমানদের লোভ, স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা। কিন্তু এই স্বভাব গড়ে ওঠবার নেপথ্যে হিন্দুদের কোনো দায়কে সে স্বীকার করে না। অন্যদিকে সোনা মোল্লা মুসলিম লিগের সমর্থক হলেও পুরোপুরি হিন্দু-বিদ্বেষী নন। সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক কেন খারাপ হল, এর পিছনে উল্লাসিক হিন্দুদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কতটা দায়ী, তিনি তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। মুসলিম লিগের হিন্দু-বিদ্বেষের অন্তরালে দেখেছেন মুসলমানদের তিক্ত অভিজ্ঞতা, হিন্দু সমাজপতিদের দ্বারা নিগৃহীত ও অপমানিত হওয়ার বেদনাকর ইতিহাস। তার মতে, পাকিস্তানের দাবি উঠেছে সেই নিগ্রহের আঁতুড়ঘর থেকে। মহেন্দ্র আছেন এই দুই মেরুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তাঁর সঙ্গে আমীন মুনশি, কফিলদ্দি, রতন, মহানন্দরা। এদের ভিতর কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নেই, রয়েছে কেবল বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রাম। সেই সংগ্রামী চেতনার কাছে হার মেনেছে সাম্প্রদায়িক অনিষ্টবুদ্ধি। শেষ অবধি এ নাটকে জয় হয় শুভচেতনার। অনেক টানাপোড়েনের পর মহেন্দ্রকে তাঁর এতদিনের বাস্তুভিটে ছাড়তে দেয় না সেখানকার মুসলমানরাই। শেষ দৃশ্যের উপান্তে হৈ-হট্টগোল, আনন্দ কলরোলের মাঝখানে কখন যে নিঃশব্দে চম্পট দেয় ভেদবুদ্ধির অধিকারী শচীন, তা কারও ঠাহর হয় না। গোঁড়া মুসলমানদের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লিগ যে পূর্ববঙ্গের ইসলাম-বিশ্বাসী মাত্রকেই ধর্মান্ধ করে দেয়নি, তার প্রমাণ দেয় এ নাটক। ১৯৫৪ সালে নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণের মুখপত্রে 'স্মারক' শীর্ষক ক্ষুদ্র রচনায় নাট্যকার এই প্রসঙ্গটির সূত্র ধরে লিখেছেন, —

> "ভারতবিভাগের পরে কারো কারো মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল লিগ-নেতৃত্বের চাপে একেবারেই যন্ত্রবৎ হয়ে গিয়েছে, তাদের শুভবুদ্ধির উদয় আর কোনদিনই হবে না। জনসাধারণ থেকে যাঁরা দূরে এবং তাদের প্রতি যাঁদের আস্থা নেই তারাই এরূপ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা যে বিজ্ঞানসম্মত ছিল না, পূর্ববঙ্গের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলই আজ তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত কচ্ছে।... পূর্ববঙ্গে জনগণের জয়যাত্রায় আজ যে আলো স্বতঃভাত, ক্ষীণ হলেও 'বাস্তুভিটা' রচনার সময় তারই দিকে অঙ্গুলি সংকেতের চেষ্টা করেছিলাম। আজ সেখানে 'আমীন মুন্সী', 'কফিলদ্দি'রই জয় এবং এই জয়ে আমিও গর্ব অনুভব কচ্ছি।"[১০]

অর্থাৎ লেখকরা যে ক্রান্তদর্শী হয়ে থাকেন, তার আরও একবার প্রমাণ পাওয়া গেল এ নাটকে। 'বাস্তুভিটা'র মর্মকথায় প্রতিধ্বনিত হল এই সত্য: দেশভাগের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক স্বার্থশিকারিরা ইষ্টবুদ্ধির দ্বারা চালিত ছিলেন না; আর জনসাধারণের শক্তিই গণতন্ত্রের শেষকথা, ক্ষমতাতন্ত্রের চোখ রাঙানি দিয়ে সেই শক্তিকে অবরুদ্ধ করে রাখা যায় না।

'বাস্তুভিটা' শব্দটি দুটি পদের সমাহার-বাস্তু ও ভিটা। বস্ ধাতু জাত 'বাস্তু' বলতে বোঝায় বসতি বা বাসস্থান; আর ভিত্তি থেকে ভিত, তা থেকে 'ভিটা' কথাটির উৎপত্তি। সুতরাং 'বাস্তুভিটা' শব্দটির সামগ্রিক অর্থ হল বাসস্থানের ভিত্তিভূমি। কিন্তু দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর নাটকে কেবল এই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করেননি, এর অন্য তাৎপর্যও অভিব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন। নাটকটি যেভাবে আরম্ভ হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশভাগের ফলে পুববাংলা ছেড়ে দলে দলে হিন্দুরা চলে আসছে পশ্চিমবাংলায়। তারা ছেড়ে আসছে তাদের ঘরবাড়ি, পুকুর-খামার, জমি-জিরেত, এমনই আরো কত পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি। স্থাবর ছাড়া অস্থাবর সম্পত্তিরও অনেক কিছু ফেলে আসতে বাধ্য হচ্ছে তারা। তাদের কাছে এসব সম্পদের তুলনায় জীবনের মূল্য বেশি। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মহেন্দ্র অধিকারী পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের একজন। কিন্তু তাঁর পরিস্থিতি আর সকলের মতো নয়। তিনি একটি পাঠশালার পণ্ডিত হলেও তাঁর সাংসারিক অবস্থা তেমন নয়, যাতে এই সংকটে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় পাড়ি

দিতে পারেন। তাছাড়া তাঁর কাছে নিজের পালিয়ে যাওয়াটাও বড় নয়। বরং তিনি বড় করে দেখেন এতদিনের হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি, পাঠশালার পড়ুয়াদের ভালোমন্দ। সর্বোপরি মহেন্দ্রর কাছে বাস্তুভিটা শুধুমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়; তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক দিনের স্মৃতি, গভীর মমতা, মাটি-মায়ের আদর। কেবল বাড়ির চৌহদ্দিটুকুই নয়, তিনি ভালোবাসেন তাঁর গ্রামকে, গ্রামের সমস্ত মানুষকে, চারপাশের আজন্ম দেখা পরিবেশকে। এই সব কিছু নিয়েই তাঁর অস্তিত্ব। সুতরাং 'বাস্তুভিটা' শব্দটি মহেন্দ্রর কাছে নিয়ে আসে ব্যুৎপত্তি-পরিধির অতিরিক্ত ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনা।

এই ব্যাপ্তার্থটি আরো পরিস্ফুট হয়, যখন এর বিপরীতে নাট্যকার উপস্থাপন করেন শচীনকে। শচীনও পুববাংলার ভূমিপুত্র। কিন্তু সে এখন কলকাতাবাসী। তাই শচীনের কাছে তাদের পুরানো বাস্তুভিটে বর্তমানে অপ্রয়োজনীয়। এর প্রতি তার কোনো টান বা নস্টালজিয়া নেই। এখন এ সম্পত্তিকে সে দেখে অর্থোপার্জনের উৎস হিসেবে। স্থাবর সম্পত্তিসমূহ সে বিক্রির কথা ভাবে। কেননা তার ধারণায়, দেশভাগের পর পাকিস্তানে হিন্দুর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাবার প্রভূত সম্ভাবনা। প্রথম দৃশ্যে মহেন্দ্রর সঙ্গে কথোপকথনে তার এইসব বৈষয়িক হিসেবই ধরা পড়েছে।

> "মহেন্দ্র। ... শুনলাম, তুমি নাকি বাড়িঘর বেচে দিতে এসেচ?
> শচীন। কি আর করি! এখানে ত আর আসা যাবে না।
> মহেন্দ্র। চৌদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটেটা বেচে দেবে?
> শচীন। ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু আর রেখেই বা কি করব! বেচে না দিই, বাড়ি বেহাত হয়ে যাবে।"[১১]

শচীন যত সহজে জন্মভূমির মায়া কাটাতে পারে, মহেন্দ্র তা পারেন না। একি বয়সের দোষ, না তার মনের নিজস্ব গড়ন? মানদা যখন স্বামীকে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে বাস ওঠাতে পরামর্শ দেন, মহেন্দ্র তখন নিজের আর্থিক অক্ষমতার কথা বলে সে প্রসঙ্গে ছেদ টানেন। তাঁর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত,—

> "তা সাপই হোক, আর বাঘই হোক, এদের নিয়েই ত থাকতে হবে। আমাদের কি যাবার জায়গা আছে!"[১২]

বাস্তুভিটার সঙ্গে মহেন্দ্র জড়িয়ে নেন পূর্বপুরুষদের স্মৃতি, ঐতিহ্য-যা তাঁর অস্তিত্বকে প্রজন্মান্তরের ব্যাপ্তি দিয়েছে। ভিটে বেচে যেটুকু টাকা পাওয়া যাবে, তা দিয়ে কলকাতায় যতটুকু জায়গা কেনা যাবে সেটা শচীনের কাছে শুনে মহেন্দ্র বলেন,—

> "এতবড় বাড়ি বেচে পাব আমার এই ঘরখানার মতো একটু ছোট জায়গা। কাজ নেই বাপু, তোমাদের ওখানে গিয়ে-মরি বাঁচি এখানেই থাকব। বাপ পিতাম'র ভিটে ছেড়ে যাব কোথায়?"[১৩]

মানদা স্বামীর অনড় সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন। সবিস্ময়ে বলেন,—

> "না, যাবে কোথায়! এখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাক। তোমার তো আর মানইজ্জতের ভয় নেই।"[১৪]

মহেন্দ্রর দৃঢ় প্রত্যুত্তর—

> "দেব বইকি, নিশ্চয়ই দেবো।"[১৫]

আসলে মহেন্দ্র মনে করেন, বিপদ দেখলেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালানোটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সমস্যার সাথে লড়তে হয়। তাছাড়া বিপদটা দু'একজন মানুষের নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের। মহেন্দ্রর এই ভাবনায় বাস্তুভিটা একটি বৃহৎ তাৎপর্য পায়, আর মহেন্দ্র হয়ে ওঠেন সেইসব সংকটাপন্ন মানুষের প্রতিভূ।

বাস্তুভিটা ছাড়ার সমস্যা যে একা মহেন্দ্রর সমস্যা নয়, নাট্যকার তা পরিস্ফুট করেছেন নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সোনা মোল্লার সঙ্গে রতনের কথোপকথনে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু শ্রমজীবীদেরও সেই একই সঙ্কট। দেশ ছাড়ার জন্য তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে লিগপন্থী গোঁড়া মুসলমানরা। কোথাও তাদেরকে আর্থিকভাবে বিপন্ন করা হচ্ছে যাতে তারা নিজেরাই দেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তাদের পক্ষে ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। লক্ষণীয়, এই দৃশ্যে বাস্তুত্যাগের বিষয়টিকে নাট্যকার পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টিতেও দেখাতে চেয়েছেন। কফিলদ্দি যেন এইসব মানুষের প্রতিনিধি। কেরামত কট্টরপন্থী লিগনেতাদের দ্বারা প্রভাবিত। সে হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ থেকে তাড়াবার পক্ষে। কফিলদ্দি সেটা বুঝতে পেরে ঝাঁঝায়—

> "চইল্যা গ্যালে বুঝি তোমার অট্টালিকা উঠবো-ধনদৌলত বাড়বো মিঞা! বলি তোমার যদি আজ বাড়ী ছাইড়া চইলা যাইতে অইত-তোমার ক্যামন লাগতো? জানো, হাদিসে কি কয় জানো?"[১৬]

এইভাবে সারা নাটক জুড়ে বিরাজ করতে থাকে বাস্তুভিটা ত্যাগের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি ও প্রতিযুক্তি, বাস্তুভিটা সম্পর্কে নানান মানুষের নানা অনুভূতি ও বিবেচনা। মানুষের দীর্ঘদিনের বসবাসের ঘরবাড়ি তার কাছে কী-এই অনুচ্চারিত প্রশ্নটির যেন জবাব দেবার চেষ্টা আছে নাটকটির মধ্যে। তৃতীয় দৃশ্যে মহেন্দ্রর একটি সংলাপে নাট্যকার ধরিয়ে দিয়েছেন বাস্তুভিটাকে ঘিরে জড়িয়ে থাকা নস্টালজিক মানুষের দুর্মর আবেগ। শচীনের চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিকতার বিপ্রতীপে মহেন্দ্রর এক গভীর উপলব্ধি এখানে ব্যস্ত। তিনি নিজের চিন্তা করেন না, বরং ভাবিত হন গাঁয়ের ছেলেগুলোর লেখাপড়া নিয়ে। শচীন মহেন্দ্রর এই আহাম্মকিতে বিস্মিত। সে তাই বলে—

> "আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম। যেখানে নিজের জীবন বাঁচবে কিনা ঠিক নেই...সেখানে আপনি ভেবে মরচেন গাঁয়ের ছেলেগুলোর লেখাপড়া হবে কি না! আশ্চর্য আপনাদের দেশের জন্য মায়া!"[১৭]

আর একথার প্রত্যুত্তরে মহেন্দ্র ডুব দেন তাঁর দেশচেতনার গভীরে, অপূর্ব আবেগমথিত হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বর —

> "মায়া। হ্যাঁ, মায়াই বটে। কিন্তু কার না মায়া হয় বলো। যেখানে ছোট থেকে মানুষ হয়েচি-যে-মাটির সঙ্গে চৌদ্দপুরুষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাকে ছেড়ে যাবো-এ ভাবতেও কষ্ট হয় বাবা...।"[১৮]

বাস্তুভিটা তাই কেবল ইট-কাঠ-পাথরে গড়া বসতবাড়িই নয়, মানুষের আজন্মকালের বাসভূমির সঙ্গে মিশে থাকা এক অব্যক্ত আকুতিও বটে। সমস্ত নাটক জুড়ে নাট্যকার সেই আকুতিকেই নানা চরিত্রে ধরতে চেয়েছেন, এমনকি শেষ দৃশ্যে মানদার মধ্যেও। তাই এর নামকরণটি বস্তুকেন্দ্রিক হয়েও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভাবকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায় নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' নাটকে উদ্ঘাটিত হয়েছে খন্ডিত এক দেশের বাস্তুচ্যুত মানুষের আকস্মিক আঘাত ও যন্ত্রণা। এ নাটক দেখিয়েছে বাংলাদেশের নিরক্ষর মুসলমানরা কীভাবে তাদের আজন্ম হিন্দু প্রতিবেশীদের আপনজন মনে করে জন্মভূমিতে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, তাদের রক্ষা করেছে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও। হিন্দু মহাসভা আর মুসলিম লিগের সংকীর্ণ আদর্শ সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি, বরং তাদের নিরন্তর প্ররোচনা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ধর্মের

বাহ্যিক ভেদ ভুলে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই 'বাস্তুভিটা' নাটকের মুখ্যবার্তা। পাঠশালার পন্ডিত মহেন্দ্র মাস্টার এ নাট্যকাহিনিতে যেন মহাসভা ও লিগের বিরুদ্ধে নীরব মূর্ত প্রতিবাদ। তিনি কখনই দেশভাগকে সমর্থন করেননি, নির্যাতনের ভয়ে চলেও যেতে চাননি জন্মভূমি ছেড়ে। তাঁকে পা ওঠাতে দিচ্ছিল না জন্মভূমির মায়া, প্রান্তিক মানুষের সীমাহীন দুর্গতি। দেশভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব তো এই গরিব-গুর্বোদের ওপরেই সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছিল। মহেন্দ্র বিত্তবান নন, চিত্তবান। তিনি তাঁর মরমি হৃদয় দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন সকল দুর্গতের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা। মহেন্দ্র মাস্টারের এই সর্বানুভূতিই 'বাস্তুভিটা' নাটকের প্রধান সম্পদ। দিগিন্দ্রচন্দ্র নাটকটির সমাপ্তি লগ্নে অনাবিল মনুষ্যত্বকেই জয়যুক্ত করেছেন, জিতিয়ে দিয়েছেন মহেন্দ্র, আমীন মুনশি, রতন, কফিলদ্দি, আব্বাস, সোনা মোল্লাদের যৌথ প্রয়াসকে। চিরকাল আমীন মুনশিদের ভরসা হয়ে উঠেছেন মহেন্দ্র মাস্টাররা, আর সেই মহেন্দ্রদের গাঁয়ে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে ইয়াসিনদের লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে এসেছেন আমীনরা। ব্যক্তিস্বার্থ বহির্ভূত সম্প্রীতির এতবড় দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলবে। প্রসঙ্গের ছেদ টানা যাক নাট্যকারেরই লেখা প্রখ্যাত গ্রন্থ নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা-র অন্তর্গত 'ইতিহাসের বিচারে বাংলা নাটক'-এর বিশিষ্ট প্রসঙ্গ 'নাটকে হিন্দু-মুসলিম চিত্র'-এর একটি মূল্যবান অংশ দিয়ে। দিগিন্দ্রচন্দ্র বলেছেন,—"রাজনৈতিক চক্রান্তে দেশ বিভক্ত হলেও পাঁচিল তুলে বাংলার মনকে খণ্ডিত করা যায়নি। দুই বাংলার এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক সমাজ আজও পরস্পরকে আকৃষ্ট করছে। বাংলার নাট্যকারদের মনে রয়েছে সেই বাংলার মিলিত জীবন, মিলিত আত্মা ও মিলিত সংস্কৃতির ছবি। তারই স্বতঃস্ফূরণ দেখা যায় বাংলার সামাজিক নাটকে।"[১৯]

তথ্যসূত্র:

১. https:..www.millioncontent.com.2021.04.blog-post_76.html
২. সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদনা), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১২

৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩
৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ১১
৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ১২
৭. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩
৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ২০
৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮
১০. তদেব, পৃষ্ঠা: ৫
১১. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৭
১২. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ২৩
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩০
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩০
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ১০৬

আকর গ্রন্থ:

১. সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদনা), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১৬

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অজিত কুমার ঘোষ: বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ
২. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭
৩. উদয়চাঁদ দাস ও অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, দেশভাগ ও বাংলা উপন্যাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ২০০৫
৪. কুন্ডল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ ও রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৭
৫. চন্দনকুমার কুণ্ডু: ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ: বাংলা উপন্যাসের দর্শনে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১২
৬. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রোড়পত্রঃ মশাল, গণনাট্য, ঊনত্রিশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ- ১৯৯৩
৭. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: 'নেপথ্য ভূমিকা', ত্রিস্রোতা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -১৯৮২

৮. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: নয়া শিবির, ত্রিস্রোতা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -১৯৮২

৯. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়া শিবির, ত্রিস্রোতা, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮২

১০. প্রসূন বর্মন (সম্পাদনা): দেশভাগ দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, ২০১৩

১১. রণবীর পুরকায়স্থ : সুরমা গাঙর পানি, কলকাতা, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ ২০১২

১২. সুজিত চৌধুরী : হারানো দিন, হারানো মানুষ (দ্বিতীয় পর্ব), জ্যোতি প্রকাশনী, শিলচর, ২০১০

১৩. সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশভাগ ও বাংলা সাহিত্য: বর্তমান প্রেক্ষিতে, বঙ্গীয় সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ২০১৫

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 222-235
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.017

‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ এর শকুন্তলা ও ‘বীরাঙ্গনা’র শকুন্তলার তুলনাত্মক পর্যালোচনা

জয়দেব পাল, *গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.10.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The poet Kalidasa's world-famous drama ‘Abhijñānaśakuntalam’ and the poet Sri Michael Madhusudan Dutta's ‘Bīrāṅganā’, a poet who shaped the ‘amitrākṣara’ rhythm of bengali literature, are famous and well-known poems. Earlier poet Ishwar Gupta had mentioned ‘Patra-kāvya’(Epistolery), but it was Madhusudan Dutta who first followed the Roman poet ‘Ovid’ and composed eleven cantos ‘Bīrāṅganā’ ‘Patra-kāvya’ in its own glory. In 'śakuntalā patrikā’, the first canto of ‘Bīrāṅganā’ Kavya, the poet Madhusudan Dutta follows the love story of Dusmanta and Shakuntala as described in the Mahābhārata or Padmapurāṇa or ‘Abhijñānaśakuntalam’. Based on the scene of the hero's hatred of the heroine, he composed the letter “duṣmantēra prati śakuntalā”. Poet Kalidasa has brought out the emotional pulse of the newly married. Shakuntala’s heart towards the returning king and in Madhusūdana's work, the diverse human female character of the complaint of the distressed and anxious village wife has been exposed. In both poems, Shakuntala is the daughter of Rajarishi Vishwamitra and Apsara Menka, Shakuntala is abandoned as a

child, raised by Maharishi Kanva. Her introduction, meeting and marriage according to 'Gandharva' with King Dusmanta who came to Tapobana. In both poems, Shakuntala's letter writing, story of 'Bhramara', Betasa-kunja's description and return to the homeland. King Dusmanta did not show initiative in taking Shakuntala to the capital. Some contrasts in both the poems catch everyone's attention. For example, Kalidasa's Shakuntala, overwhelmed with passion, wrote the 'padmapatra' (lotus leaf) only once with his fingernails, but Madhusudan's Shakuntala did it many times. Kalidasa's Shakuntala is not as worried and apprehensive as Madhusudan's Shakuntala. Kalidasa's Shakuntala sought blessings from Goddess Vanadevi, fearing no curse. But Madhusudan's Shakuntala is alarmed by the curse of Vanadevi on Dusmanta. Kalidasa's Shakuntala did not want to repeat the story of 'Bhramara' but Madhusudan's Shakuntala did it repeatedly.

Keywords: Epistolery, Philogynist. Feminism, Shakuntala, Sonnet.

"রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।"[১]

বাংলাসাহিত্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দের রূপকার কবি শ্রীমাইকেল মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' ও সংস্কৃতসাহিত্যের উপমা নৈপুণ্যের শিরোমণি মহাকবি কালিদাসের জগৎখ্যাত রূপক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অনন্য রসময় সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত কাব্য। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এর নায়িকা শকুন্তলা মুগ্ধা শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ, নম্র, প্রাঞ্জলহৃদয়, সরল, উৎসবপ্রিয়া, মিষ্টভাষী, হাস্যমুখর, বল্কলধারী, প্রকৃতিপ্রেমী, অপ্রতিম রূপের অধিকারিণী, তিলোত্তমা ও কোমলহৃদয় নারী। বাংলা সাহিত্যের অভিনবত্বে ইংরেজ কবি মিলটনের

[১] শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), বিবিধ-কাব্য. বঙ্গভূমির প্রতি, পৃষ্টা: ৯

'ব্ল্যাঙ্কভার্স' (Blank Verse) এর অনুকরণে ভাবযতি ও ছন্দোযতির অমিত্রতার আধারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এবং রোমান কবি ওভিদের অনুসরণে 'এপিস্টাইল' (Epistle) বা পত্রকাব্যের ভাবধারায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত একাদশ সর্গ বিশিষ্ট 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রথম সর্গে অর্থাৎ 'শকুন্তলাপত্রিকায়' - "দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা" পত্রে, বর্ণিত শকুন্তলা মধুর, রসময়ী, ব্যথিতচিত্ত, চঞ্চল, ধর্মপ্রাণ, গঞ্জনা সহ্যকারী, পরিত্যক্ত, সন্তানসম্ভবা, ব্যাকুল, অভিযোগকারিণী, প্রোষিতভর্তৃকা, বিনীত ও বিরোহিণী নারী। সুতরাং সরস্বতীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস যেমন দেবী সারদার বরে মহীয়ান্ হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ শকুন্তলা চরিত্র সৃজন করেছেন। তেমনি বাংলা মায়ের কৃপা লাভে কবি মধুসূদনের অমর সৃষ্ট পত্রকাব্য বীরঙ্গনার শকুন্তলাও মধুর রসাস্বাদনে বৈচিত্র্যের ঘনঘটায় চির অমর ও অম্লান। তা কবির স্বকীয় বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে -

"অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি - জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস - কি বসন্ত, কি শরদে।"[২]

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম নাট্যগ্রন্থ হল ভারতমুনির নাট্যশাস্ত্র। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলিতে যেমন যম-যমী, ১০/১০ সরমা-পণি ১০/১০৮ পুরুরবা-উর্বশী ইত্যাদিকে নাটকের প্রাচীনতম রূপ বলে অনেকে মনে করেন। যাই হোক আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে মহাকবি কালিদাস পদ্মপুরাণ বা মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার আখ্যানানুসারে স্বকীয় মহিমায় নতুন ভাবে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট দৃশ্যকাব্যটি রচনা করেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ভাষায় ভিন্নধর্মী রচনারীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন দত্ত চতুর্দশপদী বা সনেট ধর্মী কবিতাবলী পাশ্চাত্য কবি পেত্রার্কের অনুসরণে রচনা করেন। যা স্বতন্ত্রভাবে

[২] শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), বিবিধ-কাব্য. বঙ্গভূমির প্রতি, পৃষ্টা: ৯

বাংলা সাহিত্যের গরিমাকে শ্রীবৃদ্ধি করেছে। তাঁর রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য হল 'বীরাঙ্গনা'। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যের প্রশংসায় বলেছেন-

> "কবিত্ব শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে মধুকবির বীরঙ্গনা কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা"[৩]

সংস্কৃতশাস্ত্রের বিশিষ্ট আলংকারিক আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে পত্রপ্রেরণ, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মৃদু ভাষা, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি ও দূতীপ্রেরণ প্রভৃতি নারীদের প্রেম প্রকাশের বিশিষ্ট রীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের তৃতীয় অংকে দুষ্যন্তের কাছে শকুন্তলার পত্ররচনার বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকে, বাণভট্টের কাদম্বরীতে ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে রুক্মিণীর পত্র লিখনের কথা বর্ণিত আছে। তবে সংস্কৃতসাহিত্যে প্রাচীনকালে কোন পৃথক্ পত্রকাব্য রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা বিভিন্ন রচনার বিভিন্ন পরিসরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কবি মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যটি কোন বা কার রচনা রীতিকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছে? কবি মধুসূদন দত্তের পূর্বে কবি ঈশ্বর গুপ্তের ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় পত্রকবিতার ইঙ্গিত থাকলেও ইংরেজি 'এপিস্টলারি' (Epistolery) বা পত্রকাব্য বা পত্রকবিতার বা লিপি কবিতার যথার্থ রীতি কবি মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেই পাওয়া যায়। 'পাবলিয়াস অভিদিয়াস নাসো' বা 'ওভিদ' একজন রোমান ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি খ্রিস্টপূর্ব ৪৩ জন্মেছিলেন। তাঁর রচিত 'হিরোইডস' (Heroides) পত্রকাব্যের সঙ্গে কবি মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের সাদৃশ্য প্রচুর। যেমন ওভিদের মতনই তিনি পৌরাণিক নারী চরিত্রের গ্রহণ ও হিরোইডসের নাম অনুসারেই বীরাঙ্গনা কাব্যের নামকরণ করেন। তাছাড়া রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে ওভিদের নামোল্লেখ না করলেও ওভিদের ২১ টি পত্রের অনুসরণে কাব্য রচনা ইচ্ছা এবং সময় অভাবে ১১ টি পত্র প্রকাশ করার কথা কবি মধুসূদন দত্ত বলেছেন। সুতরাং কবি মধুসূদন দত্ত

[৩] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৫৩

রোমান কবি ওভিদকে অনুসরণ করেই তার 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যটি লিখেছিলেন তা অনেকাংশেই সত্য। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের ১১টি সর্গের এগারটি পত্রকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা ক) আদর্শ প্রেমপত্রিকা, খ) প্রত্যাখ্যান পত্রিকা, গ) অভিযোগ বা অনুযোগ পত্রিকা ও ঘ) প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীর পত্রিকা। ক) আদর্শ প্রেমপত্রিকা মধ্যে তারা-পত্রিকা, রুক্মিণী-পত্রিকা ও সূর্পনখা-পত্রিকা রয়েছে। খ) প্রত্যাখ্যান পত্রিকার মধ্যে জাহ্নবী-পত্রিকা রয়েছে। গ) অভিযোগ বা অনুযোগ পত্রিকার মধ্যে কেকয়ী-পত্রিকা, জনা-পত্রিকা রয়েছে। ঘ) প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীর পত্রিকা মধ্যে শকুন্তলা-পত্রিকা, দ্রৌপদী-পত্রিকা, ভানুমতী-পত্রিকা , দুঃশলা-পত্রিকা ও উর্ব্বশী-পত্রিকা রয়েছে।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ও কবি মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যদ্বয়ের শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে নানা বৈচিত্র্যগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয়কাব্যেই যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা হলো –

ক) উভয় কাব্যেই বলা হয়েছে শকুন্তলা রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ও অপ্সরা মেনকার গর্ভজাত কন্যা। শৈশবে পিতা ও মাতাকর্তৃক শকুন্তলা পরিত্যক্ত হন।

খ) উভয়কাব্যানুসারে কণ্বমুনি শকুন্তলাকে লালন পালন করেন।

গ) উভয়কাব্যেই কণ্বমুনির অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে আসেন, অতিথি সৎকার গ্রহণ করেন এবং শকুন্তলার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হন।

ঘ) দুই কাব্যেই শকুন্তলা ক্ষত্রকুলোদ্ভব শুনে রাজার প্রেমাসক্তি বাড়ে এবং ঘটনাক্রমে গোপনে গান্ধর্ববিধিতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং রাজা শকুন্তলাকে আশ্রমে রেখে স্বদেশে বা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

ঙ) উভয়কাব্যেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার কোনরূপ তত্ত্বাবধান বা তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি।

চ) দুই কাব্যেই শকুন্তলা দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন।

ছ) উভয়কাব্যেই শকুন্তলার পত্ররচনা প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়।

জ) দুই কাব্যেই শকুন্তলার গান্ধর্ব পরিণয়ের কথা গৌতমী ও মহর্ষি কণ্ব প্রথমে কেউই জানতেন না। কেননা মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থে ছিলেন।

ঞ) দুই কাব্যেই ভ্রমর বৃত্তান্ত ও তার অবসরে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ স্বীকৃত। কালিদাসের শকুন্তলাকে সস্পৃহ বা আগ্রহ সহকারে দেখে রাজা দুষ্মন্ত বৃক্ষের অন্তরালে থেকে শকুন্তলা ও ভ্রমরের প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

"চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুণ্বত্যাঃ পিসি রতিসর্বস্বমধরং বয়ং তত্ত্বাণ্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খালু কৃতী।।"[৪]

ভ্রমর বৃত্তান্ত অনুসারে ভ্রমর শকুন্তলার কম্পিত চঞ্চলিত নয়নের অপাঙ্গকে বারংবার স্পর্শ করে যেন কোন গোপন কথা বলেছে, কানের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে গুঞ্জন করেছে, দুহাত দিয়ে বাঁধা প্রাপ্ত হলেও রতি সম্ভোগের সার অধর সুধা পান করেছে। তাই ভ্রমর ভাগ্যবান, আর সকলে তত্ত্ব অনুসন্ধান করে বিফল হয়েছে মাত্র।

ঞ) উভয়কাব্যেই নিকুঞ্জ বা লতাকুঞ্জ ও লতা মণ্ডপের বর্ণনা রয়েছে। কালিদাস বলেছেন-

"শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্ ।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ।।"[৫]

পদ্মের গন্ধে সুরভিত মালিনী নদীর তরঙ্গের কণা বহনকারী বাতাস। আর কুঞ্জটি বেত্রলতায় তৈরি এবং প্রবেশদ্বারে সাদা বালিতে ভরা।
বীরাঙ্গনায় শকুন্তলা বলেছেন-

"দেখি প্রফুল্লিত ফুল মুকুলিত লতা;
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদ, মরমরে পাতাকুল নাচি;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি,
প্রেমালাপে কপোতীরে মুখে মুখ দিয়া।

[৪] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ শ্লোক- ১/২১

[৫] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ শ্লোক- ৩/৫

সুধি ফুলপুঞ্জে,- 'রে নিকুঞ্জ শোভা,..."[৬]

ট) উভয় কাব্যেই শকুন্তলার গোপন প্রেম, গান্ধর্ববিবাহ ও বিরহের কথা প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া দুই সখী জানে। সখীদ্বয়ের আলাপচারিতায় জানা যায়- গান্ধর্ববিধিতে শকুন্তলার পরিণয় ও যোগ্য বর বা রাজা দুষ্মন্তকে লাভ করায় অনসূয়া আশ্বস্ত হলেও তাঁর মনে সংশয় ঘনিয়েছে।"আত্মনঃ নগরং প্রবিশ্য অন্তঃপুরাসমাগতঃ ইতোগতং বৃত্তান্তং স্মরতি বা ন বেতি"[৭] / রাজধানীতে ফিরে গিয়ে রাজা অন্তঃপুরের মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আশ্রমের এই বৃত্তান্তের কথা স্মরণ রাখবেন কিনা এই নিয়ে অনসূয়ার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রিয়ংবদা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে- "ন তাদৃশা আকৃতিবিশেষাঃ গুণবিরোধিনো ভবন্তি"[৮] / এরকম বিশেষ আকৃতির মানুষ কখনোই গুণবিরোধী কাজ করবেন না, তাছাড়া দৈবক্রমে গুণবান পাত্রে শকুন্তলা পাত্রস্থ হওয়ায় পিতা-কণ্ব খুশিই হবেন- একথা চিন্তা করে তার দুজনেই আশ্বস্ত হয়েছেন। আবার দুর্বাসার অভিশাপ শকুন্তলাকে জানায়নি। "রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী"[৯] অর্থাৎ কমলহৃদয় প্রিয়সখীকে বাঁচাতে হবে। তাই অভিশাপবৃত্তান্ত তাঁরা নিজেদের মধ্যেই গোপন রেখেছেন। প্রিয়ংবদা বলেছেন নবমালিকা লতায় কেউ গরমজল সিঞ্চন করতে চায় না- "কো নাম উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি?"[১০] অপরদিকে বীরাঙ্গনায় শকুন্তলাও সখীদ্বয়ের প্রতি হৃদয়ের আত্মীয়ভাব স্বীকার করেছেন-

"অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন জানে, হায় এ বিজন বনে

[৬] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, অশোক কুমার মিশ্র , পৃষ্ঠা: ২

[৭] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ - ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা - ২৫০

[৮] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ - ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা - ২৫০

[৯] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ - ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা - ২৬৩

[১০] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ - ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা - ২৬৩

অভাগীর দুঃখকথা!"[১১]

বৈসাদৃশ্য:

ক) উভয়কাব্যেই পত্ররচনা প্রসঙ্গ থাকলেও দুটি ভিন্ন পন্থায় হয়েছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ দৃশ্যকাব্যের তৃতীয় অংকে প্রিয় বিরহে ক্লিষ্ট শকুন্তলা মদনশরে বা কামানলে দগ্ধ হয়ে লতাকুঞ্জে দুই সখী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া কর্তৃক পরিচর্যা ও আরাচারিতায় দুষ্যন্তের প্রতি তার অনুরাগ প্রদর্শনকালে সখীদ্বয়ের অনুপ্রেরণায় পদ্মপত্রে নখাঘাতে পত্ররচনা করেন-

"তব না জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি।
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়স্তত্বয়ি বৃত্তমনোরথান্যঙ্গানি"[12]।।

শকুন্তলা রাজাকে নির্দয় বলে সম্বোধন করে বলেছেন, দুষ্যন্তের মনের কথা সে জানেনা কিন্তু তাঁর প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ তাঁর অঙ্গসমূহ নিদারুণভাবে রাত্রিদিন কামদেবের প্রভাবে সন্তপ্ত হয়ে চলেছে।

তবে প্রেমপত্রটির রচিত হলেও প্রেরণের প্রয়োজন হয়নি। কারণ রাজা দুষ্যন্ত স্বয়ং আড়ালে থেকে সমস্ত কথা শুনে ও শকুন্তলার অবস্থা দেখে নিজেই বেরিয়ে আসেন এবং স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করেন। বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদনের শকুন্তলা দুষ্মন্তের পরিণীতা এবং তাঁকে কণ্বাশ্রমে রেখে গেলেও রাজন্তঃপুরে নিয়ে যাবার কোন উপক্রম না করায় এবং তাঁকে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় রাজার প্রতি গভীর অভিমানবশতঃ পত্র রচনায় ব্রতী হয়েছেন। কবিকল্পনায় ব্যাথিতা করুণরসে স্নিগ্ধা শকুন্তলা প্রোষিতভর্তৃকা বা যার স্বামী বিদেশে থাকে সেই নারী বা পত্নীর মত শত অনুযোগে উৎকণ্ঠায় ও মলিনতায় বারংবার রাজা দুষ্মন্তকে বিদ্ধ করেছেন। এটি কবি মধুসূদনের স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

খ) কালিদাসের শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে এবং গান্ধর্ববিধিতে বিবাহের পর স্বামী বা পতিচিন্তায় নিমগ্ন হলে চিত্রপটের ন্যায় অবস্থান

---

[১১] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৩

[১২] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – শ্লোক- ৩/১৪

(*"বামহস্তোপহিতবদনা আলিখিতা ইব প্রিয়সখী"*[13]) করলেও তার গান্ধর্ব পরিণয় বিষয়ে কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না। কিন্তু বীরাঙ্গনায় শকুন্তলা উৎকণ্ঠিত-

"সে তরুর তলে
গান্ধর্ব্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,-
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জধামে !"[১৪]

আশ্রমমাতা কণ্বমুনির ভগিনীর প্রসঙ্গে বলেছেন –

"ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী
পিতৃস্বসা,- মনঃ তাঁর রত তপজপে ;
তা না হলে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে!"[১৫]

মহর্ষি কণ্বের প্রসঙ্গে বলেছেন -

"আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে;
কি কব তাহারে, নাথ, কহ তা দাসীরে?"[১৬]

গ) কালিদাসের শকুন্তলা আনমনা কোমল হৃদয়া, কেবল প্রত্যাখ্যানে বিরহিত হয়েছেন। কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলা ভ্রমপরায়ণা বিচ্ছেদে বিরহ-ব্যাকুলা। শকুন্তলা বলেছেন-

"হায় আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে;
পবন স্বনন যদি শুনি দূর বনে;

---

[১৩] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – ডঃ অনিলচন্দ্র বসু , পৃষ্ঠা: ২৬৩.

[১৪] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা:৩-৪

[১৫] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৪.

[১৬] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, অশোক কুমার মিশ্র , পৃষ্ঠা: ৫-৬

অমনি চমকি ভাবি, - মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর কিঙ্করী সহ; আশার ছলনে
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া ডাকি সখীদ্বয়ে;"[১৭]

অর্থাৎ আশায় মদমত্ব শকুন্তলার চিত্তে পতি চিন্তায় ভ্রম দেখা দেয়। আকাশে ধূলোরাশি, বাতাসের শব্দ দূর বনে শুনে চমকে উঠে ভাবে এই আশ্রমে পদাতিক সৈন্য, অশ্বারোহী, রথ, সারথি, দাস ও দাসী নিয়ে বুঝি রাজা দুষ্মন্ত এলেন। প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ার কাছে বিলাপ করেন। কখনো তিনি ভাবেন পুরবাসীরা তাঁকে নিতে আসছেন, কখনও নিকুঞ্জবনে ছুটে যান তাঁরই খোঁজে। প্রাণচাঞ্চলা শকুন্তলা স্থির হতে পারেন না।

ঘ) কালিদাসের শকুন্তলা বিরহিত হয়ে পুনরায় ভ্রমর বৃত্তান্তের অবতারণা করেননি। কিন্তু বীরাঙ্গনার শকুন্তলা দুষ্মন্তের সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্খায় পুনরায় ভ্রমরকে আক্রমণ করতে বলেছেন তাঁর অধরে। কারণ তখন হয়তো পূর্বের মতো রাজা তাঁকে রক্ষা করতে ছুটে আসবেন -

"ডাকি উচ্চে অলিরাজে; কহি- ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরী
এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা পুরকুলনিধি!"[১৮]

আবার অভিমানে বলেছেন -

"কিন্তু বৃথা ডাকি, ক্লান্ত! কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?"[১৯]

---

[১৭] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ১

[১৮] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ২-৩

[১৯] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৩

ঙ) কালিদাসের শকুন্তলা যে পত্র লেখেন তার বাহক প্রিয়ংবদা হবেন এই স্থির হয় এবং দেবতার নির্মাল্যের ছলে পুষ্পে গোপন করে রাজার হাতে তা পৌঁছানোর কথা হয়-

> "হলা, মদনলেখ অস্মৈ ক্রিয়তাম্। ইমং দেব-শেষো২পদেশেন সুমনো গোপিতং কৃত্বা অস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি"[২০]।

কবি মধুসূদনের শকুন্তলা কখনো প্রভঞ্জন বা বায়ুকে ও কখনো বা কুরঙ্গ বা হরিণকে পত্রপ্রেরক বা বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করতে চেয়েছেন -

> "পদ্মপর্ণ নিয়া
> কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে?
> প্রভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে;-
> উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
> ফেল রাজপদ তলে, যথা রাজালয়ে
> বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি ;
> সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শূন্যমনে ;-
> 'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
> কুরঙ্গ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে"[২১]

চ) কালিদাসের শকুন্তলা দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্তের কথা জানতেন না। দুর্বাসার কঠোর অভিশাপের ফলে পরবর্তীকালে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারেননি। কবি মধুসূদনের শকুন্তলা পতি বিরহে এতই আকুল যে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর দুঃখ দেখে বুঝি বনদেবী রাজাকে অভিশাপ দেবেন। এই আশঙ্কায় সে ভীত, কারণ দুষ্মন্তকে সে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে -

> "অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি - মৃদুস্বরে
> *কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে!*
> শুনি স্রোতনাদ ভাবি - গম্ভীর নিনাদে
> নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি, -

---

[২০] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ , ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, পৃষ্ঠা: ২০৬

[২১] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৩

কাঁপি ভয়ে, পাছে তিনি শাপ দেন রোষে"[২২]।

উপসংহার: বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে আজও দ্বিশতবর্ষেও বাংলামাতৃকার পূজারি কবি শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তের অমৃতময়ি মধুবৎ কাব্যরস সকল পাঠককুলের বা রসপিপাসুদের কাছে পরম আদরের। উভয় কবি ঋগ্বেদাদি সংবাদসূক্তে, পুরাণাদি গ্রন্থে, রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে উল্লেখিত নারী চরিত্রগুলির অন্তরের অন্তর্ভাবগুলিকে প্রস্ফুটিত শতদলের মতো চেতনা ও মূল্যবোধের আলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বীরাঙ্গনার প্রথম সর্গ 'শকুন্তলা পত্রিকায়' কবি মধুসূদন দত্ত মহাভারত বা পদ্মপুরাণ বা অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ বর্ণিত রাজা দুষ্মন্ত বা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেমময় কাহিনীতে নায়কের প্রতি নায়িকার বিরহের দৃশ্যকে অবলম্বন করে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রটির সঞ্চয়ন ঘটেছে। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের ও স্বদেশে প্রত্যাগমনকারী রাজার প্রতি নবপরিণীতা শকুন্তলার হৃদয়ের ভাবাবেগের যে স্পন্দন ফুটে ওঠে, তা মধুসূদনের রসসঞ্চারে মধুর ও করুণ-রসময়ী ব্যাথিতা চিত্তা বিরহিনী গ্রাম্যবধূর অনুযোগ ও অভিযোগের বৈচিত্র্যময় মানবিকতার ঊর্মিমালায় মহাসাগরে পরিণত হয়েছে। তাই উভয় কাব্যে শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্যের ঘনঘটা পরিস্ফুট। উভয়কাব্যেই শকুন্তলা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনকার কন্যা। শকুন্তলা শৈশবে পরিত্যক্তা, মহর্ষি কণ্ব তাঁর পালক পিতা। তপোবনে আগত রাজর্ষি দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, মিলন ও গান্ধর্ব মতে বিবাহ সম্পাদন হয়। দুর্বাসার শাপে অভিশাপগ্রস্তা হলেও সে বৃত্তান্ত তাঁর অজানা। উভয়কাব্যেই শকুন্তলার পত্ররচনা, ভ্রমর বৃত্তান্ত, বেতসকুঞ্জের বর্ণনা, রাজা দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহের পর তপোবনে রেখে স্বদেশে বা নিজের রাজধানীতে প্রত্যাগমন ও স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের পর রাজার কোনো তত্ত্বাবধানে অনাগ্রহতা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। কালিদাসের শকুন্তলা ততটা উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কিত নয়, যতটা মধুসূদনের শকুন্তলা। কালিদাসের শকুন্তলা ভ্রমরবৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি চায়নি। কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলা চেয়েছেন। কালিদাসের শকুন্তলা বনদেবীর আশীর্বাদ চেয়েছেন, অভিশাপ আশঙ্কা করেননি। কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রতি বনদেবীর অভিশাপের

[২২] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ২

শঙ্কায় শঙ্কিত। কালিদাসের শকুন্তলা মদনশরে আক্রান্ত হয়ে অতি অনুরাগে নখাঘাতে পদ্মপত্রে একবার মাত্র প্রেমপত্র রচনা করলেও মধুসূদনের শকুন্তলা বারংবার করেছেন। দুষ্মন্তের প্রতি বিরহ ক্লিষ্ট শকুন্তলা কখনো প্রভঞ্জনকে (বায়ুকে) কখনও আবার কুরঙ্গকে (হরিণকে) দূত হিসেবে প্রেরণ করতে চেয়েছেন। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের অন্তরালে উভয় কাব্যের শকুন্তলা চরিত্রে নারীর প্রগতি ও মুক্তির ইঙ্গিত মেলে ।

শুধু বীরাঙ্গনায় শকুন্তলায় বিরহ যন্ত্রণা প্রকাশিত তা নয়, কালিদাসের শকুন্তলাও নাটকের পঞ্চমাঙ্কে দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখাতা হয়ে তীব্র রোষানলে রাজাকে ভৎর্সনা করেছেন, ক্রন্দন করেছেন, এরপর মাতা মেনকা কর্তৃক স্বর্গের মহর্ষি মারীচের আশ্রমের সদাচারিণী, ব্রতচারিণীর ভূমিকায় উৎত্তীর্ণ হয়েছেন। দুই কাব্যের শকুন্তলা আগে দুষ্মন্তের প্রেমিকা ও এখন ভরতের মাতা। দুষ্মন্তের সঙ্গে পরিচয়, মিলন, বিবাহ, দুর্বাসার অভিশাপ, শকুন্তলার পতিগৃহে গমন ও প্রত্যাখ্যান, মারীচের আশ্রমে পুত্র সর্বদমনের জন্ম ও পালন, পরে স্বর্গ থেকে ফেরার পথে পুত্র ও স্ত্রীর সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের পুনর্মিলনে কালিদাস মর্ত্যের কামজ প্রেমকে ত্যাগ ও তিতিক্ষার কষ্টিপাথরে স্বর্গীয় আত্মিক প্রেমে পরিণত করে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাকে উজ্জ্বলিত ও প্রশংসিত করেছেন। তেমনি চতুর্দশপদী কবিতাবলী বা সনেটের সম্রাট কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সন্তান-সম্ভবা, পরিণীতা, কুল-মান চিন্তারতা, স্বামীর সঙ্গে প্রথম মিলনের স্মৃতি রোমন্থনে রত বিরোহিণী সংসারানভিজ্ঞা অসহায় অন্তর্বেদনায় দগ্ধ নারীর উদ্বেগ যেভাবে তুলে ধরেছেন, তাতে শকুন্তলা নারী মুক্তির ও মঙ্গলময় মানবীর মাগদর্শী হয়েও সহজ ও সরল ভাবাদর্শী মাটির প্রতিমা। তাই তার আকুতি -

"সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি- এই লোভ মনে, -
এই চির আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !"[২৩]

[২৩] মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, ডঃ অশোক কুমার মিশ্র, পৃষ্ঠা: ৫

পরিশেষে বলা যায় যে, মহাকবি কালিদাসের স্বকীয় সৃষ্টি দুর্বাসার অভিশাপে যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা কাহিনী প্রাণোজ্জ্বল ও রমণীয় হয়েছিল, তা কবি মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনার দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার পত্রে আরও পরিপূর্ণতা ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে - একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী:

ক) চক্রবর্তী শ্রীসত্যনারায়ণ, মহাকবি কালিদাস - প্রণীতম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা – ৭০০০০৬, সপ্তম সংস্করণ, ২০১০।

খ) দত্ত ডঃ প্রণব কুমার, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশন-পুনর্মুদ্রণ, ২০১০।

গ) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস শ্রীসজনীকান্ত (সম্পাদিত), বিবিধ-কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড - কলকাতা, ১৯৪১।

ঘ) বসু ডঃ অনিলচন্দ্র, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ৭০০০০৬, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৬।

ঙ) বসু শ্রীচন্দ্রনাথ, শকুন্তলাতত্ত্ব, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশন, ২০০৫।

চ) ব্যানার্জি এ. এল. (সম্পাদিত), মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত বীরাঙ্গনা কাব্য, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭০০০১২, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬১।

ছ) মজুমদার প্রদীপকুমার, ঋগ্বেদের সংবাদসূক্ত অনুবাদ ও আলোচনা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা -৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশন, ২০১২।

জ) মিশ্র ডঃ অশোককুমার, মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১০।

ঝ) মিশ্র ডঃ অশোক কুমার, সাহিত্যের রূপরীতি কোষ, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা – ৭০০০০৯, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৯।

ট) PAGE T.E. and ROUSE W. H.D. (editor), heroides and Amores by Ovid, William Heinemann and Macmillan company, London and New York, 1914.

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 236-254
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.018

ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলা ভাষা

মোঃ রিপন মিয়া, *পিএইচডি ফেলো, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 24.10.2024; Accepted: 28.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ever since the establishment of the state of Pakistan, it has been planned to make Urdu the only state language, excluding Bengali, the language of the majority of the people. The language movement arose on the occasion of the demand to make Bengali the state language. The cultural and economic progress of the Bengali nation was associated with the demand to make Bengali the state language. Bengali nationalism was developed based on Bengali language. And the ultimate form of this Bengali nationalism was the independent state of Bangladesh. Like all political movements during the Pakistan era, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman played an active role in the language movement. By establishing the demand of Bengali language, he thought about building the future of the Bengali nation on the language question. Full recognition of Bengali language was not achieved during Pakistan period. Taking over the governance of independent Bangladesh, Bangabandhu took the initiative to introduce Bengali language at all levels and took various initiatives to teach Bengali language as a medium of education. Bangabandhu Sheikh Mujibur

Rahman's philosophy of education in independent Bangladesh was centered on the medium of education.

Keywords: Bengali language, Language Movement, Bengali Nationalism, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Independent Bangladesh.

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশভারত বিভাজিত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। সকলের সকলের মতো বঙ্গবন্ধুও ভেবেছিলেন হয়ত এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভাগ্যের উন্নতি ঘটবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশাভঙ্গ ঘটে। ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তান একতরফা উর্দুকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। শুরু হয় দুই পাকিস্তানের মানুষের আস্থার সংকট ও বৈষম্য। ভাষার দাবিটি শুধু ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, চাকুরি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ইত্যাদির সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু নিজেই এই ভাষার দাবির ক্ষেত্রে বলেছিলেন "বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার জন্যই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর প্রথম আঘাত হানা হয়। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার আন্দোলন ছিল না; বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ইহার সহিত জড়িত ছিল" (দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের উত্তাল সময়। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অন্যায়, বৈষম্য তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন, অংশ নিয়েছেন এবং এই পর্বের সকল আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিনিয়ে এনেছেন স্বাধীনতা, হয়েছেন দেশের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক। যেহেতু একটি দেশের উত্থানের সঙ্গে তিনি জড়িত সুতরাং দেশটির সূচনালগ্নে যেসব বিষয় বঙ্গবন্ধুকে বেশি ভাবিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল শিক্ষা। ভাষা আন্দোলনের সাথে এদেশের শিক্ষা ও শিক্ষার মাধ্যমের একটি বড় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জড়িত ছিল। বঙ্গবন্ধুর যে শিক্ষাদর্শন লালন করতেন তাঁর অন্যতম অনুসঙ্গ ছিল মাতৃভাষায় পাঠদান পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরই বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষায় পাঠদানের দাবি উথাপন করেন। দেশ স্বাধীন হলে মাতৃভাষায় পাঠদান ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের অনেক আগে ভাষার প্রশ্নে বিতর্ক দেখা যায়। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেই উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে। কিন্তু বাংলাভাষার দাবী নিয়ে প্রথম হাজির হয় দৈনিক আজাদ পত্রিকা। ১৯৪১ সালের জুন মাসে 'রাষ্ট্রভাষার সমস্যা' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু, ভারতে হিন্দি ও পুর্ব পাকিস্তানে বাংলার প্রস্তাব করে (সরকার, ২০২২, পৃ. ৩৬-৩৭)। ১৯৪৩ সালে আবুল মনসুর আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের জবান[1] শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেন-

> যে কোনো এক জাতির ভাষাকে গণভিত্তিতে অন্য স্থান ও অন্য আবহাওয়ায় দুসরা জাতির গণভাষায় পরিণত করা যায় না। ভাষা, খোরাক ও পোশাক স্থানীয় পরিবেশের চাপে, স্থানীয় প্রয়োজনের তাগিদে, যুগ-যুগান্তর ধরে গড়ে ওঠে। এতে সংস্কার চলে, কিন্তু আমূল পরিবর্তন চলে না; এতে নতুন জিনিস ঢোকানো চলে, কিন্তু পুরোনোকে বাদ দেওয়া চলে না। ...তার ওপর আসবে অর্থনৈতিক তারতম্য। বাংলার শিক্ষিত মুসলমান লাখ লাখ যুবক-প্রৌঢ় উর্দু-জ্ঞানের অভাবে হবে বেকার। যারা খাতির-খোশামোদে চাকরি পাবে, তারাও পাবে সাবঅর্ডিনেট পদ। ...বাংলার ওপর উর্দু চাপানোর প্রয়াসের মধ্যেই বাঙালি মুসলমানদের ওপর পশ্চিমা ভাইদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ... কোন জাতির মাতৃভাষা বদলিয়ে এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা একেবারেই অসম্ভব সে জাতিতে, যে জাতির লোকসংখ্যা প্রায় চার কোটি। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা তা-ই। ওদের

[১] প্রবন্ধটি আবুল মনসুর আহমদের কোনো বইয়ে স্থান পায়নি। এটি প্রথম ছাপা হয়েছিল মাসিক 'মোহাম্মদী'র ১৭ বর্ষে, প্রথম সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৫০)। প্রকাশের পরপরই প্রবন্ধটি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। ১৯৪৩ সালে পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে মানুষের ভাষা কী হবে—এ নিয়ে ছিল নানা সংশয়, তর্ক-বিতর্ক। এই প্রেক্ষাপটে প্রবন্ধটি লিখলেন আবুল মনসুর আহমদ। উল্লেখ্য, অগ্রন্থিত এ লেখা ছাপার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে প্রমিত বাংলা বানানরীতি। (সূত্র: প্রথম আলো)

সবাইকে বাংলা ছাড়িয়ে উর্দু শেখানোর চেষ্টা পাগলামি মাত্র (দৈনিক প্রথম আলো ১৭ মার্চ, ২০১৭)।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র তৈরি হচ্ছে এটা নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পত্র পত্রিকায় ভাষা প্রশ্নে সীমিত পরিসরে লেখালেখি চলতে থাকে (ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, ১৯৯৪, পৃ. ১১)। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে পড়লে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দীন আহমদ উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বলে অভিমত দেন (আলহেলাল, ১৯৮৫, পৃ. ১৬৬)। এর প্রত্যুত্তরে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ২৯ জুলাই দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'আমাদের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন (আলীম, ২০২০, পৃ. ৭৫)। । ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মুসলিম লীগের বামপন্থী কর্মীদের উদ্যোগে ঢাকায় জুলাই মাসে 'গণআজাদী লীগ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকাস্থ মুসলিম লীগের নেতা কামরুদ্দিন আহমদ কর্তৃক 'গণআজাদী লীগের' ম্যানিফেস্টোতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়- 'বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ১৩)।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গণ-আজাদী লীগই ভাষার পক্ষে প্রথম দাবী উপস্থাপন করে। ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। গণ-আজাদী লীগ সর্বপ্রথম তাদের মেনিফেস্টোতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুললেও, এ দাবিকে বাস্তবে রূপদানের জন্য পুস্তিকা প্রকাশ, সেমিনার ও সভা-সমাবেশ আয়োজন করে তমদ্দুন মজলিস (আলীম, ২০২০, পৃ. ৭৮)। সংগঠনটি তাদের সভা, সমাবেশ ও প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস আদালতের ভাষা করার দাবী করে। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু না বাংলা' শিরোনামের একটি পুস্তিকায় কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং আবুল কাশেম রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে যুক্তি ও দাবী তুলে

ধরেন, এমনকি প্রয়োজনবোধে আন্দোলন গড়ে তুলতে আহবান জানান (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ৩৬)।

কলকাতা জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৪৫)। তমদ্দুন মজলিশের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সংশ্লিষ্টতা ছিল। তমদ্দুন মজলিশের কর্মসূচিতে শেখ মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণও করেন। (ইসলাম, ২০০২, পৃ. ১০৭; আলীম, ২০২০, পৃ. ৭৮; সরকার, ২০২২, পৃ. ৪৮)। এরপর ভাষার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিটি কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যায়।

তমদ্দুন মজলিশের পর ভাষার প্রশ্নে ভূমিকা পালনকারী দ্বিতীয় সংগঠন গণতান্ত্রিক যুবলীগের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের যোগসূত্রের সন্ধান মেলে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে কিছু প্রগতিশীল ছাত্রনেতা নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাদের ভূমিকা ও করণীয় নিয়ে কলকাতায় মিলিত হন, পরে তারা ঢাকায় এসে কামরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ, তাসাদ্দুক আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল ওয়াদুদ, হাজেরা মাহমুদ প্রভৃতির সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ করেন (উমর, ২০১১, পৃ. ২২)। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতেই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক মাসের কম সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক যুবলীগের জন্ম তৎকালীন রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের শুভ সূচনার লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় (হান্নান, ২০০০, পৃ. ৮৮)। শুরু থেকেই গণতান্ত্রিক যুবলীগ বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস আদালতের ভাষা হিসেবে চালুর ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা রাখে (উমর, ২০১১, পৃ. ২২)। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

> প্রথমে ঠিক হল, একটা যুব প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে, যে কোন দলের লোক এতে যোগদান করতে পারবে। তবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে যতখানি দূরে রাখা যায় তার চেষ্টা করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম

> হবে 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। আমি বললাম, এর একমাত্র কর্মসূচি হবে সাম্প্রদায়িক মিলনের চেষ্টা, যাতে কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়, হিন্দুরা দেশ ত্যাগ না করে (রহমান, ২০১২, পৃ. ৮৫)।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় করাচীতে, ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর হতে ১ ডিসেম্বর। এই সম্মেলনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু বিষয়ে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় (উমর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৩০)। এর প্রতিবাদে ৫ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রতিবাদ মিছিল হয় সেখানে অন্যান্যদের সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান (ইসলাম, ২০০২, পৃ. ১০৮)। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ দিন দিন বাড়তে থাকে। ভাষা আন্দোলনে সরকার বিরোধী প্রধান সংগঠন ছিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে সংগঠনটির জন্ম। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগঠন এবং এই সংগঠনে বঙ্গবন্ধুর শতভাগ নিয়ন্ত্রণ ছিল। এর আহবায়ক নির্বাচিত হন নইমউদ্দিন। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন দাবিগুলোর অন্যতম ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাঠদান (সরকার,২০২২, পৃ. ৪৬-৪৭)। বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন "ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠান গঠন করার সাথে সাথে বিরাট সাড়া পাওয়া গেল ছাত্রদের মধ্যে। এক মাসের ভিতর আমি প্রায় সকল জেলায়ই কমিটি করতে সক্ষম হলাম। যদিও নইমউদ্দিন কনভেনর ছিল, কিন্তু সকল কিছুই প্রায় আমাকেই করতে হত"। ভাষা আন্দোলনে এই দল একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। তমদ্দুন মজলিশের সাথে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও ভাষা আন্দোলনকে একটি গণ আন্দোলনে রূপ দিতে এই সংগঠন সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ১৮)।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন (হান্নান,২০০, পৃ. ৯২)। ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব নাকচ হয়। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে পাকিস্তানকে একটি মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণার পাশাপাশি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন (ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, ১৯৯৪, পৃ. ১২)। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের

প্রস্তাব বাতিল ও লিয়াকত আলী খান কর্তৃক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার খবর পূর্ব পাকিস্তানে এসে পৌছালে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়ে মিছিল, মিটিং ও ধর্মঘট পালন করে (রহিম ও অন্যান্য, ২০১৩, পৃ. ৪৫৪)।

ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন বেগবান করা ও সাংগঠনিক রূপদানের জন্য ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে শেখ মুজিব সদস্য না হলেও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে এই পরিষদে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদকে দিয়েছিলেন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৫১ ও উমর, ২০১৫, পৃ. ৩৫)। এর আহবায়ক হন শামসুল আলম। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন-

> করাচিতে সংবিধান সভার (কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলি) বৈঠক হচ্ছিল। সেখানে রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে বিষয়েও আলোচনা চলছিল। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লীগ সদস্যেরও সেই মত। কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করলেন বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক। কারণ, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা হল বাংলা। মুসলিম লীগ সদস্যরা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। আমরা দেখলাম, বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস এর প্রতিবাদ করল এবং দাবি করল, বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা হবে। আমরা সভা করে প্রতিবাদ শুরু করলাম। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগও তমদ্দুন মজলিস যুক্তভাবে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে একটা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করল (রহমান, ২০১২, পৃ. ৯১)।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাজীউল হকের মতে সেদিন সভায় আপোষকারীদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়কসহ অনেকেই তখন দোদুল্যমানতায় ভুগছে,

আপোষ করতে চাইছে সরকারের সঙ্গে। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জোরালো দাবির কারণে সিদ্ধান্ত হয় পরদিন ধর্মঘট ও সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে। বঙ্গবন্ধুর সে প্রস্তাবে সমর্থন দেন অলি আহাদ, তোয়াহা, মোগলটুলীর শওকত ও শামসুল হক। বঙ্গবন্ধুর কারণেই সেদিন আপোষকামীদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায় (হক, ১৯৯৪, পৃ. ২৫)। এ সম্পর্কে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে অলি আহাদ বলেছিলেন "সেদিন সন্ধ্যায় যদি মুজিব ভাই ঢাকায় না পৌঁছাতেন তাহলে ১১ মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না" (হক, ১৯৯৪, পৃ. ২৫)। ১১ মার্চের ধর্মঘটে ছাত্র জনতার উপর নির্মম নির্যাতন করা হয় (হান্নান, ২০০০, পৃ. ৯৩)। শামসুল হক, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক ছাত্র সেদিন গ্রেফতার হন (আলহেলাল, ১৯৮৫, পৃ. ২২৯)।। ১১ মার্চের কর্মসূচি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-

> সভায় ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হল। জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ঐ তারিখের তিন দিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে এলাম। দৌলতপুরে মুসলিম লীগ সমর্থ ছাত্ররা আমার সভায় গোলমাল করার চেষ্টা করলে খুব মারপিট হয়, কয়েকজন জখমও হয়। এরা সভা ভাঙতে পারে নাই, আমি শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা করলাম। ... কাজ ভাগ হল-কে কোথায় থাকব এবং কে কে পিকেটিং করার ভার নেব। সামান্য কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া শতকরা নব্বই ভাগ ছাত্র এই আন্দোলনে যোগদান করল (রহমান, ২০১২, পৃ. ৯২-৯৩)।

ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত 'সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টালিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (Secret Documents of Intelligence Branch on Father of The Nation, Bangladesh: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman)' এ। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা সেই ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতেই তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং এ কারণে তাঁর ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করার নির্দেশ জারি হয়। তাঁর জন্য খোলা

বিশেষ ফাইলের নম্বর ছিল পিএফ-৬০৬- ৪৮। এ ফাইলের প্রথম খণ্ডে ১১ই মার্চের হরতাল প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে: '১১ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে (দাশগুপ্ত, ২০২০, পৃ. ৪৬)।

দিন দিন ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। ওদিকে জিন্নাহর ঢাকা সফরের আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে বৈঠক করেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকে দাবী মেনে নিয়ে ৮ দফা চুক্তি করেন এবং বন্দীদের মুক্তি দেন।[২] এই ৮ দফা চুক্তির খসড়া তৈরি করার পর আবুল কাসেম ও কামরুদ্দীন আহমদ জেলখানা গিয়ে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দদের দেখিয়ে চূড়ান্ত করেন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৫৬)। নাজিমুদ্দিনের সাথে চুক্তি অনুযায়ী শেখ মুজিব ১৫ মার্চ জেল থেকে ছাড়া পান। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় (দাশগুপ্ত, ২০২০, পৃ. ৪৪)। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হল (রহমান, ২০১২, পৃ. ৯৬)।

এরপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে এসে একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন (ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, ১৯৯৪, পৃ. ১২)। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ বাংলাভাষি মানুষের দাবি ও অধিকারকে তিনি উপেক্ষা করলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই ঘোষণা ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা (রহিম ও অন্যান্য,২০১৩, পৃ. ৪৫৪)। বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংস করার এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ (রহিম ও অন্যান্য,২০১৩, পৃ. ৪৫৪)। জিন্নাহর সমাবেশস্থলেই কিছু ছাত্র তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। জিন্নাহর সমাবেশস্থলেই কিছু ছাত্র তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া ছিল সাংঘাতিক। জিন্নাহকে

[২] আট দফা চুক্তিতে ছিল ১. বন্দিদের মুক্তি ২. ছাত্র বিক্ষোভে পুলিশি নির্যাতনের তদন্ত ৩. ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ৪. আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রহিত ৫. বাংলাকে প্রাদেশিক সরকারি ভাষার মর্যাদা ৬. শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রাদেশিক সংসদীয় সভায় বাংলা প্রচলন ৮. সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হলে বানানো গেট ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে ফেলে (করিম, ২০০২, পৃ. ৪)।

২৪ মার্চ সন্ধ্যায় জিন্নাহর সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করেন। জিন্নাহ খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে করা ছাত্রদের চুক্তি অস্বীকার করেন এবং তাতে জোরপূর্বক নাজিমুদ্দদিনের স্বাক্ষর নেয়ে হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। ছাত্রদের সাথে সাক্ষাতেও তিনি বাংলা ভাষার দাবি সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করেন এবং উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন (উমর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪৩)। জিন্নাহ চলে যাওয়ার পর ফজলুল হক হলের এক সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গৃহীত হয়। শেখ মুজিব লিখেছেন- "বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি। সাধারণ ছাত্ররা আমাকে সমর্থন করল" (রহমান, ২০১২, পৃ. ১০০)।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ সরকারের দমন-পীড়ণের কারণে ভাষা আন্দলনের গতি কিছুটা কমে যায় (আলীম, ২০২০,পৃ. ৭৭)। ১৯৪৮ এর ভাষা আন্দোলনের এই পর্বে শেখ মুজিবের হাতে গড়া সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল (আলীম, ২০২০,পৃ. ৪২)। পরবর্তী তিন বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষা দিবস উদযাপন করে (রহিম ও অন্যান্য,২০১৩, পৃ. ৪৫৪)। ১৯৪৯ সালে আরবি হরফে বাংলা লেখা চালুর একটি প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ২০ টি কেন্দ্রে আরবি হরফে লেখা বাংলার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করা হয়। আরবি হরফে বাংলা বই ছাপিয়ে তা বিনামূল্যে ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করা হয় এমনকি আরবি হরফে পাঠ্যপুস্তক লিখলে তাদের পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয় (উমর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪৬)। প্রতিবারের ন্যায় এবারও ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদ করে। সভা, সমাবেশ, সেমিনার, বিবৃতি ছাড়াও মিছিল মিটিং এমনকি গ্রেফতারের ঘটনাও ঘটে(হান্নান, ২০০০, পৃ. ১২১)।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টনে মুসলিম লীগের সম্মেলনে খাজা নাজিমুদ্দিন ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ভাষার প্রসঙ্গে বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু (ইসলাম, ২০২০, পৃ. ৮৮)। তাঁর এই ভাষণকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ভাষার দাবীতে চূড়ান্ত আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি প্রতীকী ধর্মঘট ও সভা আহবান করে। ৩১ জানুয়ারি গঠিত হয় 'সর্বদলীয় ব্রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', যার আহবায়ক হন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সহ সভাপতি কাজী গোলাম মাহবুব। ভাষা আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুলতে ৩০শে জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সংগ্রাম কমিটিতে আওয়ামী লীগ, যুব লীগ, রাব্বানী পার্টি, ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে দু'জন দু'জন করে প্রতিনিধি নেয়া হয়। কমিটির আহবায়ক ছিলেন গোলাম মাহবুব। শেখ মুজিবুর রহমান সেসময় জেলে ছিলেন। (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ৩৭)।

৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়, ধর্মঘট শেষে সিদ্ধান্ত হয় ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে, একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হবে ও সেদিন থেকে ভাষার দাবীতে সর্বাত্মক হরতালের কর্মসূচি দেয়া হবে (ইসলাম, ২০১৭, পৃ. ৩৮)।

এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে শেখ মুজিব লিখেছেন-

> ছাত্রলীগই তখন ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান । রাজি হল। অলি আহাদ ও তোয়াহা বলল, যুবলীগ রাজি হবে। আবার ষড়যন্ত্র চলছে বাংলা ভাষার দাদিকে নস্যাৎ করার। এখন প্রতিবাদ না করলে কেন্দ্রীয় আইনসভাৰ পাস করে নেবে।... পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের

> কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে। আমি আরও বললাম, 'আমিও আমার মুক্তির দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব।

জেলে থেকেও শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে তাকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শেখ মুজিব কারাগারে অনশন শুরু করেন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৬৫)। সরকার বিচলিত হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৪৪ ধারা ঘোষণার ফলে ছাত্র নেতারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় (উমর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৫৫)। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্বিদ্যালয়ে ছাত্ররা সভায় সমবেত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়। হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে ছাত্রদের প্রথম দলটি ১৪৪ ধারা ভেঙে রাস্তা নেমে পড়ে। শুরু হয় ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ। ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। গুলিতে সালাম, রফিক, বরকতসহ অনেকে নিহত হন। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা শহরের পরিস্থিতির উপর কোন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ ছিল না (উমর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬১)।

ভাষা আন্দোলনে ধীরে ধীরে শেখ মুজিবুর রহমানের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। শুরুর দিকে তমদ্দুন মজলিশের সাথে সংযোগ, সেই সংযোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ভাষা আন্দোলনে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা রাখে। ১৯৪৯ সালে যুক্ত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। ভাষা আন্দোলনে কোন একক নেতৃত্ব ছিল না। কিন্তু ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক পর্যায় থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকাই প্রধান (আলীম, ২০২০, পৃ. ১৪২)। জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছাত্র নেতা থাকাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ সেসময় তাঁর শক্তিশালী অবস্থানের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আবার ভাষা আন্দোলনের পরের বছর ১৯৫৩ সালে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ভাষার দাবীতে চূড়ান্ত আন্দোলনে তিনি জেলে ছিলেন কিন্তু জেল থেকেই তিনি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন। ১৯৪৮ সাল ১১ মার্চ

থেকে ১৯৫২ ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৪৪৭ দিনের মধ্যে ২৮৩ দিন মুক্ত ছিলেন (সরকার, ২০২২, পৃ. ৬৩)। অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর একটি সাক্ষাৎকার নেন সেখানে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, বাংলাদেশের কল্পনা কবে তাঁর মনে আসে। উত্তরে বলেছিলেন ১১ই মার্চ, ১৯৪৮ (সরকার, ২০২২, পৃ. ৪৪)। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর এই দীর্ঘ কারাবাস এ কথাই প্রমাণ করে যে পাকিস্তান সরকারও তাঁর মধ্যে ভবিষ্যত নেতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিল তাই তাকে জেলে আটকিয়ে রাখত। ভাষা কে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবের এই যে দর্শন সেটা ভবিষ্যত বাংলাদেশ বিনির্মাণেরই অংশ, কারণ তিনি জানতেন একটি জাতিকে এগিয়ে নিতে তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতি হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। তাই তিনি ভবিষ্যত বাংলাদেশের পথে হেটেছেন এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

শিক্ষার মাধ্যম ও বাংলা ভাষা: ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়ার যে চেষ্টা সেটা শুধুমাত্র ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সাথে জড়িয়ে ছিল বাঙালি জাতিকে সাংস্কৃতিকভাবে ধ্বংস করে পদানত করে রাখার ষড়যন্ত্র, জড়িত ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন (*দৈনিক আজাদ,* ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বচ্ছ অবস্থান ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের অনেক আগেই তিনি তা স্পষ্ট করেছেন। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের শিক্ষানীতির পরিবর্তন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলনের দাবি জানান। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচী ঘোষণায় বলা হয়-

> পাকিস্তানের সর্বঅঞ্চলে মাতৃভাষাকে সর্বোচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে যতশীঘ্র সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করিতে হইবে এবং পাকিস্তানের সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উন্নতি ও

> বিকাশের জন্য কার্যকরী উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে (রহমান ২০০৯, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৭৫-৪৭৮)।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত হলেও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু ও বাংলা ভাষার মর্যাদা পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়ত সেই দুঃখবোধ থেকেই দেশ স্বাধীন হওয়ারও আগে বঙ্গবন্ধু ভাষা নিয়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'অমর ভাষা আন্দোলন স্মরণ সপ্তাহ' উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আওয়ামী লীগ যেদিনই ক্ষমতা গ্রহণ করিবে সেইদিন হইতে সরকারী ও বেসরকারী সকল পর্যায়ে বাংলা চালু করা হইবে" (দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)। তিনি আরও বলেন- 'বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তারপর বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদেরা যত খুশি গবেষণা করুন আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে ভাষা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা যাবে' (মান্নান, ২০২১, পৃ. ১৩৮)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু ১৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কর্মদিবসেই ইংরেজি ভাষায় লেখা নথি ফেরত দিয়ে বাংলায় লেখা নথি উপস্থাপন করতে বলেছিলেন (সরকার ২০২২, পৃ. ৯৮)। ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম বাংলার ঘোষণা দেওয়া হয়। সরকারি এক প্রেসনোটের মাধ্যমে এ ঘোষণা দেয়া হয়। প্রেসনোটে বলা হয়-

> গতকাল (শনিবার) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দফতর হইতে ঘোষণা করা হয় যে, অনতি- বিলম্বে দেশের পাঠশালা হইতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা চালু হইবে। যেসমস্ত ছাত্র-ছাত্রী উর্দু ও ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে রহিয়াছে, তাহাদের এক হইতে দুই বৎসরের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পাসের পর পরবর্তী স্তরে তাহাদের অবশ্যই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯৭৪

> সালের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে বাংলা শিক্ষার মাধ্যমরূপে কার্যকরী হইবে (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টের উদ্বোধনী ভাষণে বাংলা ভাষায় রায় লেখার জন্য বিচারপতিদের আহবান জানান (আলী, ২০২২, পৃ. ৪৭২)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ভাষার বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রাধান্য ঘোষণা দেয়া হয় (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ২০১৫, অনুচ্ছেদ ৩ ও ১৫৩)। সরকারের সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে 'সরকারী পর্যায়ে বাংলা প্রচলন কমিটি' গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে পরিপত্র জারি করা হয় (আলী, ২০২২, পৃ. ৪৭২)। ১৯৭২ সালের শুরুতেই বাংলা ভাষার গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সরকারি অর্থের বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পাকিস্তান আমলে শিক্ষার উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব পালন করত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৭ মে এই প্রতিষ্ঠানকে সাবেক 'বেঙ্গলি একাডেমী'র সঙ্গে একীভূত করে নতুনভাবে সমন্বিত বাংলা একাডেমি' গঠন করা হয়। বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক পদে সরকার অধ্যাপক মযহারুল ইসলামকে নিয়োগ দেয়া হয়। কাজের ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বাংলাভাষায় প্রণয়নের দায়িত্ব সমন্বিত বাংলা একাডেমির ওপর পড়ে। বাংলা ভাষার গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উচ্চস্তরের জন্য বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশে বাংলা একাডেমি ভূমিকা আজও ইতিবাচক (ইমাম, ২০১৮, পৃ. ২৮৭)। শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম উদ্যোগ ছিল কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বার্থক করে তুলতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষায় রচিত বইয়ের অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করে নিয়ে কমিশন বাংলাভাষায় উচ্চস্তরের বই লেখার উপর জোর দেয়। শিক্ষা কমিশন দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করার

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার উপরও গুরত্ব দেয় (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪, পৃ. ১৩-১৪)। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষার উপস্থাপন নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার একটি বড় মাইলফলক। এত উদ্যোগ সত্ত্বেও কর্মকর্তাদের মধ্যে বাংলাবিদ্বেষী মনোভাব দেখা যায়। ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ বঙ্গবন্ধু আরো জোরালো আদেশ জারি করেন। আদেশে বলা হয়-

> বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, স্বাধীনতার তিন বৎসর পরেও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজী ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যার ভালবাসা নেই দেশের প্রতি যে তার ভালবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাংগালী কর্মচারীরা ইংরেজী ভাষায় নথিতে লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না। (সরকার, ২০১৬, পৃ. ১৭)

উপসংহার: স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে দেশ পুনর্গঠনের ভাবনা পাকিস্তান আমল থেকেই তাঁর ভিতর সক্রিয় ছিল। যেহেতু একটি দেশের উত্থানের সঙ্গে তিনি জড়িত সুতরাং দেশটির সূচনালগ্নে যেসব বিষয় বঙ্গবন্ধুকে বেশি ভাবিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা। শিক্ষা একটি জাতির মানসগঠনে মূল ভূমিকা পালন করে, তাই বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রগঠনে এই দিকটির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যম কী হবে সেটা পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই এদেশের লেখক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও জনগণ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবিতে সংঘঠিত হয় রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পূর্ণ স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিপূর্ণ স্বীকৃতির পাশাপাশি

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের একটি অন্যতম দিক। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনাকে যেমন স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পটভূমি ও বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখা হয় ঠিক একইভাবে শিক্ষার মাধ্যম বাংলাভাষাও ছিল বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

তথ্যসূত্র:

১) বশীর আলহেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫।

২) জীনাত ইমতিয়াজ আলী, বাংলা ভাষা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। শেখ হাসিনা (সম্পাদিত), জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশত স্মারকগ্রন্থ, জার্নিম্যান বুকস, ঢাকা, ২০২২।

৩) এম আবদুল আলীম, বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০।

৪) এইচ, টি ইমাম, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-১৯৭৫, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৮।

৫) এস, এ, এম, জিয়াউল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন, তাম্রলিপি, ঢাকা ২০২০।

৬) মযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২।

৭) মযহারুল ইসলাম, ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব, আগামী, ঢাকা, ২০১৭।

৮) সিরাজুল ইসলাম, (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), (১ম খন্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩।

৯) সিরাজুল ইসলাম, (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), (৩য় খন্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩।

১০) বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

১১) বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড সূবর্ণ, ঢাকা, ২০১১।

১২) বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫।

১৩) সরদার ফজলুল করিম, সেই সে কাল, কিছু স্মৃতি কিছু কথা, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০২।

১৪) মো, রিয়াদ খান, (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন ও ভাবনা, ইতিহাস প্রকাশন, ঢাকা, ২০২৩।

১৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা, ২০১৫।

১৬) অজয় দাশগুপ্ত বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন কৌশল ও হরতাল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০।

১৭) বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, (সম্পাদিত), ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪।

১৮) বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৭৪।

১৯) শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১২।

২০) শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭।

২১) শেখ মুজিবুর রহমান, আমার দেখা নয়াচীন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০।

২২) হাসান হাফিজুর রহমান, (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, (২য় খণ্ড), হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯।

২৩) মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, ষোড়শ সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০১৩।

২৪) ডি, এম, ফিরোজ শাহ, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০।

২৫)স্বরোচিষ সরকার, সর্বস্তরে বাংলাভাষা আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬।

২৬)স্বরোচিষ সরকার, বঙ্গবন্ধু ও বাংলা ভাষা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২২।

২৭)জামাল বিন সিদ্দিক, (সম্পাদিত), মুখোমুখি বঙ্গবন্ধু, বাতিঘর, ঢাকা, ২০২২।

২৮)গাজীউল হক,, ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা। বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র (সম্পাদিত),ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪।

২৯)মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২।

৩০)শেখ হাসিনা, (সম্পাদিত),*জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশত স্মারকগ্রন্থ*, সম্পা, জার্নিম্যান বুকস, ঢাকা, ২০২২।

৩১)সৈয়দ আনোয়ার হোসে, *বঙ্গবন্ধু নেতা ও নেতৃত্ব*, অন্যধারা, ঢাকা, ২০২১।

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 255-275
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.019

জহির রায়হানের গল্প: রাজনৈতিক চেতনার বিপ্রতীপে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বিবর্ণ দিনলিপি

ড. প্রতাপ ব্যাপারী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ শালবনি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 18.10.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract

In the cultural landscape of Bangladesh, Zahir Raihan stands as a prominent figure. Though widely known as a successful filmmaker, his contributions transcend cinema, extending profoundly into literature. In post-1947 East Bengal, then East Pakistan, Raihan distinguished himself by not merely limiting his creativity to writing; he actively experimented with themes and narrative styles. His first and only published collection of short stories, 'Surya Grahan', vividly portrays the social, cultural, and historical depths of Bangladesh. His works capture the essence of rural life, the historical significance of the Language Movement, and the harrowing struggles of the 1971 Liberation War. Through Raihan's unique artistic lens, he portrayed the lives in remote Bengali villages alongside the poignant narratives of the freedom struggle, effectively uncovering layers of social injustice and humanity's disregard within each storyline.

Keywords: Language Movement, Liberation War, Class Disparity, Plight of Women, Religious Superstition, Crisis of the Middle Class, Social Injustice.

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে জহির রায়হান একজন প্রতিষ্ঠিত নক্ষত্র। একজন সফল চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও রায়হানের খ্যাতি কেবল চিত্র পরিচালনার সীমিত পরিসরেই আবদ্ধ থাকেনি, কথাসাহিত্যের বিস্তৃর্ণ পরিসরেও ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের কথাসাহিত্যের ধারায় জহির রায়হান স্বতন্ত্র এই কারণে যে, কেবল লেখালেখির মধ্যেই তাঁর কর্মপ্রবাহকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাঁর সৃজনকর্মের বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে তিনি রীতিমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এর পেছনে রয়েছে তাঁর পরিচালক-সত্তা। অন্যান্য কথাশিল্পীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানেই যে, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকে তিনি কেবল জীবনশিল্পীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেননি, একইসঙ্গে চিত্রশিল্পীর মতো ক্যামেরা দিয়ে লেন্সবন্দিও করেছেন। ফলে স্থান-কাল-চরিত্রের জটিল ঘূর্ণাবর্ত কেবল মুদ্রিত আকারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেলুলয়েডের পর্দায় সজীব রক্ত-মাংসের চরিত্র হিসেবেও উপস্থাপিত হয়েছে। কোথাও যেন কারুশিল্পী আর কথাশিল্পী রায়হান একাত্ম হয়ে গেছেন।

জহির রায়হানের জন্ম ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালি জেলার মজুপুর গ্রামে। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। ডাকনাম ছিল জাফর। মার্কসবাদী পার্টির নেতা মণিসিংহ তাঁর নাম দিয়েছিলেন রায়হান। সবমিলিয়ে নাম হয় জহির রায়হান। কমিউনিজমের ছোঁয়াতেই তাঁর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। পিতা কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকার কারণে রায়হানের স্কুল-শিক্ষা জীবনের প্রথমপর্ব অতিবাহিত হয়েছে রাজনৈতিক শ্লোগানমুখর নাগরিক কলতানের মধ্যে। অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার ছিল রায়হানের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু। এ-প্রসঙ্গে রায়হানের আরেক ভাই শাহরিয়ার কবির স্মৃতিচারণায় জানাচ্ছেন—

> ‘‘চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি জহির রায়হান যখন স্কুলের নীচের ক্লাশের ছাত্র, তখন অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাবে তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। শহীদুল্লাহ কায়সার তখন

কোলকাতার একজন ছাত্রনেতা। প্রকাশ্যে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে এবং গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। জহির রায়হান তখন পার্টি-কুরিয়ার ছিলেন। পার্টির আত্মগোপনকারী সদস্যদের মধ্যে চিঠিপত্র ও খবর আদান প্রদানের কাজ করতেন। প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'স্বাধীনতা' বিক্রি করতেন। সেই আমলের একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জহির রায়হান সম্পর্কে বলেছেন, 'তখন ও ভালোভাবে হাফপ্যান্টও পরতে জানতো না। প্রায় বোতাম থাকতো না বলে একহাতে ঢোলা হাফপ্যান্ট কোমরের সাথে ধরে রাখতো। রায়হান ছিল ওর 'টেকনেম'— পার্টি পরিচয়ের ছদ্মনাম (তার পিতৃদত্ত নাম জহিরউল্লাহ)। বড়ভাইর প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলো।'''[১]

রায়হানের বয়স যখন মাত্র দশ বছর, তখন তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পাশাপাশি 'ভিয়েতনাম দিবসে'র মিছিলেও যোগদান করেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতির হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গেই রায়হানের লেখালেখির সূত্রপাত। সাবলীল বাংলা লেখার গুণ তিনি আয়ত্ত করেছিলেন সহজাতভাবেই। মাত্র বারো বছর বয়সেই রায়হান এক বৃহন্নলাকে কেন্দ্র করে লেখেন 'ইন্দ্রাণী' নামের একটি গল্প। এরপর 'মালবিকা' নামের একটি গল্প। কোনোটিই মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু লেখালেখির সূচনাকালে গল্পের বিষয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই রায়হানের স্বকীয়তা টের পাওয়া যায়। গতানুগতিক বাল্যের রোমাঞ্চমুখর রঙিন পরিবেশে রায়হান বড়ো হননি, তিনি বেড়ে উঠেছেন রাজনীতির রাজপথে ইস্তেহার হাতে। সেকারণে ছাত্রাবস্থা থেকেই পরিণত জীবনবোধ তাঁর চেতনাকে যেমন ঋদ্ধ করেছে, তেমনি চরিত্রে এনেছে দৃঢ়তা।

জহির রায়হানের প্রথম এবং একমাত্র প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' (১৯৫৫)। ১৯৭৯ সালে সন্ধানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় 'জহির রায়হানের গল্পসমগ্র'। এখানে মোট উনিশটি গল্প স্থান পেয়েছে। এই উনিশটি গল্পই ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত 'জহির রায়হান রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গল্পগুলোতে বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, এবং

ইতিহাসের গভীর প্রেক্ষাপট এক অনন্য শিল্পরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। রায়হানের লেখায় মুখ্য হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার চিরায়ত জীবনের একান্ত ছবি, ভাষা-আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত পথচলা। তাঁর শিল্পীসত্তা বাংলার নিভৃত গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে মুক্তিসংগ্রামের মর্মস্পর্শী আখ্যানকে এমনভাবে তুলে ধরেছে যে, তাতে সামাজিক অবিচার এবং মানবতার প্রতি অবজ্ঞার প্রতিটি স্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নাগরিক ব্যস্ততার মাঝে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সামাজিক সংকটের এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি 'হারানো বলয়' গল্পটি। দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র, আলম এবং আরজু, তাদের ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিচারণের ভেতর দিয়েই গল্পের বিস্তৃত কাহিনি রচনা করেছেন গল্পকার। এই কাহিনিতে প্রেম একটি পটভূমি মাত্র; আসল উপজীব্য হলো সমাজের বিবেকহীনতা, নির্দয়তা এবং কঠোর আর্থিক সংকট। মধ্যবিত্ত কেরানী আলম এবং তার একসময়ের প্রেমিকা আরজু— দু'জনেরই জীবনে অনেক কিছু বদলে গেছে। গল্পের শুরুতে দেখা যায়, প্রায় দুই বছর পর তাদের পুনরায় দেখা হয় শহরের এক ফুটপাতে। কলেজে তারা ছিল অন্তরঙ্গ, কিন্তু অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে তাদের সম্পর্ক পূর্ণতা পায়নি। আলম জানতে পারে যে আরজুর পরিবারের অবস্থা শোচনীয়— তার বাবা মারা গেছেন, দাদা জেলে, বোন ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং বাড়িতে আরও ছোট ভাইবোন এবং বৃদ্ধা মা আছেন, যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আরজুর কাঁধে। কিন্তু আলম নিজেও এতটাই সংকটে যে, কোনো সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। গল্পকার, তাঁর সূক্ষ্ম বর্ণনায়, আলমের জীবনের যে কঠোর বাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা শুধু আলমের নয়, পুরো সমাজেরই একটি প্রতিচ্ছবি। ক্যান্সার আক্রান্ত ছোটবোনের মৃত্যুর পর কবর থেকে ফেরার সময় পুনরায় আলমের সঙ্গে দেখা হয় আরজুর। এক শোকগ্রস্ত এবং বিধ্বস্ত আরজুকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করলেন গল্পকার—

> ''মাটির দিকে চুপ করে চেয়ে রইলো আরজু। তারপর এক সময় মুখ তুললো আলমের দিকে— কেন কাঁপছি জানো? দুটো দিন, এক মুঠো ভাতও খেতে পাইনি আমি, শুধু আমি নই— আমার ছোট ছোট ভাইবোন, আমার বুড়ো মা কেউ খায়নি। সবাই উপোস।''[২]

আরজুর এই সংলাপে ফুটে ওঠে জীবনের বঞ্চনা, আর্থিক দুর্দশা এবং অক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ। গল্পের অন্যতম মর্মান্তিক দৃশ্য হলো আলমের ভেতরকার স্বার্থপরতার ঝলক। যদিও আলম আরজুর প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করে, কিন্তু তার নিজের সংকট তাকে সংবেদনশীলতার এক ভিন্ন পথে পরিচালিত করে। বেতনের টাকা হাতে পেলেও আলমের মনে আসে দেনাপাওনার ভাবনা এবং যদি আরজু টাকা ধার চায়, তাহলে কীভাবে সে এড়িয়ে যাবে— এই চিন্তা। এই সংকটময় মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে হঠাৎই আরজুর সঙ্গে তার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। আলম এবার জানতে পারে যে আরজু নিষিদ্ধ প্রচারপত্র বিলি করার অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। গল্পকারের বর্ণনায় সেই করুণ দৃশ্যটি এক বেদনা উদ্রেককারী মুহূর্ত তৈরি করেছে—

> ''বৈকালীন সূর্যের রক্তিম আভা তির্যকভাবে গড়িয়ে পড়েছে আরজুর হাতের হাতকড়াটার ওপর— আর কেমন চক্‌চক্ করছে ওটা। যেন ওর হারানো বালা দুটো।''[৩]

এই বাক্যটি শুধু আরজুর জীবনের ট্র্যাজেডির রূপায়ণই নয়, বরং তার ব্যর্থ স্বপ্নগুলোরও প্রতীকী ইঙ্গিত বহন করে। গল্পের নামকরণেও রয়েছে এক গভীর ব্যঞ্জনা। কলেজ জীবনে স্কলারশিপের টাকায় আরজু কিনেছিল একজোড়া বালা। আলম নিজ হাতে আরজুকে বালা পরিয়ে দিয়েছিল। এই বালাজোড়া ছিল তাদের প্রেমের প্রতীক। আরজু সেই বালার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বলেছিল—

> ''যদি কোনোদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় কিংবা যদি আমরা অন্ধকারে ডুবে যাই, এই বালা আলোর সৃষ্টি করে পথ দেখাবে।''[৪]

কিন্তু আরজুর সেই আশা পূর্ণতা পায়নি। সমাজের কঠোর বাস্তবতা, আর্থিক সংকট এবং সম্পর্কের ভাঙন, সবকিছুই সেই বালাকে হারিয়ে দেয়। আর আজ, সেই বালা নতুনভাবে ফিরে এসেছে— পুলিশি হাতকড়া হয়ে। একসময় যে বালা আরজুর ভালোবাসার প্রতীক ছিল, তা আজ তার বন্দিত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ গল্পের মাধ্যমে লেখক সমাজের কঠোর নির্মমতা এবং মানুষের ব্যক্তিগত সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পের শেষাংশে যখন

আলমের চোখে আরজুর বন্দিত্বের দৃশ্য ভেসে ওঠে, তখন আলমের মনে পড়ে আরজুর সেই কথাগুলো—

> ''ওর বালা অন্ধকারে পথ দেখায়।''[৫]

কিন্তু বাস্তবে সেই বালা আজ আর কোনো আলো দেয় না, বরং আরজুকে ঠেলে দিয়েছে আরও গভীর অন্ধকারের দিকে। প্রেম, সম্পর্ক এবং আর্থিক দুরবস্থার সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে 'হারানো বলয়' গল্পটি।

গ্রামীণ শিক্ষার দুরবস্থা, রাষ্ট্রের উদাসীনতা এবং গ্রামের মানুষের সংকল্পের এক অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে 'নয়া পত্তন' গল্পে। এখানে শিক্ষার জন্য যে সংগ্রাম, তা এক মানবিক বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি, গ্রামের স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শিক্ষক শনু পণ্ডিত শহরে ছুটে যান, শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে। আশায় বুক বাঁধা শনু পণ্ডিত যখন শুনলেন যে শহুরে বাবুদের বিলাসবহুল হোটেল এবং ইংরেজি স্কুল বানাতেই ফান্ড ফুরিয়ে গেছে, তখন তিনি হতবাক। শিক্ষার মতো একটি মৌলিক অধিকার শহরের উচ্চবিত্তদের স্বার্থে বলি হতে দেখলেন তিনি। সেই দৃশ্যের বর্ণনায় গল্পকার বলেছেন—

> ''শিক্ষা বিভাগের বড় সাহেব শমসের খান বললেন, রাজধানীতে দুটো নতুন হোটেল তুলে, আর সাহেবদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইংলিশ স্কুল দিতে গিয়ে প্রায় কুড়ি লাখ টাকার মতো খরচ। ফান্ডে এখন আধলা পয়সা নেই সাহেব।''[৬]

এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমাজের বৈষম্য— শহরের জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা আর গ্রামের জন্য একরাশ বঞ্চনা। এত কিছুর পরেও শনু পণ্ডিত হাল ছাড়েননি। তিনি গ্রামের জমিদার জুলু চৌধুরীর কাছে গেলেন, কারণ সেই পঁচিশ বছর আগে এই চৌধুরীই স্কুলের জন্য সামান্য কিছু অর্থ ও জমি দান করেছিলেন। কিন্তু আজকের চৌধুরী আর আগের মতো নেই। দান-অনুদানের চিন্তা মাথায় এলেই যেন আঁতকে ওঠেন তিনি। তার কাছে স্কুলের জন্য টাকা চাওয়া যেন এক অপমানের বিষয়। গল্পকারের কথায়—

> ''সাহায্যের নামে রীতিমতো আঁতকে উঠলেন জুলু চৌধুরী। বললেন, পাগল, টাকা পয়সার কথা মুখেও এনো না কখনো। ...আধলা পয়সা নেই হাতে।''[৭]

রাষ্ট্রের ঔদাসীন্যের সঙ্গে চৌধুরীর এই স্বার্থপরতার মেলবন্ধনে গড়ে উঠলো গ্রামীণ শিক্ষার বিরুদ্ধে এক অদৃশ্য দেয়াল। জোড়া প্রত্যাখ্যান এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে 'ভোরের ট্রেনে গাঁয়ে ফিরে এলেন শনু পণ্ডিত'। তাঁর আশা ছিল সরকার বা জুলু চৌধুরী— কেউ একজন হয়তো সাহায্য করবে, কিন্তু হতাশা ছাড়া কিছু পেলেন না। গ্রামের মানুষগুলো তাঁর কাছে আশায় বুক বেঁধেছিল— তারা ভেবেছিল শহরের বাবুরা বা চৌধুরীরা তাদের স্কুল বাঁচাবে। কিন্তু শনু পণ্ডিতের ব্যর্থতা দেখে তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। কিন্তু গল্পকার হতাশার মধ্যেই গল্প শেষ করেননি। বরং গ্রামের মানুষের ঐক্য এবং লড়াইকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন বৃদ্ধ হাশমত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে—

> ''হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললো, যতসব ইয়ে আইছে— যাও ইস্কুল আমরাই দিমু। কারো পরোয়া করি না। না গরমেন্টো— না চৌধুরী, বলে কোমরে গামছা আঁটলো হাশমত।''[৮]

এই কথার মধ্যে রয়েছে গ্রামের মানুষের সাহসিকতা এবং লড়াই করার শক্তি। হাশমতের নেতৃত্বে গ্রামের মানুষজন নিজেদের হাতেই স্কুল গড়তে লেগে যায়— কেউ দেয় খড়, কেউ বাঁশ, কেউ দেয় শ্রম। সবার অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাহায্যেই গড়ে ওঠে গ্রামের নতুন স্কুল। নতুন স্কুলের নতুন নামকরণের মধ্যে দিয়ে কেবল গ্রামীণ মানুষের একতা নয়, হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্যপূর্ণ চিত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন গল্পকার—

> ''কালো চারকোণী ফলকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে একখানা দা দিয়ে ঘষে ঘষে চৌধুরীর নামটা তুলে ফেললো তোরাব আলী। তারপর বুড়ো হাশমতের কল্কে থেকে একটা কাঠ কয়লা তুলে নিয়ে অপটু হাতে কি যেন লিখলো সে ফলকটার ওপর। ...শনু পণ্ডিতের ইসকুল।''[৯]

এই স্কুল সরকার বা চৌধুরীদের দয়াদাক্ষিণ্য নয় শনু পণ্ডিতের অদম্য ইচ্ছা আর গ্রামের নিরক্ষর মুসলমান মানুষগুলোর হার না মানা মানসিকতার দৃষ্টান্ত।

হাশমত আর তোরাব আলীদের লড়াইয়ের ফলেই পতন ঘটলো সরকার এবং চৌধুরীদের আস্ফালন আর ঔদ্ধত্যের। পত্তন হলো নতুন স্কুল— শনু পণ্ডিতের স্কুল।

নগর জীবনের সংকটময় পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'ভাঙাচোরা' গল্পে। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে এক দম্পতি, যারা সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরবর্তী ধাক্কায় তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে নতুন বাস্তবতায় স্থিতি খোঁজার চেষ্টা করছে। দেশ বিভাগের আগে কলকাতায় তারা ছিল স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার। কিন্তু দেশান্তরিত হয়ে ঢাকায় এসে তাদের স্বপ্নভঙ্গের করুণ রূপকথার মতো নতুন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই নতুন জীবনে স্বচ্ছলতার পরিবর্তে তারা পাচ্ছে আর্থিক সংকট এবং অসহায়ত্ব। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র টুনু এবং তার স্বামী, যে এখন কুলিগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। টুনু, সংসার চালানোর তাগিদে, একা ঝিয়ের কাজ করে, কিন্তু এই কঠিন বাস্তবতা তাদের দুজনের মধ্যে কোনোদিন আলোচনার বিষয় হয়নি। কারণ, তাদের মধ্যে রয়েছে এক গভীর মানসিক সংকট—তারা নিজেদের কর্ম বা জীবন সংগ্রামের কথা একে অপরের কাছে প্রকাশ করতে চায় না, নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য। টুনু সালামকে স্বামীর সম্পর্কে বলেছে—

> ''পিয়নের কাজ করলে কি হবে। লোকটার প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে খবরদার। আমি যে মেসের ভাত পাক করে দিই, ঘুনাক্ষরেও এ কথাটা বলো না ওকে। তাহলে রেগে আগুন হয়ে যাবে। টুনুর কণ্ঠে অনুবোধের সুর।''[১০]

আবার টুনুর অবর্তমানে তার রিক্সা চালক স্বামী নিজের অবস্থার কথা জানিয়েছেন গল্পের কথক সালামকে—

> ''মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংসার চলে না। তাতো বোঝেনই। অফিস ছুটির পর অগত্যাই তাই রাতে রিক্সা চালাই। ...ও কথাটা বলবেন না টুনুকে। প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে ওর। জানতে পারলে কেলেঙ্কারি কিছু একটা ঘটিয়ে বসবে।''[১১]

টুনুর স্বামী, রিক্সা চালানোর কথা লুকিয়ে রাখলেও, নিজের সঙ্কটের কথা কাহিনির কথক সালামের কাছে প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে, টুনু নিজের কাজ নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখতে চেয়েছেন স্বামীর কাছে। এই গল্পের মধ্য দিয়ে জহির রায়হান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের আত্মসম্মানের দ্বন্দ্ব, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং জীবনের করুণ বাস্তবতাকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে আত্মসম্মানবোধ এবং নিজেদের সংকটকে অস্বীকার করার প্রবণতা, সেটাই 'ভাঙাচোরা' নামের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা। 'ভাঙাচোরা' একটি প্রতীকী নাম, যা দম্পতির ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন এবং সাংসারিক জীবনের টানাপোড়েনকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ঢাকা শহরের সংকটময় সময়কে কেন্দ্র করে রচিত 'জন্মান্তর' গল্পটি। লেখক এই গল্পে যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ, শহুরে জীবনের অসহায়তা এবং একজন সাধারণ মানুষের আত্মপরিচয় ও মানবিকতার পুনরুজ্জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মন্তু, যে একসময় কৃষিভিত্তিক স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিল, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। মন্তুর শহরে আগমন এবং পকেটমারের কাজে জড়িয়ে পড়া, তার নতুন জীবনের এক কঠোর বাস্তবতা। শহরে পাড়ি জমানোর পর সে টিকে থাকার সংগ্রামে নিজেকে জড়ায় চুরির কাজে। তবে এই চুরি শুধুমাত্র তার জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল না, বরং একটি অন্ধকারময় জীবনযাপনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিন সে পকেট মারতে গিয়ে পায় একটি সোনার আংটি। এই আংটি পেয়ে সে নতুন করে স্বপ্ন দেখে, সেই স্বপ্নে ছিল পরীবানুকে বিয়ে করার ইচ্ছা। আংটি যেন তার নতুন জীবনের এক রঙিন স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল। গল্পের মোড় ঘোরে এক রাতে, যখন সে আংটি পকেটে নিয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়। বৃষ্টির রাতে এক কেরানির সঙ্গে তার দেখা হয়, যে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। কেরানির সংসারের করুণ দশা, তার পরিবারের কঙ্কালসার চেহারা মন্তুর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেরানির বাড়িতে গিয়ে মন্তু যখন তার পরিবারের দুর্দশা দেখে, তখন তার ভেতরে এক অদ্ভুত মানসিক পরিবর্তন শুরু হয়। রাতে শুয়ে থাকার সময় সে পঞ্চাশ টাকা চুরি করার পরিকল্পনা করে,

কিন্তু হঠাৎই সে একটি বাচ্চা মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, যে অভুক্ত অবস্থায় বলছিল—

> ''মাগো, হাঁড়িতে কি একটাও ভাত নেই। পেটটা যে পুড়ে গেলো।''[১২]

এই কথাগুলো তার হৃদয়কে বিদ্ধ করে। সে উপলব্ধি করে, কেরানির পুরো পরিবার না খেয়ে দিন পার করছে, আর সেই শিশুর কান্না তার চেতনায় গভীরভাবে আঘাত হানে। বাচ্চার কান্না মন্তুর মানবিকতা জাগিয়ে তোলে, তার ভেতরে এক নতুন মানুষ জন্ম নেয়। ঠিক তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয়, পঞ্চাশ টাকা চুরি না করে, নিজের চুরি করা সোনার আংটিটি কেরানির শার্টের বুকপকেটে রেখে দেবে। এই মুহূর্তটি গল্পের মূল বার্তা প্রকাশ করে— মানুষের জীবনে একটি সময় আসে, যখন সে নিজের মানসিকতার পরিবর্তন উপলব্ধি করে, এবং সঠিক পথে ফিরে আসে। গল্পের শেষে, মন্তু সেই আংটিটি কেরানির পকেটে রেখে বেরিয়ে আসে। আকাশে চাঁদ উদ্ভাসিত, বৃষ্টিও থেমে গেছে। এটি যেন মন্তুর মনের কালো মেঘ সরে গিয়ে নতুন এক আলোর উদ্ভাস ঘটার প্রতীক। লেখক সুন্দরভাবে এই পরিবর্তনের মুহূর্তটিকে তুলে ধরেছেন—

> "তারপর আস্তে আংটিটা ছেড়ে দিলো দেয়ালে ঝোলানো শার্টের বুকপকেটে। খস করে একটা শব্দ হল সেখানে। তাও কান পেতে শুনল। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। বৃষ্টিটা তখন থেমে গেছে। আর রাহুমুক্ত চাঁদ খল-খলিয়ে হাসছে আকাশে।"[১৩]

এই গল্পে রায়হান মানবিকতার উত্থান এবং আত্মপরিচয়ের সন্ধানকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'জন্মান্তর' কেবল এক ব্যক্তির পকেটমার থেকে একজন মানবিক মানুষের রূপান্তরের গল্প নয়, এক ধরনের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের গল্প, যেখানে এক সাধারণ মানুষ তার মানবিকতার গভীরতায় পৌঁছে যায়।

আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্য ও কেরানীশ্রেণির সংগ্রামকে ঘিরে রচিত একটি প্রতিবাদী রচনা 'পোস্টার' গল্পটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আমজাদ সাহেব, একজন শহুরে অফিসের ছা-পোষা কেরানী, যার জীবন সংগ্রাম মধ্যবিত্ত শ্রেণির যন্ত্রণার প্রতীক। গল্পের মূল সংকট উদ্ভাসিত হয় যখন

আমজাদের বাড়ির দেয়ালে হঠাৎ করেই কিছু পোস্টার সাঁটানো হয়। পোস্টারগুলোর শ্লোগান যেমন— 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'বাঁচার মতো মজুরি চাই'। এগুলো মূলত শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে রচিত। কিন্তু আমজাদ সাহেবের মতো একজন ছা-পোষা কেরানী, যিনি নিজের জীবনযুদ্ধে সারাক্ষণ ব্যস্ত, তিনি এই পোস্টারগুলোর মূল বার্তা ও এর রাজনীতিকে পুরোপুরি বোঝেন না এবং মনে করেন এগুলো রাষ্ট্রবিরোধী এবং অর্থহীন কর্মকাণ্ড। তবে গল্পটি মোড় নেয় তখন, যখন একদিন আমজাদ সাহেব নিজেই চাকরি হারানোর সম্মুখীন হন। অফিসে ছাঁটাইয়ের শিকার হয়ে যখন তিনি নিজের বাড়িতে ফেরেন, তখন জীবনের এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি হন। চাকরি হারানোর পর আমজাদ সাহেবের জীবনে যে ধাক্কা আসে, তা তাকে সমাজের গভীর বাস্তবতা বুঝতে বাধ্য করে। আগে যেসব পোস্টারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন, এখন তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে। তার জীবনের সবচেয়ে বিদ্রূপাত্মক মুহূর্ত আসে যখন তিনি আরেকটি নতুন পোস্টার দেখতে পান তার বাড়ির দেয়ালে, এবং সেই পোস্টারে লেখা ছিল—

''ছাঁটাই করা চলবে না।''[১৪]

পোস্টারটি দেখে আমজাদ সাহেব হঠাৎ থমকে যান। যে পোস্টারকেন্দ্রিক রাজনীতিকে এতদিন তিনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এসেছেন, সেই রাজনীতিই আজ তার পক্ষে কথা বলছে। গল্পটি একটি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। আমজাদ সাহেব, যিনি রাষ্ট্রের পক্ষে সবসময় ছিলেন এবং রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনকে অবজ্ঞা করেছেন, সেই রাষ্ট্রই আজ তাকে ছাঁটাই করেছে। তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, যে আন্দোলনকে তিনি অবহেলা করেছেন, তা আসলে তার নিজের মতো মানুষের জন্যই লড়াই করছে। পোস্টার, যা একসময় তার চোখে রাষ্ট্রবিরোধী এবং গুরুত্বহীন ছিল, এখন তার নিজের জীবনের বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।

শহরের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী জীবন ও তাদের মানসিকতার প্রকাশ 'দেমাক' গল্পটি। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিম শেখ একজন বাস ড্রাইভার, যার জীবন কাজের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা ও সম্মানে ভরপুর। তার কাছে কাজ শুধুমাত্র উপার্জনের মাধ্যম নয়, বরং তার আত্মসম্মান ও গর্বের অংশ। গল্পের ভিন্ন চরিত্র রহমত, যিনি জীবিকা নির্বাহ করেন হাত গণনা করে, অর্থাৎ তার

আয়ের উৎস এক ধরনের প্রতারণা বা 'লোকঠকানো' উপায়। রহিম শেখের কাছে এ ধরনের আয় হলো 'হারাম'। এই দুই ভিন্ন পেশার মানুষ একে অপরকে সহ্য করতে পারে না এবং তাদের মধ্যে মানসিক বিরোধ স্থাপিত হয়। রহিম শেখ তার কাজের প্রতি গর্বিত, আর রহমত ঈর্ষাকাতর। রহিমের এই আত্মনির্ভরশীলতা রহমতের কাছে অহংকার বা দেমাক হিসেবে ধরা দেয়। কিন্তু রহিম শেখ একটি দুর্ঘটনায় পড়ে চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারায়। এই ঘটনায় রহমত গোপনে খুশি হলেও প্রকাশ্যে সে করুণা দেখায়। তার মনে হয়, রহিম শেখের এই দুর্ঘটনা তার 'দেমাক'-এর পতন। এখন তাকে ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবন কাটাতে হবে। রহিম শেখ, যিনি এতদিন আত্মনির্ভরশীল ছিলেন, এখন আর সেই গর্ব ধরে রাখতে পারবেন না— এমনটাই ভেবেছিল রহমত। তবে রহমতের ভুল ভাঙে একদিন সদরঘাটের মোড়ে, যখন সে দেখে রহিম শেখ পত্রিকা বিক্রি করছে। ভিক্ষার হাত না বাড়িয়ে, নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য সে পত্রিকা বিক্রির কাজ শুরু করেছে। এই দৃশ্য রহমতকে হতবাক করে দেয়। তার মনে হয়েছিল রহিম শেখ অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকবে, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। রহিম শেখ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচতে চেয়েছে, সম্মান নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। তার এই শক্তিশালী মনোভাব এবং আত্মনির্ভরশীলতাকে লেখক দেমাক বলেই চিহ্নিত করেছেন। গল্পকার রহমতের ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এইভাবে—

"ইস, দেমাকে যেন পা মাটিতে পড়তে চায় না লোকটার।"[১৫]

রহিম শেখের দেমাক, তার গর্ব, তার আত্মসম্মান, তাকে ভিক্ষার হাত পাততে দেয়নি। বরং তিনি পত্রিকা বিক্রির মতো একটি সাধারণ কাজ করেও নিজের গৌরব বজায় রাখতে পেরেছেন। তিনি কখনোই লোকের দয়ায় বাঁচতে চাননি, বরং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। রহিম শেখের এই গর্ব তার চরিত্রের মহত্ত্বকে তুলে ধরে, যা আসলে দেমাক নয়, মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের আত্মসম্মান, জীবনসংগ্রাম, আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক।

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের গভীরে এক নবচেতনার সঞ্চার করেছিল। এই আন্দোলনের প্রতিফলন শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামে নয়, শিল্প ও সাহিত্যে

অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রসারেও বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। জহির রায়হান ছিলেন সেই চেতনার অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিনিধি। ভাষা-আন্দোলন তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রধান অনুপ্রেরণার উৎস ছিল, যা পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশিত হয়েছে। জহির রায়হান ভাষা-আন্দোলনের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তিনি শুধু আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত রাখেননি, বরং এর আবেগ, উত্তেজনা এবং ত্যাগ তাঁর সাহিত্যেও গভীরভাবে স্থান পেয়েছিল। জহির রায়হান ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একাধিক গল্প লিখেছেন, যেখানে আন্দোলনের সংগ্রাম, ত্যাগ, এবং আবেগের সঙ্গে সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিল চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হলো— 'সূর্যগ্রহণ', 'মহামৃত্যু', 'অতি পরিচিত', 'একুশের গল্প', 'একুশে ফেব্রুয়ারি', 'কয়েকটি সংলাপ' এবং অগ্রন্থিত গল্প 'ঢেউ'। 'ঢেউ' গল্পটি ১৯৫৩ সালে 'সওগাত' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, যা ভাষা-আন্দোলনের চেতনার একটি শক্তিশালী প্রতিফলন।

'সূর্যগ্রহণ' একুশে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপটে রচিত একটি অনন্য ছোটগল্প, যেখানে ভাষা-আন্দোলনের চেতনা এবং সংগ্রামের গভীর প্রকাশ ঘটেছে। 'সূর্যগ্রহণ' রায়হানের প্রথম গল্প, যেখানে ভাষা-আন্দোলনের আবেগ এবং ত্যাগ ফুটে উঠেছে তসলিম নামক চরিত্রের মাধ্যমে। গল্পের কথক আনোয়ার বর্ণনা করেছে তসলিমের জীবনকাহিনী, যে বাইশে ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্টের মোড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হয়েছিল। এই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক ভাষার প্রতি এদেশের মানুষের গভীর মমতা এবং দায়িত্ববোধকে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন। আনোয়ার যখন তসলিমকে বাইশে ফেব্রুয়ারি বাইরে না যেতে বলে, তখন তসলিমের উত্তর ছিল তার গভীর দেশপ্রেমের প্রতিচ্ছবি—

> "আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকে তো কবিতা লিখব কী দিয়ে?"[১৬]

এই সংলাপ শুধু ভাষার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ নয়, এটি তসলিমের আত্মত্যাগেরও প্রতীক, বাঙালি জাতির সম্মিলিত সংগ্রামের প্রতিধ্বনি। এই গল্পে রায়হান বাঙালির ভাষা-আন্দোলনের চেতনার সঙ্গে ব্যক্তিজীবন, দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেমের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তসলিমের মতো অসংখ্য

বাঙালি, যারা ব্যক্তিগত সংগ্রাম সত্ত্বেও দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছে, তাদের সংগ্রাম এবং মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্যের গল্প এটি।

'মহামৃত্যু' ভাষা-আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চেতনাকে ধারণ করে লেখা একটি মর্মস্পর্শী গল্প। ভাষা শুধু একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং তা একটি জাতির আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি— এই উপলব্ধি গল্পটির প্রতিটি পরতে পরতে বিদ্যমান। গল্পটি একজন তরুণ শহিদকে নিয়ে রচিত, যার নামও প্রতীকীভাবে শহীদ। যদিও গল্পে শহীদের নিজের বক্তব্য অনুপস্থিত, তার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ভাষা-আন্দোলনের গভীর তাৎপর্য ফুটে উঠেছে। শহীদ গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল উচ্চশিক্ষার আশায়। কিন্তু যখন ভাষা-আন্দোলনের উত্তাল সময় এল, তখন শিক্ষিত তরুণদের মতো সেও সেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বরণ করে। তার এই মৃত্যু শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত ত্যাগ নয়, এটি জাতির সম্মিলিত আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে ওঠে। গল্পটির বিশেষ দিক হলো, শহীদের মৃত্যুর পরে যে ঘটনাপ্রবাহ ঘটে তা। তার লাশকে ঘিরে সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মজুর, কামার, যুবকযুবতী-, বৃদ্ধবৃদ্ধা-— সবাই সমবেত হয়। শহীদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে পতাকা তৈরি করা হয়, যা ভাষার জন্য জীবনদানকারী শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগের প্রকাশ। এই ঘটনাটি শুধু ভাষাআন্দোলনের একটি - প্রতীকী চিত্রই নয়, বরং এটি মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেরও চিত্র। গল্পের আরেকটি চরিত্র শমসের আলীর কথায় ভাষা আন্দোলনের প্রতি-সাধারণ মানুষের আবেগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শমসের আলীর অনুভূতি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সংযোগেরই বহিঃপ্রকাশ—

> ''বড় হিংসে হচ্ছে— বড় হিংসে হচ্ছে, ফজলুরে, আমি কেন ওর মত মরতে পারলাম না।''[১৭]

শমসেরের এই উক্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি যে ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, তারই প্রতিচ্ছবি।

জহির রায়হান ভাষাআন্দোলন বিরো-ধী কিছু মানুষের মানসিকতা এবং তাদের আচরণের চিত্র তুলে ধরার জন্য রূপকের আশ্রয় নিয়েছে 'অতি পরিচিত' গল্পে। গল্পের মূল চরিত্র আসলাম একজন দেশপ্রেমিক, যিনি

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করার জন্য প্রাণপণ লড়াই করছেন। কিন্তু নায়িকা ট্রলির পরিবার বিশেষ করে তার বাবা, পশ্চিম পাকিস্তানের তাবেদারি করে এবং ভাষাআন্দোলনের বিরোধিতা করে। ট্রলিও তার বাবার মতো - চিন্তাভাবনা পোষণ করে, যা গল্পের দ্বন্দ্বের মূল সূত্র। গল্পে ট্রলির বাবা ভাষা-আন্দোলনকারীদেরব্যঙ্গ করে, একে ইসলাম-বিরোধী আখ্যা দেয়। তার মতে, বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করা একটি ''কুফুরি'' কাজ। ট্রলির বাবার উক্তিতে ধরা পড়েছে বাংলা-বিরোধী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ও তাদের সমর্থকদের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা—

> "এদেশের ছেলেমেয়েগুলো সব গোল্লায় গেছে। উচ্ছন্নে গেছে সব। নইলে ইসলামি ভাষা ছেড়ে দিয়ে এই কুফুরি ভাষার জন্য এত মাতামাতি কেন?"[১৭]

এই গল্পটি মূলত ভাষাআন্দোলনের বিরোধীদের এবং তাদের - আত্মপরিচয়ের সংকটকে তুলে ধরেছে। ট্রলির পরিবার রূপক হয়ে দাঁড়ায় সেসব মানুষের, যারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির তুলনায় রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী চিন্তাভাবনাকে সমর্থন করে। এভাবে গল্পটি একদিকে ভাষা-আন্দোলনের চেতনা আর অন্যদিকে তার বিরোধিতাকারী কিছু মানুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছে।

ভাষাআন্দোলনের পটভূমিতে রচিত একটি সার্থক প্রতীকধর্মী গল্প- 'একুশের গল্প', যেখানে তপুর আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভাষার প্রতি বাঙালির গভীর ভালবাসা এবং দেশপ্রেমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটি বাঙালির মুক্তির সংগ্রামে ভাষার গুরুত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। গল্পে চার বছর আগে ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঘটে যাওয়া তপুর মৃত্যুকে প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তপু, ভাষাআন্দোলনে শ-হিদ হওয়া একজন তরুণ, যার আত্মত্যাগ শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, জাতির মঙ্গলের জন্য। সে তার মা, হবু স্ত্রী রেনু এবং পারিবারিক দায়িত্বের চেয়েও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। লেখক অত্যন্ত আবেগপূর্ণভাবে তপুর আত্মত্যাগের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। তপু মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে, তার কপালের মাঝখানে গুলির ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। লেখকের ভাষায়—

> ''কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত নিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার।''[১৮]

এই দৃশ্যটি শুধু তপুর মৃত্যু নয়, পুরো ভাষাআন্দোলনের প্রতীক হয়ে - দাঁড়ায়। তপুর মৃত্যু বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালির সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের একটি প্রতিচ্ছবি ওঠে। তার লাশ আজিমপুর গোরস্থানে কবর দেওয়া হলেও, চার বছর পর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার সময় সে কঙ্কাল হয়ে ফিরে আসে রুমমেট মেডিক্যাল ছাত্র রাহাতের ঘরে। এই ফিরে আসা বাস্তবতার নয়, বরং প্রতীকী— একটি জাতির আত্মপরিচয়, ভাষা, এবং স্বাধীনতার জন্য যে অমর সংগ্রাম তা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। তপুর কঙ্কালের মাথার ক্ষতচিহ্ন দেখে রাহাত এবং তার মেসের ডাক্তার বন্ধুরা বুঝতে পারে এটি তপুরই কঙ্কাল। লেখক তপুর কঙ্কালকে কেন্দ্র করেই ভাষাআন্দোলনের উত্তাপ-, সেই সংগ্রামের ভয়াবহতা এবং বাঙালির ভাষাপ্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন-

'ঢেউ' গল্পটি ভাষা-আন্দোলন ও বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসার একটি অনন্য উদাহরণ। রিজিয়া চরিত্রের মাধ্যমে লেখক সেই সময়ের সমাজের উর্দুভাষী সংস্কৃতির প্রভাব এবং তার মধ্যেও বাংলা ভাষার প্রতি একজন মানুষের ভালোবাসার উন্মেষকে তুলে ধরেছেন। রিজিয়া, যে উর্দু সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়েছে, সেও বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও অবদান অস্বীকার করতে পারে না। সময়ের প্রয়োজনে, তার মধ্যেও বাংলার প্রতি ভালোবাসা জেগে ওঠে এবং সে নিজের ইচ্ছায় বাংলা শেখা শুরু করে তার বান্ধবী সেলিনার কাছ থেকে। রিজিয়ার ভাষা-আন্দোলনের প্রতি এই নতুন জন্ম নেওয়া ভালোবাসা এবং সচেতনতার প্রতিফলন ঘটেছে তার একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের প্রস্তুতিতে। সে নিজের হাতে একটি ব্যাজ তৈরি করে, যার মধ্যে ভাষা-আন্দোলনের চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। সেই ব্যাজ পরে সেলিনার দাদা সালাম নামে আরেক চরিত্র প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণ করে, যা বাংলা ভাষার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

জহির রায়হানের কয়েকটি গল্পে মুসলমান সমাজের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য, ধর্মীয় কুসংস্কার, নারী জীবনের দুর্দশা প্রাঞ্জলভাবে উপস্থিত হয়েছে।

এরকম একটি গল্প হল 'বাঁধ'। গল্পটি গ্রামীণ জীবন, ধর্মীয় অনুভূতি এবং পীর-দরবেশদের প্রভাব নিয়ে রচিত একটি সমালোচনামূলক আখ্যান। এ গল্পের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের নামে প্রতারণার শিকার হয় এবং বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বর্ষাকালে বন্যার সময় পীরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি তাদের অন্ধবিশ্বাস আরও প্রকট হয়ে ওঠে। গল্পের প্রেক্ষাপট একটি গ্রাম, যেখানে বর্ষা ঋতুতে বন্যা শুরু হয় এবং গ্রামের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের ফসল ও জীবন রক্ষার জন্য পীরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে সেই পীর তাদের বাস্তবিক কোনো সাহায্য করতে অক্ষম। যদিও পীর সাহেব তাদের আশ্বাস দেন যে, তার অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে গ্রামের সবাই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এতে করে গ্রামবাসী আরও গভীরভাবে তার প্রতি অনুগত এবং বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, গ্রামের কিছু পরিশ্রমী মানুষ, বিশেষত মতি মাস্টার, পীরের বুজরুকিতে বিশ্বাস না করে নিজেদের প্রচেষ্টায় বাঁধটি মেরামত করার উদ্যোগ নেয়। তারা নিজেদের শেষ সম্বল বাঁচানোর জন্য বৃষ্টিতে ভিজে কঠিন শ্রম দিয়ে বাঁধ মেরামত করে, যার ফলে বন্যা থেকে তাদের ফসল ও গ্রাম রক্ষা পায়। মতি মাস্টার শিক্ষিত, বাস্তববাদী এবং সচেতন এক মানুষ। তার বুদ্ধিতেই বাঁধ মেরামত করা সম্ভব হয়। কিন্তু গ্রামের নিরক্ষর ও সরল মানুষগুলোর বিশ্বাস— পীরের অলৌকিক ক্ষমতার কারণেই তারা রক্ষা পেয়েছে। গল্পের চূড়ান্ত অংশে লেখক পীরের প্রতি গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাসের প্রতিফলন ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে—

> ''এক মুহূর্তে যেন ভাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁ-টা। ছেলে-বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে খেয়ে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্যে।''[১৯]

গল্পটি শুধুমাত্র গ্রামীণ জীবনের একাংশ নয়, বরং সমাজের ধর্মীয় ও বাস্তবিক দ্বন্দ্বকেও তীব্রভাবে প্রতিফলিত করেছে, যেখানে প্রচলিত কুসংস্কার এবং বাস্তবতার মধ্যে সংঘাত চিত্রিত হয়েছে।

পীরপ্রথা, কুসংস্কার, ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুরতা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে 'অপরাধ' গল্পে। এই গল্পের মূল চরিত্র সালেহা, যে বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজের নিষ্পেষিত নারী সমাজের প্রতিনিধি। গল্পে

পীরপ্রথা শুধু ধর্মীয় শোষণের একটি রূপ নয়, বরং নারীদের প্রতি সমাজের নির্মম আচরণ এবং তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলারও প্রতিফলন। সালেহাকে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তার বাবা আশি বছরের এক পীরের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই বিবাহের মধ্যে ধর্মের নামে যে শোষণ ও অত্যাচার চলে, তাই গল্পের মূল থিম। চার বছরের বিবাহিত জীবনে সালেহা তার স্বামীর কাছ থেকে কোনো স্বাভাবিক দাম্পত্য সুখ পায়নি। বরং সে একটি বন্দিজীবন যাপন করেছে, যেখানে তার স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। লেখক তার বদ্ধ জীবনকে তুলে ধরতে গিয়ে জানাচ্ছেন—

> ''কারাগার। এ চারটে বছর ঠিক যেন কারাগারের ভিতরই দিন কাটিয়েছে সে। এতটুকু স্বাধীনতা নেই, নেই নিজের ইচ্ছামতো চলাফেরা করার এতটুকু অধিকার।''[২০]

পীর সাহেবের সঙ্গে বিবাহের মাধ্যমে সালেহার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ধর্মের নামে এই প্রথা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে হরণ করে না, বরং নারীর অধিকার এবং মর্যাদাকেও পদদলিত করে। এই নির্যাতন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে সালেহা একসময় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং ঘর ছেড়ে পালায়। কিন্তু পীরের হাত থেকে মুক্তি পেলেও, বাবার হাত থেকে সে মুক্তি পায়নি। বাবার প্রহারে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সালেহার এই মৃত্যুর জন্য সমাজ সালেহাকেই দায়ী করে। তার শ্বশুর বাড়ি থেকে পালিয়ে আসাকেই এই সমাজ 'অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করে, যা প্রকৃতপক্ষে সমাজের গভীর কুসংস্কার এবং ধর্মীয় ভণ্ডামির চরম দৃষ্টান্ত। সালেহার মর্মান্তিক পরিণতি কেবলমাত্র একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ব্যাধি এবং নারীর প্রতি সমাজের উপেক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গির চিত্রায়ণ। লেখক ব্যঙ্গাত্মকভাবে এই গল্পের নাম দিয়েছেন 'অপরাধ', যেখানে প্রকৃত অপরাধ সমাজের এবং সেইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতির, যা ধর্মের নামে নারীদের শাসন করে, শোষণ করে।

জহির রায়হানের 'কতগুলো কুকুরের আর্তনাদ' গল্পটি একটি তীব্র প্রতীকীধর্মী গল্প, যেখানে সমাজের লোভী, স্বার্থপর, এবং ক্ষমতালোভী ব্যক্তিদের কুকুরের প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। গল্পে কুকুরগুলো আসলে ভদ্রলোকদের প্রতিচ্ছবি, যারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ

করার জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত। এ ধরনের লোকেরা সামাজিক অবস্থান ও পেশার দোহাই দিয়ে নিজেদের উচ্চবিত্ত বলে দাবি করলেও, তাদের মধ্যে নৈতিকতা এবং বিবেকবোধের অভাব প্রকট। লেখক সমাজের এই শ্রেণিকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

> ''স্কুল। পাঠশালা। অফিস। আদালত। সর্বত্র কুকুরে কুকুরময়। সবাই গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।''[২১]

এখানে স্কুল, অফিস, এবং আদালত হলো প্রতীক, যা শিক্ষিত, দায়িত্ববান এবং ক্ষমতাবান শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, এসব স্থানেও স্বার্থপরতা এবং লোভ বাসা বেঁধেছে, এবং কুকুরের মতো আচরণ করে মানুষ একে অপরকে কামড়ে ধরছে। গল্পটি বাস্তবতার প্রতিফলন এবং ক্ষমতালোভী শ্রেণির প্রতি তীর্যক সমালোচনা। মানুষ যে নিজের স্বার্থের জন্য নৈতিকতা বিসর্জন দিতে পারে, তা গল্পে প্রতীকী চিত্রায়নের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং এর পরিণতির ওপর গভীর আলোকপাত করা হয়েছে 'ম্যাসাকার' গল্পে। গল্পের কথক ডা: চৌধুরী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে গিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে এবং নারীর ওপর নিগ্রহ চালিয়েছে। গল্পের মূল চরিত্রগুলোর মধ্যে ষোল বছরের কিশোর জর্জ, প্রেমিক যুবক এডওয়ার্ড এবং লুইসা— এই তিনজনই যুদ্ধের শিকার। জর্জ তার মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারেনি, এডওয়ার্ড আত্মহত্যা করেছে এবং লুইসা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার মাধ্যমে লেখক যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা এবং মানুষের দুর্দশা তুলে ধরেছেন। এছাড়া, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ওপরেও প্রভাব ফেলেছে। লেখক তুলে ধরেছেন যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ, অভাব, মহামারী ও মৃত্যুর ভয়াবহ চিত্র, যা পাঠকের মনে গভীর দাগ কাটে। তিনি বলেছেন—

> "দ্বিতীয় মহাসময়। আর দুর্ভিক্ষ জর্জরিত সোনার বাংলা, চারিদিকে শুধু হাহাকার, অন্ন নেই। বস্ত্র নেই। নেই! নেই! কিছু নেই! আছে শুধু দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর অভাব অনটন।"[২২]

ডা: চৌধুরীর ভিতরে জমে থাকা ক্ষোভ এবং দুঃখ একসময় প্রতিবাদের ভাষায় পরিণত হয়। তিনি মেজর কলিনসকে থাপ্পড় মারেন, যা তার নিজের প্রতিবাদের প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর এই অভিজ্ঞতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানবতার পক্ষে এক শক্তিশালী বার্তা হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ জহির রায়হান ম্যাসাকার গল্পে একটি নির্দিষ্ট সময়কে ধরতে চেয়েছেন। ম্যাসাকার গল্পটি যখন লেখেন, তখন তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। ছাত্রজীবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাত একজন তরুণ ছাত্রের মনে যে চিন্তার আলোড়ন তুলেছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ 'ম্যাসাকার'।

তাঁর গল্পগুলি আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জহির রায়হান বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পাকিস্তানি শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ এবং নবীন উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয় মানসের বিকাশ তাঁর সাহিত্যকে এক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাহান্ন থেকে একাত্তর— প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রভাগে, তাঁর সাহসী পদচারণা সব সময় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ছিল। জহির রায়হানের সাহিত্যকর্মে রাজনীতির উপস্থিতি এতটাই দৃঢ় যে, সমকালীন অনেক লেখকের মধ্যে তার অভাব দেখা যায়। তিনি কেবল দেশীয় ঘটনাবলীতে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং বৈশ্বিক আন্দোলন ও সংগ্রামের বাস্তবতা নিয়েও লিখেছেন, যেমন তাঁর 'ম্যাসাকার' গল্পে। তিনি মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, যা তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। এভাবে তিনি রোমান্টিক ও আবেগধর্মী জীবনদৃষ্টি থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তাঁর গল্পে সমকালীন বৈরী পরিবেশ, সমাজের অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ এবং জাতি-শ্রেণী ও ধর্মের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পাশাপাশি বিশ্বমানবতার বোধ ও গণচেতনার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, যা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. শাহরিয়ার কবির, 'ভূমিকা', একুশে ফেব্রুয়ারি, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৬।
২. জহির রায়হান, 'হারানো বলয়', জহির রায়হান রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), ড. আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পা.), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১০, পৃ. ১০৯।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।
৬. জহির রায়হান, 'নয়া পত্তন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।
১০. জহির রায়হান, 'ভাঙাচোরা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।
১২. জহির রায়হান, 'জন্মান্তর', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।
১৪. জহির রায়হান, 'পোস্টার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।
১৫. জহির রায়হান, 'দেমাক', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭।
১৬. জহির রায়হান, 'সূর্যগ্রহণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।
১৭. জহির রায়হান, 'অতি পরিচিত', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।
১৮. জহির রায়হান, 'একুশের গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩।
১৯. জহির রায়হান, 'বাঁধ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।
২০. জহির রায়হান, 'অপরাধ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭।
২১. জহির রায়হান, 'কতগুলো কুকুরের আর্তনাদ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।
২২. জহির রায়হান, 'ম্যাসাকার', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩।

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 276-293
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.020

বাণী বসুর *অন্তর্ঘাত*: 'ময়না তদন্তের হ্যাজাক আলোকে'

ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.10.2024; Accepted: 25.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The sixties and seventies of the 20th century were politically very significant periods in post-independence India. Especially in the ups and downs of the parliamentary system of West Bengal, the United Front government was breaking down. The Naxalite movement led Bengali society astray that day due to the left and far-left division and the conflict between the parliamentary government and revolutionism. The existence of the young generation is facing a dire crisis. The funeral procession was going on across Bengal that day; Disbelief engulfed the youth of Bengal. Fresh life ended before the barrel of a gun. The image of that terrible time was caught in the later Bengali fiction. Examples of this are spread in many other novels and short stories like Mahasweta Devi's 'Hajar Churashir Ma', Samaresh Majumder's 'Kalbela', Shaibal Mitra's 'Aggatabas' or Jaya Mitra's 'Swarnamaler Chinho'. In the meantime, one of the additions is Bani Basu's 'Antarghat', After a long time since the Naxalite movement, she has made an impartial analysis of the movement in this novel. The author sheds light on their internal conflict, doubt

and tragic end through the weaving of the story. A long time has passed since the Naxalite movement, she has made an impartial analysis of the movement in this novel.

Keywords: Naxalite movement, young generation, struggle, conflict, doubt, Bani Basu, 'Antarghat'

নকশাল বাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের পর 'পাঁচ দশক উজিয়ে এসে' চারু মজুমদারের পুত্র অভিজিৎ মজুমদার নিজের উপলব্ধিকে 'সেই সময়ের জলছবি আর অক্ষম কবিতার শব্দবন্ধে' এঁকে দেন এইভাবে—

উদ্ধত ঝোপঝাড়ে ব্যাঙমুখো অদৃশ্য যে সাপ
হিলহলিয়ে দোলে *গীতবিতান* কোলে
সুধাকণ্ঠী কিশোরী যে দিদি কত সুখু দুখু
কাঠ জানালার ধারে ঘুরে ঘুরে মরমী আবেশ
'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে…/'

দরজায় টোকা পড়ে গর্জমান বন্দুকবাহিনী
বাড়ি ঘিরে উর্দীধারী প্রশ্ন শানায়
মা কোথায় যায়, মা কোথায়?
বাবা ভেসে গেছে কবে প্লাবনের কালে—

ঘর জুড়েবুট, বুট; পুলিশ লালায় বিষ
লণ্ডভণ্ড আলমারি আসবাব পত্তর
বাবা নেই তবু বাবা আছে
'— জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে…'।।[১]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার ছয় ও সাতের দশক যেন তরুণের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাল। সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি— সামগ্রিকভাবে সব কিছুই যেন এক প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আদর্শ আর আশাভঙ্গের মাঝখানে যন্ত্রাণাদীর্ণ সেদিনের যুবসমাজ। তারই মাঝে শোনা গেল—

> 'শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়া খতমের সংগ্রাম ছাড়া দরিদ্র কৃষক জনতার উদ্যোগের দ্বার উন্মুক্ত করা যায় না। যোদ্ধাদের রাজনৈতিক চেতনা

বাড়িয়ে তোলা যায় না। নতুন মানুষের আবির্ভাব হয় না। জনগণের সেনাবাহিনী তৈরী করা যায় না।'[২]

'স্বপ্নসন্ধানী বিপ্লবপথিক'-এর এই মতাদর্শে ব্রতী হয়েই উত্তাল সত্তরে 'নবচেতনার আলোকপ্রাপ্ত' ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই রক্তাক্ষয়ী সংগ্রামে। গণসংগঠন বা গণআন্দোলনের চেয়ে সেদিন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল 'গেরিলা যুদ্ধ, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা এবং খতম অভিযান'। দীর্ঘ বিদেশী শাসন, নানা আবেদন-নিবেদন, ছোট-বড় প্রতিবাদ- আন্দোলনের পর হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা পেরিয়ে দেশভাগ সহ স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ইতি সেখানেই ঘটেনি। সংসদীয় গণতন্ত্রে মতাদর্শগত বিভাজন তো থাকবেই— এখানে বিভিন্ন পরিস্থিতি, নানাখানা হয়ে পড়া দ্বেষ-স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, সেই বিভেদকে নিয়ে গিয়েছিল রক্তাক্ষয়ী সংগ্রামের দিকে। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাকে অনেকেই চিহ্নিত করেছে 'ঝুটা আজাদি' বলে। লেখক শৈবাল মিত্র লিখেছেন—

> 'জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রজন্ম দেখলো, তাদের দেশ সমাজ দীর্ণ, দ্বিধাবিভক্ত। দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের ছালচামড়া উঠে গিয়ে এক পচাগলা শবদেহ এই ত্রিকোণ মানচিত্রের মহাশ্মশানে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। হতভাগ্য স্বদেশে ভ্রষ্টনষ্ট কিছু আগ্রাসী মানুষ বেপরোয়া লুঠতরাজ চালাচ্ছে। নিকটতম ল্যাম্পপোষ্টে যে মজুতদার, কালোবাজারীদের ফাঁসি দেওয়ার কথা ছিল তারাই হয়েছে ভারতভাগ্য বিধাতা।'[৩]

২১শে মে ২০১৭ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় *কালবেলা*-র রূপকার সমরেশ মজুমদার লিখছেন—

> 'অনিমেষ মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে সরে এসে নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। সেই সময় অনেক মেধাবী ছেলে নিজের কেরিয়ারের কথা না ভেবে ভারতবর্ষে মুক্তি আনার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এক দল ছিল পিছনে, যারা আন্দোলন সংগঠিত করত, অন্য দল অ্যাকশনে নামত। আমার সহপাঠী শৈবাল মিত্র প্রথম দলে ছিল। আজ স্বীকার করছি, 'কালবেলা'-র অনিমষের চরিত্রে শৈবালের কিছুটা ছায়া পড়েছিল।'[৪]

সত্তরের পরিস্থিতি যেমন প্রস্তুত করেছিল আন্দোলনের সৈনিকদের, তেমনই তাদের কৃচ্ছ্রসাধন বিশেষ প্রভাবিত করেছিল বাংলা সাহিত্যকেও।

তেলেঙ্গানা-তেভাগা পেরিয়ে এল ৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন। শুকনো ভাত আর নুনের দাবী নিয়ে স্বাধীন দেশের সরকারের কাছে হাজির হয়েছিল বুভুক্ষু মানুষের দল— বলি হল ২১টি প্রাণ। দেশের আভ্যন্তরীন সমস্যার পাশাপাশি সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের সাইরেন। একদিকে 'ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বাজনা' অন্যদিকে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ। ভারত-চীন সমস্যা নিয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে ঘটল বিভাজন—

> 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট আক্রমণকারী হিসেবে ঘোষণা করলো চিনকে। দেশের আপামর মানুষকে তাঁরা নেহেরু সরকারের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানালো। কিন্তু বিদ্রোহী হল কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ। তাঁরা দায়ী করলো নেহেরু সরকারকে। এই অংশটিকে চিহ্নিত করা হলো চিনপন্থী নামে। এই যুদ্ধ সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিল ছাত্রসমাজকে। দেওয়ালে দেওয়ালে তাঁরা লিখেছিল—
>
> জনগণ যখনই চায় বস্ত্র ও খাদ্য
> সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাদ্য।।
>
> হঠাৎ ২১শে নভেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে চিন। তাঁরা জানায় ১লা ডিসেম্বর থেকে তাঁরা পিছু হটে যাবে।'[৫]

যুদ্ধ সমাপ্ত হলেও পার্টি বিভাজিতই রয়ে গেল। আন্দোলনে সামিল হতে গিয়ে স্বরূপগঞ্জে নিহত হল ক্লাশ ফাইভের ছাত্র নুরুল ইসলাম। হাওড়া থেকে বাদুড়িয়া, ব্যারাকপুর থেকে বেহালা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাজনৈতিক কারণে বন্দী প্রায় কয়েকশো জনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। ১৯৬৭র নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে এলো যুক্তফ্রন্ট সরকার। অর্থাৎ নকশার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কয়েক দশক ধরেই তৈরী হচ্ছিল বাংলায়।

মাও সে তুং-এর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে সি পি আই (এম এল) দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। তাদের মনে হয়েছিল সি পি আইএম আর বিপ্লবের পথে নেই। কিন্তু সি পি আই (এম এল) বিপ্লবের পথ

ধরেই এগোতে চেয়েছিল, অনুসরণ করেছিল চীনকে। কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'চিনের পথ আমাদের পথ' বা 'চিনের চেয়্যারম্যান আমাদের চেয়্যারম্যান'।আসলে ১৯৬৭-তে স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় কংগ্রেসী শাসনের অবসানে এসে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারের ঘোষণা অনুযায়ী ভূমিহীন ভাগচাষীদের উৎখাত বন্ধ করা এবং উদবৃত্ত জমি বন্টন, এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য উত্তরবঙ্গে শুরু হয় সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ। সংকটে পড়ে সেদিনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি, অবশেষে—

> '... ১৯৬৭-র জুন মাসে সি পি আই (এম) থেকে একে একে বিতাড়িত হলেন বিদ্রোহী নেতৃবর্গ—চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, অসিত সেন প্রমুখ উনিশজন বিপ্লবী নেতা। একই সঙ্গে প্রায় চারশো জন দলীয় সদস্যো দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সি পি আই (এম) থেকে বহিষ্কৃত হলেন। এই বহিষ্কৃত নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যরা মিলে ১৯৬৭-র ১৩ নভেম্বর গঠন করলেন একটি নতুন সংগঠন— All India Co-ordination of Revolutionaries বা AICCR। ১৯৬৮-র ১৪মে এই সংগঠন নিজেদের নাম পরিবর্তন নতুন নামকরণ করলেন পরবর্তীকালে All India Co-ordination Committee of Communist Revolutionaries বা AICCCR।এই AICCCR-এর বিলুপ্তি ঘটিয়ে ১৯৬৯-এর ২২ এপ্রিল জন্ম নেয় কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় একটি নতুন দল— 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী) বা সিপিআই (এমএল)। এই ২২এপ্রিল একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন।এদিনই হল ভ্লাদিমির ইলিচউলিয়ানভ লেলিনের জন্মদিন।'[৬]

উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা'র ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু সিপিআই (এমএল)-এর, তাদের বিশ্বাস ছিল—

> '...মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত শোধনবাদ, জমিদার ও সামন্তশ্রেণি এবং মুৎসুদ্দি-আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণি ছিল ভারতীয় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে

> বসে থাকা চারটি পাহাড়প্রমাণ শক্তির ভার। সশস্ত্র গণবিদ্রোহের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কৃষিবিপ্লব সম্পাদনের দ্বারা শহরকে ঘড়ে ফেলে 'মুক্তাঞ্চল' সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাই ছিল তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।'[৭]

কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ হলেও সামাজিক-অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের গতিপথ সর্বত্র ইতিবাচক ছিল না, তাই সেদিনের তরুণ সমাজের সেই সংগ্রাম নিয়ে আজও চর্চা চলছে নিরন্তর। বাংলা সাহিত্যের বিবিধ সংরূপে তা যেমন ঠাঁই পেয়েছে, তেমনই বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে নকশাল আন্দোলন।

কালবেলা-য় দাঁড়িয়ে অনিমেষও শ্লোগান দিয়েছিল 'ভিয়েতনাম, লাল সেলাম লাল সেলাম— লাল সেলাম'। সাম্রাজ্যবাদীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ক্লাশ বয়কটের ডাক দিয়েছিল অনিমেষ। ভিন্ন যুক্তি ছিল মাধবীলতার—

> 'পৃথিবীর সব জায়গায় যে অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দায়িত্ব আপনাদের কে দিল? আর আজ নিজের নাক কেটে কি আপনি ভিয়েতনামে অত্যাচার বন্ধ করতে পারবেন? আপনি এখানে চেঁচালে আমেরিকা তা শুনে সুড়সুড় করে নতিস্বীকার করবে?'[৮]

একদিকে জনগণের হতাশা অন্যদিকে শিক্ষিত মানুষের মতাদর্শগত বিভাজন পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে গিয়েছিল ভয়াবহ পরিস্থিতিতে। শ্রমজীবী মানুষ বা ছাত্রজীবন ছাড়াও সাধারণ গৃহজীবনে, নারীত্বের মর্মমূলে আঘাত করেছিল সেই আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক সংকট। বামপন্থী চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর *কলকাতা৭১* সিনেমার ভূমিকাতে বলেন, 'দারিদ্র মালিন্য আর মৃত্যুর ভিড় ঠেলে আমি পায়ে পায়ে চলেছি হাজার বছর ধরে... হাজার বছর ধরে দেখছি ইতিহাস দারিদ্রের ইতিহাস বঞ্চনার ইতিহাস শোষণের ইতিহাস'। এসবেরই অভিঘাতে *কালবেলা*-য় মাধবীলতা আসে বিপ্লবের প্রতিমা হয়ে; পাশে দাঁড়ায় মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা* সুজাতা, জয়া মিত্র লেখেন তাঁর কারা উপন্যাস-সম স্মৃতিকথা *হন্যমান; সমরেশ বসু লেখেন শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে*। এই ধারাতেই বলিষ্ঠ সংযোজন বাণী বসুর *অন্তর্ঘাত*।

বাণী বসুর জন্ম ১৯৩৯-এ, দেশভাগ সহ স্বাধীনতা ও তাঁর পরবর্তী পরিস্থিতি দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। লেডি ব্রেবোর্ন, স্কটিশ চার্চ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী এবং বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের অধ্যাপক শ্রীমতী বসুর লেখালেখির সূচনা মূলত অনুবাদ জাতীয় রচনার হাত ধরে। আনন্দমেলায় ছোটদের জন্য লেখা লিখতে লিখতেই দেশ পত্রিকায় পাঠান বড়দের জন্য লেখা গল্প। সে গল্প পছন্দ হয়নি সম্পাদকের। ফিরে আসে সেই গল্প। এরপর *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশ পায় তাঁর বড়দের জন্য লেখা গল্প 'বেহুলার ভেলা'। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বেহুলার মিথ অবলম্বনে নির্মান করেন আখ্যান। অন্যদিকে 'সেই প্রথম প্রত্যাখ্যাত লেখাই কিছুদিন পর অদলবদল হয়ে *অন্তর্ঘাত* উপন্যাস হিসাবে শারদ আনন্দবাজারে বেরোয় এবং বহুল প্রশংসিত হয়'। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিত, পরিস্থিতি এবং প্রভাবকে এই স্বল্পায়তন উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। সমরেশ মজুমদার সত্তরের বাংলা এবং তার পরবর্তী সময়কে ধরতে গিয়ে সুদীর্ঘ দুটি উপন্যাস (*কালবেলা*, *কালপুরুষ*) লিখেছেন। বাণী বসু *অন্তর্ঘাত* উপন্যাসে মাত্র ১৫০ পাতার মধ্যে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাতের দশক এবং পরবর্তী দশকে তার প্রভাবের বাস্তবসম্মত ছবি এঁকেছেন। রহস্যের মোড়কে এমনভাবে কাহিনী বয়ন করেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টান টান উত্তেজনায় পাঠক-মন এগিয়ে চলে নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে এবং নানা প্রশ্নের উত্তর পেতে পেতে।

সত্তরের সূচনা লগ্ন এবং আশির দশকের শেষদিক নিয়ে সমান্তরাল ভাবে পরপর অধ্যায় সাজিয়ে চলেছেন। এমনই নিপুণ আঙ্গিকে যে পাঠক এই কালের ব্যবধান ধরতে পারে না। কাহিনিতে প্রবেশের আগেই সাতষট্টি-উনসত্তরের নির্বাচন ও তার ফলাফল এবং সাধারণ বাঙালির ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন পাঠককে। কোয়ালিশন সরকারে কংগ্রেসের সঙ্গে 'মস্কোপন্থী সিপিআই এবং চিনপন্থী সি পি এম' দলের অবস্থান সন্দিহান করে তুলেছিল বাঙালিকে। প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জী এবং জ্যোতি বসুর অবস্থান ও ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে, 'আরে বাবা যারা অ্যাদ্দিন পুলিশের প্যাঁদানি খেতে খেতে বড় হল, তাদেরই হাতে পুলিশ মিনিস্ট্রি। লাও ঠ্যালা। সাপে নেউলে কোনদিন একত্রে বাস করেছে?' প্রশ্নকারীদের দেখে

বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি বামপন্থী ছাত্রী মুন্নির মনে হয়-'এই পাতি-বুর্জোয়ারাই আসল শ্রেণীশত্রু'। যে রাজনৈতিক আদর্শে দাঁড়িয়ে মুন্নির বক্তব্য সেই আদর্শ তার দৈনন্দিন যাপনে কতখানি প্রভাব ফেলে সে নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। কারণ তার হস্টেলের বিছানায় দামী ভেলভেটের কভার, চেয়ারে কারুকার্য করা ঢাকনি। বাঁধানো বই, গোছানো পেনদানি। তাই হোস্টেলের কড়কড়ে ভাত, কুমড়োর ঘ্যাট আর ছোটো মাছের মাথা সে অনায়াসেই এড়িয়ে গিয়ে ব্যক্তগত উপকরণ নিয়ে তৈরী করে কফি, দরাজ হাতে ঢালে কনডেন্সড মিল্ক। সুদৃশ্য কৌটো থেকে বার করে বিস্কুট, কাজু, মেওয়া। তার মধ্যেও কখনও জেগে অঠে অপরাধবোধ। সেই মুন্নিই বিবিকে নিয়ে আসতে চায় বিপ্লবের পথে, শোনায় সাম্যবাদের থিওরি,-'কমরেড সান্যাল, কমরেড মজুমদার পূর্ণদা এঁরা কেউ সর্বহারা নন। কিন্তু সর্বহারার হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেবার মহান ব্রতে তাঁরা তাঁদের বুর্জোয়া অতীতকে মুছে ফেলে এগিয়ে এসেছেন। শোষণ-পীড়ন আর বঞ্চনা ছাড়া অন্য কিছু যারা কোনদিন দেখেনি তাদের ঠিক পথে চালিত করতে আমরা যদি এগিয়ে না যাই তো কে যাবে, বল? এটা তো প্রথম স্টেজ। তারপর সত্য প্রোলেতারিয়েত নেতা ওদের মধ্যে থেকে ঠিকই উঠে আসবে।' সে বলে, ইংরেজ উপনিবেশের কথা, খাদ্য আন্দোলন, ইডেন-গার্ডেনে হত্যা, ১৯৬৯এ চাষী হত্যার কথা। বিপ্লবের মন্ত্রে বিবিকে দীক্ষা নেওয়ার পটভূমি তৈরী করে সেই পথ থেকে হারিয়ে যায় মুন্নি।

বিবিই অন্তর দীক্ষা পেয়ে হয়ে উঠল 'অগ্নিকন্যা'। এই অন্ত নাম অনিবার্যভাবে আমাদের মনে করায় রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের কথার। স্বাধীনতা পূর্ব সশস্ত্র বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা সেই উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের নামকরণ নিয়ে একাধিক জায়গায় বাণী বসু তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছেন, তবুও এখানে এক রহস্যময়তার কারণে সেই নামকেই বেছে নিলেন তিনি। অন্ত কেবল বিবিকে নয়, তার আরও দুই ভাই বাপ্পা এবং বাচ্চুকেও নিয়ে এল বিপ্লবের পথে। তা নিজস্ব বিশ্বাসের রাজনীতিতে। দুই ভাইয়ের ভবিতব্যও তাই ছিল। ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে ফিজিক্সে অনার্স পড়া বাপ্পা অঙ্ক পরীক্ষার 'টুকলি' যোগান দেয় পাড়ার এককালের সহপাঠীর অষ্টার মারফৎ। ভাই বাচ্চু এই কাজের নীতিহীনতা নিয়ে কিছু বলতে এলে বাপ্পার যুক্তি-, 'পুরো এডুকেশন সিসটেমটাই ইংরেজ আমলের শিক্ষানীতির

দুর্গন্ধ উদগার। মেকলে নামে লোকটা কেরানি আর দালাল বানাতে এ জিনিস চালু করেছিল। আজও টিচাররা সেই ব্যাকডেটেড সিলেবাস, সেই একই নোটস ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে... পচা কতকগুলো আদর্শবাদ শিক্ষার নামে ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। নিজেরা করছে ক্যাপিটালিস্টদের নির্লজ্জ দালালি, আর ছাত্রদের শেখাচ্ছে সদা সত্য কথা বলিবে, আর পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।'প্রথাগত শিক্ষা আর সমাজব্যবস্থার প্রতি তাঁদের তীব্র বিবমিষা জেগে উঠেছিল, তাই অন্তুদার মন্ত্রণা সহজেই কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। বাপ্পার কথা থেকেই জানা যায়, কোন স্কুল কোন স্থান পাবে তা আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ স্কুল-কলেজ আগে থেকেই প্রশ্ন জেনে যায়। পরীক্ষা এক প্রহসন। শুধু বাপ্পা কেন এইসব পরীক্ষার পরীক্ষার্থীরাও তা জানে। ইনভিজিলেশনের কোনও গুরুত্ব নেই তাঁদের কাছে, তাই অনায়াসে অষ্টার সাপ্লাই করা কাগজ 'ডেস্কের ওপর বিছিয়ে খাতায় কপি করছে'। বৃদ্ধ শিক্ষক আপত্তি জানাতে এলে ছাত্রদের মন্তব্য— 'ভালো চান তো রঙ বাজি করতে আসবেন না দাদু, ভুঁড়িফড়কে কাঁটালের ভুতি বেরিয়ে যাবে'। ভীতু শিক্ষক জীবনধন রক্ষিত ছাড় পায়নি, তাঁকে 'হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হল কলকাতার পুব, পশ্চিম, উত্তরে বৃহত্তর কলকাতা ও মফঃসলে এক নতুন অধ্যায়'। ডাক্তার, শিক্ষিকা, পুলিশ ইন্সপেক্টর, ট্রাফিক কনস্টেবল, ব্যবসায়ী একই ভাবে খুন হতে থাকে। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় চার-পাঁচজন একসঙ্গে এসে খুন করে যায়। কখনো গুলি করে, কখনো ছোরা বা দা-এর আঘাতে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেয় বা পেট ফাঁসিয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে দিয়ে যায়। নিহত ব্যক্তির রক্ত দিয়ে লেখা থাকে 'চেয়ারম্যান মাও— যুগ যুগ জিও। নকশালবাড়ি লাল সেলাম'।

এই আদর্শ মাথায় রেখেই তিন ভাই-বোন, বিবি-বাপ্পা-বাচ্চু রাজনীতিতে এসেছিল? একমাত্র 'নিরীহ, ভালোমানুষ' দাদা ছিল তাদের মায়ের অবলম্বন। পাড়ার স্বচ্ছল ব্যক্তি অপূর্ব-দার প্রভাবেই দাদার চাকরি। সেই দাদার মৃতদেহ পড়ে থাকে শিবমন্দিরের সামনে, ক্ষতবিক্ষত মাথা, চারদিকে রক্ত। বিবি বুঝতে পারে তাদের 'আন্দোলনের আসল চেহারা'। অফিসের পর ছাত্র পড়িয়ে ফেরার পথে কারা যেন ডেকেছিল, সেই ডাকে সাড়া দিয়েই এমন পরিনতি। 'শ্রেণীশত্রু' অপূর্ব-কে মারতে না পেরে মারল তিন বিপ্লবীর দাদাকে।

কিছুটা ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবশতই বাঁচাতে গিয়েছিল তাকে। কিন্তু তার মূল্য এভাবে চোকাতে হবে বুঝতে পারেনি বাপ্পা। নকশাল আন্দোলন যে ভয়ংকর দিকে যাচ্ছে, আদর্শের মাঝে যে অবিশ্বাস আর সংশয় প্রবেশ করেছে তা অবশ্য আগেই বুঝেছিল। বাপ্পার হাতের লেখা নকল করে তাদের নিকট প্রতিবেশী অপূর্ব মিত্তিরকে হুমকি চিঠি পাঠায়। অপূর্ব বাপ্পাকে বলেছিল, 'মিথ্যা হুমকি, চুরি, জালিয়াতি, খুনোখুনির মধ্যে দিয়ে তোমরা কী অ্যাচীভ করতে চাইছো আমার জানা নেই বাপ্পা। আমার খুব সন্দেহ তোমাদেরও জানা নেই। বিপ্লব কি রকম জানো? কোটি-কোটি লোক দিনের পর দিন একদম না খেতে পেয়ে, মর্মান্তিক দুর্দশায় যখন সহ্যশক্তির শেষ প্রান্তে চলে আসে তখন স্বতস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধনীর গোলার ওপর'। বাণী বসু তাঁর *অষ্টমগর্ভ* উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যার জবানীতে নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে এরকম বক্তব্যই শুনিয়েছিলেন—

> 'রাশিয়ার অক্টোবর রেভলিউশনে কিন্তু লাখ লাখ লোক যোগ দিয়েছিল বুনবুন সেটা ভাব। শ্রমিক, কৃষক, নাবিক সবাই স্ট্রাইক করেছিল, মানে আমি বলতে চাইছি, বলশেভিকরা একটা গ্রাউন্ড ওয়র্ক করে নিয়েছিল। ওদের পিছনে বহু মানুষের সমর্থন ছিল। মাওয়ের লংমার্চের কথা মনে কর। কত লোক। সে জায়গায় এরা... ? কেউ জানে না কেন এরা এসব করছে, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে একে ওকে মারছে, খানিকটা স্টালিনের সময়ে বা চিনের কালচারাল রেভলিউশনের পর যা হয়েছিল, এমনকী যদি কিছু মনে না করিস সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড অয়ার-এ ন্যাৎসিরা ইহুদিদের নিয়ে যা করেছিল খানিকটা তো সেই রকমই। শ্রেণি শত্রু খতম করো, আর ইহুদি খতম করো... দু'টো তো একই...'[৯]

এই উপন্যাসে সেই পরিস্থিতির ছবি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন বাপ্পা, ইন্দ্রের পাইকপাড়ার বাড়িতে যায়। ইন্দ্রের কাছ থেকে জানতে পারে আন্দোলন আর তাদের মতো বিপ্লবী, আদর্শবাদীদের হাতে নেই। বিপ্লব পরিচালনা করছে লুম্পেনরা। যাদের ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে শ্রেণীশত্রু আখ্যা দিয়ে যত্রতত্র তাদের হত্যা করছে। তারা মনে করে বাপ্পা-বাচ্চু-ইন্দ্রদের মত ছেলেরা এই বিপ্লবের মানসিকতা নিয়ে বেশীদিন থাকতে পারে না, তারা চলে যায়

শোধনবাদের পথে। পাড়ার তোলাবাজরাও নকশাল নাম নিয়ে মোটা টাকা তুলছে। তারা মার্কস-লেলিন-মাও কিছুই বোঝে না, বোঝে কেবল খুন-জখম আর লুঠতরাজ। নকশাল-বিপ্লবীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তাদের হাত দিয়েই খুন করাচ্ছে অন্য বিপ্লবীদের। চরম হতাশার কথা শোনা যায় ইন্দ্রর গলায়— 'আমাদের সঙ্গে কে আছে বল তো? কিষাণরা আপাতত আর আমাদের সঙ্গে নেই। শহরে মজুরদের সঙ্গে আমাএর কোনদিনই যোগাযোগ হল না। তাহলে রয়েছে কে? রয়েছে কয়েকজন ক্ষুদিরাম, কানাইলাল আর দলে দলে ভাড়াটে গুণ্ডা'। নির্মম নিধনের ছবি পাই অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের আটটা-নটা'র সূর্য উপন্যাসেও—

> 'দু-তিন দিন আগেই কাশীপুর, বরানগরে বাড়ি বাড়ি ঢুকে নব কংগ্রেসী গুণ্ডারা নকশাল সমর্থকদের টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় বের করে এনে খুন করেছে। খুন করে নিহতের মুখে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। একরাতে প্রায় শ'দেড়েক ছেলেকে মেরেছে ওরা। ঠেলাগাড়ি, রিক্সায় চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই লাশ। পুলিশের ভূমিকা নীরব দর্শকের। সেই রাতে এলাকায় ঢোকেইনি পুলিশ। আর সি পি এম? কোনো কোনো উৎসাহী সি পি এম সমর্থক তো নকশালদের বাড়ি চিনিয়ে দিতে ব্যস্ত। পরদিন গর্ব করে কংগ্রেসীরা বলেছে এতদিনে নকশাল মুক্ত করা গেল কাশীপুর-বরানগরকে। এতদিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হল শহরতলীতে।'[১০]

তবুও স্বপ্ন দেখে বিবির মতো মেয়েরা। ভাই কে খুঁজতে, ভালোবাসার টানে ছুটে চলে। সে জানে পথ ভয়ংকর। যে গুণ্ডারা যথেচ্ছ খুন করেছিল তাদের সাহায্য নিয়েই পুলিশ বিবি-বাপ্পা-ইন্দ্রদের মতো বিপ্লবীদের ধরছে। ভায়ের আশায় গোপন ডেরায় পৌঁছে বাচ্চুকে না পেলেও দেখা হয় অন্তর সঙ্গে। বিপ্লবের মাঝে জন্ম নেয় প্রেমও, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে যেমন ছিল, সত্তরের অগ্নিগর্ভ সময়েও তা হারায়নি। 'কালবেলা'র মাধবীলতা তো ছিলই, বাণী বসুর *উত্তরসাধক* উপন্যাসে মেধা ভাটনগরও অমিয় সান্যাল কে বিয়ে করেছিল, শুধুই কাগজের বিয়ে। তারপর আন্ডারগ্রাউন্ড, ছাড়াছাড়ি। তবুও কি বিশ্বাস সেই আন্দোলনের প্রতি, গর্বের সঙ্গে নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেমেধা বলতে পারে—

> '... আমাদের জেনারেশনের ভাঙ্গা-গড়ার সেই অসহ যন্ত্রণার গোপন কথা! জানিস কি কীভাবে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? পারেনি, শেষ পর্যন্ত পারেনি। কেউই বোধহয় পারে না। দে ওয়্যার সো মেনি এঞ্জেলস উইথ ফীট অফ ক্লে।'[১১]

আন্ডারগ্রাউন্ড, পুলিশ, ছোটাছুটি-দৌড়াদৌড়ির মাঝেই প্রেম। দুটি শরীরের একত্রে আসা। বর্ষণমুখর রাত, আকাশের বজ্রপাত, বোমা ফাটার আওয়াজ। এরই মাঝে সাটার ফেলা দোকানে বিবি আর অন্তু, নরনারীর মিলন। অনিমেষ-মাধবীলতার মতো শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট তাদের নেই। তাই হয়তো মাধবীলতার মতো বিবি ধরে রাখতে পারেনি সেই বিপ্লবের সন্তানকে। কিংবা অনিমেষের মতো নিষ্ঠাও তো ছিল না অন্তর, শুধু নিজের শূন্যতা থেকে বাঁচতে সে আঁকড়ে ধরেছিল বিবির শরীরকে, বিবিকে অন্তরে পূর্ণ করতে পারেনি।

একদিন এইসব বিপ্লবীদের সঙ্গে 'দা ফ্লাওয়ার্স অফ বেঙ্গল', 'ক্রিম অফ দা বেঙ্গলি সোসাইটি' বিশেষণ দেখে যে বাবা-মা গর্বিত হয়েছিল তারাই বিপ্লবের রূপ থেকে ভয়ে-আতঙ্কে থমকে গেছে। গঠনের বদলে ভাঙনের কাণ্ডারি হয়েছে তারা। দোষী-নির্দোষী বিচারের আগেই কত তাজা প্রাণ নষ্ট হয়ে গেল। বাবা-মায়ের চোখের সামনে নিহত হল সন্তান। কয়েকদিন পর গঙ্গায় ভেসে উঠল মৃতদেহ। তিন মাস পর গ্রেপ্তার হল অন্তু, তার কয়েকদিন পর বিবি, অন্তসত্ত্বা বিবি, 'পুলিশ ভ্যানে অচৈতন্য কয়েকটি তরুণীর শরীর। জীবিত না মৃত? রক্তমাখা ছেড়াঁ কাপড় জড়ানো। তলায় নগ্ন। ঘাড়ে, বুকের ওপর, পেটে, গোপন অঙ্গে জ্বলন্ত সিগারেটের, চুরুটের ছ্যাঁকার দগদগে ঘা... দু হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। টান মেরে শাড়ি খুলে ফেলে দিল...' গর্ভবতী নারীর ওপর তীব্র পুলিশি অত্যাচার, তিন মাসের গর্ভে 'বুটের লাথি সশব্দে ফেটে পড়ল... রক্ত! রক্ত! রক্ত! লাল অন্ধকার। লাল আতঙ্ক। সাদা আতঙ্ক। অসংখ্য নরবলি। ছিন্নমস্তার পুজো। অসংখ্য শিশু বলিপ্রদত্ত হচ্ছে। রক্ত মাখা খাঁড়াঊর্ধ্বে তুলে নাছছে কাপালিক'। *কালবেলা*-য় নারীর ওপর এই অত্যাচারের ছবি যে একান্তই বাস্তব তার উদাহরণ অন্যত্রও মেলে—

> 'লম্বা লোকটা হা হা করে হাসতেই অফিসার চোখ টিপে তাকে ইঙ্গিত করল। সে হাত বাড়িয়ে মাধবীলতার পড়ে থাকা আঁচল কুড়িয়ে নিল।

> তারপর মিউজিক্যাল চেয়ারের ভঙ্গিতে পাক খেতে লাগল হেলে দুলে। শাড়ি খুলে আসছে মাধবীলতার শরীর থেকে, লোকটা ছড়া আওড়াচ্ছে, 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ চলছে চলবে'...এখন মাধবীলতার শরীরে শাড়ি নেই। দাঁতে দাঁত চেপে মাধবীলতা মাথা পেছনে হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে...একজন সন্তানসম্ভবা মহিলার পক্ষে এই অত্যাচার মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। এরা তা জেনেও করছে। অথচ মাধবীলতা একটুও মুখ খুলছে না।'[১২]

উপন্যাসে প্রথম পর্বের সমাপ্তি এখানেই। উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> 'উপন্যাসটির নির্মাণ ও প্রকরণ অবচেতনকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেছে। কিন্তু সরলরৈখিক আখ্যানে নয়। লেখিকা ৭০-এর ইতিহাসকে অনুবাদ করতে করতে অবচেতনে নিয়ে যান, আবার ১৯৮৯-তে অবচেতনকে অনুবাদ করতে করতে, নতুন সময় ও পরিসরে স্থাপন করেন, ইতিহাসের প্রবাহে আনতে গিয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে উন্মোচন করেন তা ৭০-এর চরিত্রগুলির অসহায়তাকে গভীর মমত্বের সঙ্গে স্পষ্ট করে তোলে। বাণী বসু তাঁর এই আখ্যানে শুধু ব্যক্তি, সমাজ ও ইতিহাসকে যুক্ত করেন না, সেই সঙ্গে আপাত খণ্ডায়নের গভীরে বাস্তব ইতিহাস ও সমগ্রতা কীভাবে সেল্ফকে বা বীষয়ীকে নির্মাণ করে, বিষয়ীর সংকট ও নিষ্ক্রমণকে পথনির্দেশ করে তা অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।'[১৩]

সমান্তরালভাবে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ঘটে গেছে অনেক আগেই। প্রায় ১৫ বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয় পর্বের সময়কালকে ধরলেন। যেখানে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা স্তিমিত। বামফ্রন্টের নেতৃত্বে এসেছে নতুন সরকার। কমিউনিষ্ট নেতাদের কাছে জনগনের কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষাও তৈরী হয়েছে। এরই মাঝে কান্তিভাই-ভুলাভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নামের এক কারখানার প্রেক্ষাপটে উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের কাহিনী বয়ন করলেন। কমিউনিষ্ট শাসনের মধ্যেও সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী এক সভ্যতাকে দেখালেন খুব কাছ থেকে। বিশ্বময় ঘটে গেছে একমেরুকরণ, এক জাতি নিয়ন্ত্রণ করছে সমগ্র পৃথিবীকে। শাসনের রাজদণ্ড ইওরোপের হাত থেকে চলে গেছে আমেরিকার

হাতে। সেই প্রেক্ষাপটেই আসে নতুন কিছু চরিত্র, কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরমার্থ রায়, অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার অরন্য মুখার্জী প্রমুখ। সঙ্গে এলো আরো অনেকে, তারা পুরানো চরিত্রই, নতুন মুখোশ পরে। স্বেচ্ছায় মুখোশ পরেছে এমন নয়, পরিস্থিতি তাদের টেনে এনেছে এখানে। খুব সন্তর্পনে তাদের উপস্থাপন করলেন লেখিকা। সচেয়ে বড় কথা এতজন অতিবামপন্থীকে তিনি আনলেন এমন এক পুঁজিবাদী কোম্পানির বৃত্তে, যেখানে শ্রেণী-সংগ্রাম শব্দটাও কোনদিন উচ্চারিত হয়নি। শ্রেণী-বিন্যাস অতি স্পষ্ট। উচ্চপদস্থ কর্মচারী আর শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের তারতম্যের পাশাপাশি আছে জীবন যাপনের বিপুল পার্থক্য।

নতুন চেহারায় আসা পুরানো চরিত্রগুলির রহস্য উন্মোচন হয়েছে উপন্যাসের শেষে। 'অগ্নিকন্যা' বিবি এখন অরন্য মুখার্জীর স্ত্রী ব্রততী। মফঃস্বলে স্বামীর সঙ্গে কোম্পানির কোয়ার্টারে থাকলেও শহরের একটি স্কুলে পড়ায়। নিয়মিত যাতায়াত করে। নিঃসন্তান। ম্যানেজার পরমার্থ রায়ের স্ত্রী জয়ন্তী, বিবির বিপ্লবী সত্তা জাগরণের প্রাথমিক মন্ত্রণাদাত্রী, 'অজ্ঞাত কারণে সেভেনটির মাঝামাঝি থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান'। এখনও স্বভাব সম্পূর্ণ যায়নি, তাই বিদেশী আদলের স্কুলে ছেলেকে পড়ানোর জন্য ইঞ্জিনিয়ার পত্নী পারমিতাকে দু-চার কথা বলে তার বিরাগভাজন হয়। তবে স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে পূর্ণ গৃহিনী। ১৯৮১তে বিবির সঙ্গে মুন্নির পুনরায় সংযোগ স্বামীদের কর্মসূত্রে। কোম্পানির নতুন চীফ ইঞ্জিনিয়র হিসাবে আসে সুমন্ত সেনগুপ্ত— মুন্নি-বিবি-বাচ্চু-বাপ্পাদের অন্তুদা। সাথে সুন্দরী স্ত্রী পারমিতা। এখানেই দেখা যায় মার্কেটিং ম্যানেজার চৌধুরীকে— ইন্দ্র চৌধুরী, সহযোগী নকশালদের ভয়ে যে একদিন বাড়ির ছাদের ঘরে 'মাথা সুদ্ধ মুড়ি দিয়ে' শুয়ে ছিল। বিবি-অন্তুর শেষ সাক্ষাতের মাধ্যম ছিল সে। বাপ্পা-বাচ্চু এখন সৌম্য আর শীর্ষ চক্রবর্তী। সৌম্যর বেতের ব্যবসা, শীর্ষর ভাষায় 'বেতসী বানিজ্য'। আর শীর্ষ-'শীর্ণ, অষ্টাবক্র, এই তুই একদিন দুই-আড়াই জ্বর নিয়ে বিনা দ্বিধায় মাথে নেমে গিয়েছিস শ্রাবণের উপর্ঝুরন্ত বাদল দিনে, শুধু ক্লাবের মানরক্ষার জন্য। ভাবতে অবাক লাগে তুই আজ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিস না, অথচ বাসে কোন মেয়ের অপমান দেখে দুই ছুরিকাধারী মস্তানের মহরা নিয়েছিলি। একা... মহা শক্তিধর হয়েও নিজেকে অনায়াসে সমর্পণ করতে পারতিস

ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কাছে। দাম দিয়েছিস..." শারীরিক অসহায় ভাইকে ছেড়ে নিজে সংসার পাতেনি বাপ্পা, ফিরিয়ে দিয়েছে শ্রীময়ীকে।

দুই ভাই যখন কান্তিভাই দুলাভাই কোম্পানির কম্পাউণ্ডে, দিদির কোয়ার্টারে তখনি অদ্ভুতভাবেমৃত্যু হয়েছে সুমন্ত সেনগুপ্তের। ব্রততীদের ওপরের কোয়ার্টার সুমন্তর। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মৃত্যু হয় সুমন্তর। হত্যা না আত্মহত্যা বোঝা যায় না। সাড়া না পেয়ে ডুপ্লিকেট চাবি খুলে যা দেখে গেছে—'খালি পায়ে, খালি গায়ে খাটের মালিক স্বয়ং অনতিদূরে একটা স্টীলের চেয়ারে আসন পিঁড়ি হয়ে ধ্যানস্থ। তাকে আষ্টেপৃষ্টে জরিয়ে আছে কালো কালো সরু সরু সাপ... সাপগুলো এসেছে সুইচবোর্ড থেকে। একটা সুইচের ঢাকনা খোলা। সেখান থেকে দুটো তার সোজা সুমন্তর পায়ে এসে পৌঁছেছে। মোক্ষম প্যাঁচ দিয়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে চলে গেছে গলা অবধি...'। বিলেতফেরৎ ইঞ্জিনিয়ারের বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু আত্মহত্যা বলেই ধরে নেওয়া যায়। বিশেষত তিনি অন্তর্মুখী-কুণ্ঠিত মানুষ বলেই। কম্পাউন্ডের মেয়েমহল স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনার অভাবের দিকেই আলোকপাত করে। পুলিশ কিন্তু এতো সহজে বিষয়টাকে দেখেনি। যেখানে পুলিশ জানে তাদের এতজন পূর্বপরিচিত উপস্থিত এবং প্রত্যেকেই এককালে সশস্ত্র-সংগ্রামে তার সহযোগী। তাই হত্যার প্রসঙ্গ পুলিশ এড়াতে পারে না।

সুমন্তের সঙ্গে প্রথম দেখাতেই ব্রততীর 'বিশ্রী পেটের যন্ত্রণাটা আবার আরম্ভ হয়েছে'। শারীরিক যন্ত্রণা সন্দেহ নেই, তিন মাসের গর্ভাবস্থায় পেতে পুলিশের বুটের লাথি, সেই ক্ষত কী সারাজীবনেও সারে! কিন্তু যার জন্য গর্ভ এবং গর্ভযন্ত্রণা তাকে দেখে মানসিক পীড়া তো আসবেই। বিবি-বাপ্পা-বাচ্চু, সবার জীবনের পরিনতি কেন্দ্রবিন্দুতে আছে সুমন্ত। পারমিতা আর অতনু সরকার (সত্তরে নকশাল সেজে বিপ্লবীদের যাবতীয় তথ্য যোগাড় করেছিলেন, যার কোড নেম জিরো জিরো সেভেন)-এর কথাকে মিলিয়ে নিলে সুমন্তর জীবনের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। বাহাত্তরের সেই রাতেশিমলিপালের জঙ্গলে ধরা পড়ে অন্ত। পুলিশের মার খেয়ে নকশালদের যাবতীয় তথ্য জানিয়ে দেয়। তার বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে ধরা পড়ে বিবি-বাপ্পা-বাচ্চুর মতো অনেকে। অন্যদিকে পুলিশের ডিএসপি রণবীর বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে রাতারাতি বিদেশ চলে যায়। পরে তার মেয়ে পারমিতার সঙ্গে প্রেম-বিয়ে-সন্তান। পুলিশের কথা

এবং সুমন্তর মৃত্যুর পর তার দিদি ও শ্বশুরমশায়রের কথায় অনুমানের আভাষ থাকলেও সুমন্তর ডায়েরি থেকে স্পষ্ট জানতে পারি সুমন্তর ধনী আত্মীয়েরাই রণবীর বিশ্বাসকে টাকা দিয়ে সুমন্তর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে দেন।বিদেশের নিশ্চিত জীবন ছেড়ে দেশে ফিরে কান্তিভাই-ভুলাভাইয়ে যোগ দিয়ে নিজের পরিণতি টেনে আনা।

না, আর কোনও হত্যা ঘটেনি, যেটা হয়েছে সেটা আত্মহত্যাই। অন্তদার মতো তার একান্ত অনুগত শিষ্য শীর্ষ ওরফে বাচ্চুও আত্মহত্যাই করেছে। সত্তরের উদভ্রান্ত যুবক-যুবতীরা স্বেচ্ছায় অথবা পরিস্থিতির চাপে যে হত্যালীলায় অংশগ্রহণ করেছিল, যুগ পেরিয়ে তারা আর অন্যের শোণিতে হাত রাঙিয়ে তোলেনি। তবুও আইনের চোখে তারা চিরকালই 'ডেঞ্জারাস কিলার্স' থেকে গেছে। তাদের গতিবিধি পুলিশের চোখে বন্দী। তবুও তারা নিজেদের কাছেই প্রশ্ন তুলেছে বারবার। যথাক্রমে অন্ত আর বাচ্চুর আত্মহত্যার আগে লেখা ডায়েরি আর চিঠি থেকে জানা যায় কী ভীষণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রা। অন্ত লিখেছে,— 'বাচ্চু আমি কাপুরুষ, কিন্তু অমানুষ নই। তোর শরীরের প্রত্যেকটি আঘাত আমার ঋণ। যদি শোধ করে দিতে পারি তাহলে বাচ্চু আবার আমায় তেমনই করে দাদা বলে ডাকবি।' এরাই স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন সত্যি না হলেও, স্বপ্ন দেখাটা তো মিথ্যে হয়ে যায় না। যে পথ ধরে এগিয়েছিল, সেই পথ হয়ত ঠিক ছিল না, পাথেয়ও ছিল না। বিপ্লবের প্রকৃত সুর শোনা যায় দাদাকে লেখা শীর্ষর শেষ চিঠি থেকে,- 'বিপ্লব ধরেই নিয়েছে পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল বীরপুরুষ। বিপ্লবে সামিল সব মানুষের মধ্যেই সে অসীম সহিষ্ণুতাসম্পন্ন একজন অগ্নিমানুষকে প্রত্যাশা করে, দাবী করে এমন শক্তির যা অনায়াসে সব ভেঙে দিতে পারবে। অথচ সৃষ্টির মৌলিক এবং চূড়ান্ত শর্ত ভাঙা নয়, গড়া। গড়ার পিপাসা যাদের মধ্যে প্রবল তারা সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। স্থূলতার ছোঁয়ায় কখন যে কিভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, নিজেরাই জানে না। নিজেকে রোখবার-আগেই যদি সংগ্রাম তাদের ডেকে নেয়, তাহলে বিপ্লবের চূড়ান্ত পরীক্ষায় তাদের পাশ করার আশা নেই'।

শুধু শীর্ষর চিঠি নয় মহাপুরুষের মূর্তিভাঙ্গা থেকে শুরু করে গেরিলা যুদ্ধ, খতম অভিযান, ভ্রান্ত রণকৌশল ভারতীয় ঐতিহ্যকে অবহেলা এবং সর্বোপরি জনগণের সঙ্গে সংযোগের অভাব নকশাল বিদ্রোহকে ব্যর্থতায় ডুবিয়ে

দিয়েছিল। অথচ মনোরঞ্জন ব্যাপারি জেলে বন্দী সেই নকশালদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন 'সীমাহীন প্রাণশক্তি', তাই তাঁর লেখা উপন্যাসের চরিত্র সংলাপে শোনা যায়—

> 'তাড়াহুড়োয় কিছু হওয়ার নয়, সে একটা মুরগিও জানে। ধৈর্য্য ধরে দিনের পর দিন তা দেয়। তার পর বাচ্চা ফুটে গেলেও কাজ ফুরোয় না। পাহারা দেয়, যাতে ভাম বা বাজ ছো না মারে। এই নিয়মই প্রকৃতির নিয়ম। কোনও কিছুতেই এর অন্যথা হওয়ার নয়। তা না মেনে যদি উল্টো পথে যাওয়া হয় তবে তার ফলও সেরকম হবে।'[১৪]

আলোচ্য উপন্যাসের লেখিকা এই ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই কলম ধরেছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

> 'রাজনৈতিক সমস্ত ঘটনা, সমস্ত বদল আমাকে ভীষণ ভাবে বিচলিত করেছে। কতটা, তাঁর ছাপ রয়ে গেছে কিছুটা *অন্তর্ঘাত* ও *উত্তরসাধক* উপন্যাসে, *তিমির বিদার* নামে আরেকটি উপন্যাসে এবং আমার দু-খণ্ড *অষ্টমগর্ভ*-তে। ভারত তথা বাংলার সবচেয়ে তাৎপর্য পূর্ণসময়টা উঠে এসেছে এখানে। রাজনীতি মলাট পাল্টায়, তার প্রভাব সুদূর প্রসারী, কিন্তু জীবন প্রবাহ অনেক বড়। রাজনীতি যেভাবে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে তাতে করে হয় শহিদ আর নয় তো কাপুরুষ হতে হয়। কোনোটাই আমার পছন্দ নয়। তার চেয়ে যা চিরায়ত, যা সাহিত্যের ঐতিহ্যে অমূল্য, তাঁর ভেতরের কথা আবিষ্কারের চেষ্টা করি না কেন!'[১৫]
>
> *অন্তর্ঘাত*-এও বাণী বসু সেই উত্তাল সময়ের প্রেক্ষাপটে নরনারীদের আত্ম-আবিষ্কারেই সচেষ্ট হয়েছেন, একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আশা-স্বপ্ন-সমাধিকে।

তথ্যসূত্র:

১. মজুমদার অভিজিৎ, 'সত্তরের নকশালবাড়ি আমাদেরও' (প্রবন্ধ), *পদক্ষেপ,* বইমেলা সংকলন, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ১৮
২. মজুমদার চারু, 'ঘৃণা করুন, চূর্ণ করুন মধ্যপন্থাকে', *চারু মজুমদারের রচনা সংকলন,* লাল লণ্ঠন প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৫৯
৩. মিত্র শৈবাল, ষাট দশকের ছাত্র আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ, ষাট সত্তর, *অনুষ্টুপ,* ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ. ২৭
৪. মজুমদার সমরেশ, রবিবাসরীয়, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* কলকাতা, ২১শে মে, ২০১৭
৫. ঘোষ ফটিক, *নকশালবাড়ি পর্ব ও বাংলা কবিতা,* বর্ণমালা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ১৫
৬. দাস ঠাকুর সৌমেন, 'নক্সালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' (প্রবন্ধ), *বাঙালি সমাজ ও বাংলা সাহিত্যের নানা দিগন্ত,* সম্পাদনা সরসিজ সেনগুপ্ত, সোম পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২০, পৃ. ৪১৭
৭. তদেব পৃ. ৪১৭
৮. মজুমদার সমরেশ, *কালবেলা,* আনন্দও, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৯০, পৃ. ১২১
৯. বসু বাণী, *অষ্টমগর্ভ(২),* দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪, পৃ. ৪৪৭
১০. মুখোপাধ্যায় অশোককুমার, আটটা ন'টার সূর্য, দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ.- ২৪৬
১১. বসু বাণী, *উত্তরসাধক,* আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ১৩৯
১২. মজুমদার সমরেশ, *কালবেলা,* আনন্দও, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৯০, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যজিৎ, 'অন্তর্ঘাত : ইতিহাস রাজনীতি অবচেতন', (প্রবন্ধ), *লেখা দিয়ে রেখাপাত,* বাণী বসু সম্মাননা সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০২০, পৃ. ১০১
১৪. ধর অনুপ, 'শেষ দীর্ঘশ্বাসে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' (প্রবন্ধ), *নকশালবাড়ি,* সম্পাদনা : স্বপন মুখোপাধ্যায়, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২১, পৃ. ১৩৯
১৫. কলস্বনা : বাণী বসু, সাক্ষাৎকার, *লেখা দিয়ে রেখাপাত,* বাণী বসু সম্মাননা সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০২০, পৃ. ২৫-২৬

আকরগ্রন্থ :

১. বসু বাণী, *অন্তর্ঘাত,* আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯।

অন্যান্য ঋণ:

১. চলচ্চিত্র : *কলকাতা ৭১*- পরিচালক: মৃণাল সেন।
২. চলচ্চিত্র: *কালবেলা*- পরিচালক:গৌতম ঘোষ।

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 294-305
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.021

কাকদ্বীপের ভাষা

রিক্তা সরদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.11.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Language is the unit by which man express his thoughts through a series of meaningful sounds or combinations of sounds. There are many debates about when, where and how language was first created. However, it is estimated that language originated and started during the period of Pithecanthropus approximately 20 million to 2 million years ago. Language is a living process. Needless to say that the process of changes. There is a wide difference between the language of the beginning of creation and the language of today's modern age. And this difference is in the structure of the sound, form, pronunciation of language. My topic of discussion is the language of Kakdwip region. Kakdwip region is a dialectal region of Bengali language. Linguistic diversity in the region will be explored by analyzing the language of Kakdwip region from a sociolinguistic perspective.

Key Words: *A Sociolinguistic Review, Analysis of Dialects, Phonetics, and Morphology of the Kakdwip Region*

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে কাকদ্বীপ মহকুমা অঞ্চলে একাধিক অঞ্চল থেকে মানুষ এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। যেমন-পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ), হাওড়া, মেদিনীপুর। ফলে তাদের মধ্যেকার আঞ্চলিক উপভাষার পার্থক্য থেকেই গিয়েছিল এবং সময়ের সাথে সাথেই এই অঞ্চলের উপভাষায় একাধিক উপভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেসমস্ত আঞ্চলিক ভাষাগোষ্ঠীর জনসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম তারা অনেকেই তাদের চারপাশের জনগোষ্ঠীর ভাষা ক্রমশ শিখে নিয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে। ফলে তাদের আঞ্চলিক ভাষার বেশ কিছু বদল ঘটেছে। আবার শিক্ষার কারণে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে তারা তাদের আঞ্চলিক ভাষাকে সংকুচিত তথা অবহেলা করেছে এবং ক্রমশ নিজেদের আঞ্চলিক উপভাষাকে হারিয়ে ফেলছে। এবং নানা আঞ্চলিক উপভাষার সংমিশ্রণে একটি আঞ্চলিক উপভাষা গড়ে তুলছে।

কাকদ্বীপ হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার একটি মহকুমা। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাকদ্বীপ নতুন মহকুমা হিসাবে ঘোষিত হয়। এই অঞ্চলটি মুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এবং সমুদ্র সমতল থেকে চার মিটার উঁচুতে অবস্থান করছে। কাকদ্বীপ শহরটি একটি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। আমরা যদি কাকদ্বীপ অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখার দিকে লক্ষ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব এর পূর্বে রয়েছে সুন্দরবন ও ঠাকুরান নদী, পশ্চিমে রয়েছে মেদিনীপুর ও হুগলী নদী, উত্তরে ডায়মন্ড হারবার এবং দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এই অঞ্চলে রয়েছে ৪টি নদী, ২৭টি দ্বীপ ও ১টি খাল(হাতানিয়া-দোয়ানিয়া)। কাকদ্বীপ মহকুমা সুন্দরবনের জনবসতির একটি বিশেষ অঞ্চল। এই অঞ্চলকে অনেকেই সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চলে যাওয়ার প্রবেশদ্বার বলে মনে করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, বঙ্গোপসাগরের বুকে অসংখ্য দ্বীপের মধ্যে এই কাকদ্বীপ অঞ্চলে কাকেদের অগাধ বিচরণ ছিল। কেননা এই অঞ্চলে শবদেহ ভাসানো হতো। প্রচুর কাকের উপস্থিতির কারণে এই দ্বীপের নামকরণ 'কাকদ্বীপ' করা হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার একটি অঞ্চল হিসাবে কাকদ্বীপের নাম পাওয়া যায়। ১৬৭৬ সাল থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যবর্তী

সময়ে লিখিত কৃষ্ণরামদাসের 'রায়মঙ্গল' ও 'কমলামঙ্গল' কাব্যে কাকদ্বীপ অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমানে কাকদ্বীপ মহকুমা অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ অতিক্রান্ত করেছে। এই অঞ্চলের নারী-পুরুষ উভয়ই বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত। নদীকে কেন্দ্র করে মূলত এই অঞ্চলের জনজীবন গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ মৎস্যজীবী পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এছাড়া রয়েছে কৃষিজীবী, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার, কাঁসারী প্রভৃতি জীবিকার মানুষ। মজার বিষয় যে এখানকার বহু মানুষ একাধিক পেশার সঙ্গে যুক্ত। মহিলারাও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই পুরুষদের থেকে। সংসারের যাবতীয় কাজ সামলে তারা পুরুষদের সাহায্য করে চলেছে। বলা ভালো সমান তালে তারা ঘর-বাহির সামলাতে সক্ষম। যে সমস্ত পরিবারের পুরুষেরা মৎস্যজীবিকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সেই সব পরিবারের মহিলারা হাটে মাছ কেনা-বেচা করে থাকেন। আবার অনেক পুরুষ ও মহিলা রয়েছেন যারা সরাসরি মাছ ধরার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও মাছের আড়ত থেকে মাছ সংগ্রহ করে এনে হাটে হাটে বিক্রি করে থাকেন। আর এইভাবেই তারা জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। একেবারে নদীর তীরবর্তী সংলগ্ন বসবাসকারী কিছু মানুষ চিংড়ি মাছের মীন ধরে সেগুলি শহর থেকে আসা ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে মীন ধরার জন্য তাদেরকে টাকা দিতে হয়।

এখানকার বেশিরভাগই মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। বছরের বিভিন্ন সময়ে তারা জমিতে নানান ফসল চাষ করেন। বর্ষায় অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ধান, মাঘ-ফাল্গুন মাসে সূর্যমূখী, কলাই চাষ করে থাকেন। এছাড়া সারা বছর অনেকে পানের চাষ করে বেশ লাভবান হন। যাদের নিজস্ব চাষের জমি নেই তারা ভাগ চাষি হিসাবে চাষ করেন। এই অঞ্চলের মানুষদেরকে প্রায়শই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে দারিদ্র্যতা তাদের সংসারের নিত্যসঙ্গী। তাদেরকে ঝড়-বন্যার সঙ্গে লড়াই করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। বন্যার কারণে নদীর নোনা জল চাষের জমিতে একবার প্রবেশ করলে সেই জমিকে পুনরায় চাষের উপযোগী করে তুলতে তাদেরকে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। এছাড়া এই অঞ্চলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী কিছু মানুষের দেখা মেলে। যারা

বংশ পরম্পরায় স্বর্ণের ব্যবসা করে আসছেন। পাশাপাশি কুম্ভকার, কর্মকার, কাঁসারী সম্প্রদায়গত জীবিকার মানুষের বসবাস এখানে রয়েছে।

সমাজভাষাবিজ্ঞান বা Sociolinguistics শব্দটির মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি সমাজ ও ভাষার পারস্পারিক সম্পর্ক আলোচনাই হল সমাজভাষাবিজ্ঞান। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান মিলিতভাবে তৈরি করছে সমাজভাষাবিজ্ঞান। আধুনিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রকৃত পথ চলা শুরু উনিশ শতকের ষাটের দশকে। ১৯৬৪ সালের কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রথম সম্মেলনের হাত ধরে। সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে R. A. Hudson বলেছেন- 'the study of language in relation to society' আবার লেবোভ সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে বুঝিয়েছেন 'সমাজভাষাবিজ্ঞান পরিভাষাটি ভাষা ও সমাজের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। বাংলা ভাষায়ও সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। যেমন- নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা'(১৯২৪), সুকুমার সেনের 'বাংলায় নারীর ভাষা'(১৯২৭) ও 'Women's Dialect in Bengali'(১৯২৯), ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'অপরাধ জগতের ভাষা'(১৯৭২), রাজীব হুমায়ুনের 'সমাজভাষাবিজ্ঞান'(১৯৮০), পবিত্র সরকারের 'ভাষা দেশ কাল' (১৯৮৪), মৃণাল নাথের 'ভাষা ও সমাজ'(১৯৯৯) ইত্যাদি। ফিশম্যান সমাজভাষাবিজ্ঞানকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন- বর্ণণামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান (descriptive sociology of language), সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান (dynamic), প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান(applied)। আমরা কাকদ্বীপ অঞ্চলের সমাজভাষার বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে অগ্রসর হব বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে। এই বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে ফর্মুলায়তন করেছেন ফিশম্যান সেটি হল- 'Who speeks(or writes)what language(or what language variety) to whom and when and to what end.'। অর্থাৎ ভাষার বক্তা, ভাষার বিশেষ রূপ, শ্রোতা, ভাষা ব্যবহারের বিশেষ উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ অনুয়ায়ী ভাষার পরিবর্তন হয়। আবার সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী অর্থাৎ বৃত্তি, বিত্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা, লিঙ্গ, ধর্ম অনুযায়ী কীভাবে একটি সমাজের ভাষা পরিবর্তন হয়। একটি সমাজে বিভিন্ন পেশার মানুষের বসবাস থাকে। যেমন- কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার, কাঁসারী ইত্যাদি। এই বিভিন্ন পেশার

মানুষের পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজনীয়তা থাকে। ফলে পেশার সঙ্গে ব্যবহৃত অসংখ্য শব্দের ভাষা বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। নিম্নে পেশা অনুযায়ী কীভাবে ভাষার বৈচিত্র্য গড়ে উঠছে তা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করব-

কৃষিজীবীর ভাষা: নেঙল (লাঙল) , জোল (জোয়াল), পাটা (মই), ধাবর (ধান ঝাড়ার জন্য ব্যবহৃত মূল উপাদান), কাঁকড়ি ধান (বৃষ্টি হওয়ার আগে জমি চাষ করে বীজ ধান ফেলাকে বলা হয় কাঁকড়ি ধান ফেলা), পেকে ধান (জমিতে কাদা করে চাষের উপযোগী করার পর অঙ্কুরিত ধান ফেলাকে বলা হয় পেকে ধান ফেলা), তোলা (ধান গাছ), জোলা-পাতলা (অসমান দুটি ধান গাছের লাইনের মধ্যবর্তী স্থান), পাই (ধান গাছের লাইন, এবং পাকা ধান কাটার লাইন), আঁখা (আঁটির অনুপযোগী), গাদা (খামারে ধান স্তূপাকারে সাজিয়ে রাখাকে বলা হয়), আগড়া (অপুষ্ট ধান) ইত্যাদি।

মৎস্যজীবীর ভাষা: বেন্তি (জাল), বাগদা (জাল), বেড় (জাল), ইলিশ (জাল), কমপ্লেড<পমফ্রেড (জাল), নাকুড়া< ভোলা (জাল), চাইনিস (জাল), চড় (জাল), টানাজাল, নেটজাল, ফাঁসজাল, ফুটজাল, গোঁজ মারা (নদীতে মাছ ধরার জন্য একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে বাঁশ পোঁতাকে গোঁজ মারা বলা হয়), বাম (১বাম=সাড়ে ৩হাত দূরত্ব। নদীতে ৩/৪ বাম নীচ পর্যন্ত বাঁশটি অর্থাৎ গোঁজ মারা হয়), সোলি (জালটিকে ভাসিয়ে রাখার জন্য একটি গোঁজ থেকে গোঁজের মধ্যবর্তী স্থানে বাঁশের যে অংশ থাকে তাকে সোলি বলে), পোঁটা (একটি জালের মধ্যবর্তী অংশ যে স্থানে মাছ আটকে থাকে), ফেতনা, ওয়ারলেস (এক নৌকা বা ট্রলার থেকে অন্য নৌকা বা ট্রলারে যোগাযোগ করার যন্ত্র), জাওড় (নদীর তীরবর্তী কোনো একটি স্থানে চৌকো করে মাটি কাটা থাকে, যেখানে অল্প জলে মীনগুলো বাছাই করা হয়), সাবাড় (একসঙ্গে অনেক মাছ শুকানোর স্থান বা পদ্ধতিকে সাবাড় বলে), টিপ<ট্রিপ(নদীতে মাছ ধরতে যাওয়াকে বলে), চড়া, জুয়ার<জোয়ার, গণ<পক্ষ, মুখ ভাটা<মুখ্য ভাটা, ক্ষার ভাটা (জোয়ারের এক থেকে দেড় ঘন্টা আগের সময়কে বলে ক্ষার ভাটা), কেঁকড়া< কাঁকড়া, বল, চাকা (জাল ডোবানোর কাজে ব্যবহৃত ভারী বস্তু) ইত্যাদি।

কর্মকারের ভাষা: দাবালি (দা), হেঁসো, বটি, উরঙ্গ, কোদাল, কাস্তে, নোঙর, কুড়ুল, টাঙি, শাবল, হাতুড়ি, অস্ত্র, ছেনি, হাম্বর, হাঁফর, বিশ্বকর্মার লাই, সাঁড়াশি, শান দেওয়া, চিমটে, চাপড়<চপার(মাংস কাটার ছুরি), ছুরি, ফার্সি, ইঁদুর কল ইত্যাদি।

কুম্ভকারের ভাষা: চাক<চাকা(যে উপাদানের উপর মাটি রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাটির জিনিস তৈরি করা), মাটি, চেড়ি, চাঁচা-চুঁচি, সুতো, ছুরি, ঢিকি<ঢোলক, তবলা, ফুলদানি, টব, ভাণ্ডার, ইলেকট্রিক হুইল।

কোনো একক ব্যক্তির মুখের ভাষা-ই হল নিভাষা বা Ideolect। একই ধরনের বা একই ধাঁচে কথা বলা বিভিন্ন ব্যক্তির বা একটি গোষ্ঠীর ভাষা হল বিভাষা। আর আঞ্চলিক উপভাষা হল কোনো একটি অঞ্চলের মানুষজন যে ধাঁচে কথা বলে সেই ধাঁচে হয়ত অন্য অঞ্চলের মানুষ কথা বলে না কিন্তু বুঝতে পারে। আবার একটি আঞ্চলিক উপভাষা থেকে যখন অন্য আঞ্চলিক ভাষার আমূল পরিবর্তন ঘটে, ভাষার বোধগম্যতা থাকে না তখন সেই অঞ্চলের ভাষাটি আলাদা ভাষা হিসাবে গণ্য হয়। আমার আলোচিত ভাষা অঞ্চল কাকদ্বীপ অঞ্চলটি রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্গত একটি বিভাষিক অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ মান্য রাঢ়ী ভাষায় কথা বলেন না, তাদের কথা বলার ধাঁচে তাদের নিজস্ব একটি বৈচিত্র্য রয়েছে। তারা রাঢ়ী উপভাষার যে বিশেষ বিভাষায় কথা বলেন তা ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে তুলে ধরব।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: কাকদ্বীপ অঞ্চলে যেহেতু একাধিক অঞ্চলের মানুষ এসে বসতি স্থাপন করেছেন সেহেতু এখানকার মানুষের মুখের ভাষায় তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ যে অঞ্চল থেকে তারা এসেছে এবং যে অঞ্চলে বর্তমানে বাস করছেন উভয় উপভাষায় কথা বলতে শোনা যায়। ফলে এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে ব্যবহৃত একাধিক উপভাষার সংমিশ্রণে একটি নতুন উপভাষা তথা মিশ্র উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে, যা এই অঞ্চলের উপভাষাতে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। এই অঞ্চলের কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হল-

- ‘ও’ কখনো কখনো ‘উ’-কার রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন- তোমার > তুমার।[তুমার হইসে একশো পঁচিশ, আমি কম করে ধরসি।] জোয়ার > জুয়ার। [জুয়ারের সময় জাল পাততি হয়, বুঝছস্] বোন > বুন ইত্যাদি।

- 'ন' ধ্বনি 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।
  যেমন- নিয়ে > লিয়া। [ওরা ভোলে বাবাকে লিয়া যাবে।]
  নড়বে > লড়বে। [আমি সুগার পেসেন্ট গরম জলে চান করি, ঠান্ডা জলে করলে দাঁতগুলো লড়বে এই আরকি।]
  নিতে > লিতে। [আমফানের সময় অনুদান লিতি হবে তাই সোবাই ন্যাংটা হয়ে টোলারে উঠে গেলি।]
  নিয়ে > লে। [ওসব কথা চিন্তা করিনে সাইকেল লে চলে যাব।]
- 'অ'-কার 'ও'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- খরচা > খোরচা, পঞ্চাশ > পোঞ্চাশ, সকাল > সোকাল, সপ্তাহ > সোপ্তা, ট্রলার > টোলার, সবাই > সোবাই , কলা > কোলা ইত্যাদি।
- 'এ'-কার 'ও'-কারে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন- দেওয়া > দোয়া, নেওয়া > নোয়া।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: কাকদ্বীপ মহকুমা অঞ্চলের সমাজ-উপভাষাতে যেসমস্ত রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাই সেগুলি হল-

- পান দিয়াও শান্তি নেই, যতক্ষণ এই পান পাল্টানো হবে এরা নিজেদের পছন্দ না হলে এরা লিবে না। -এখানে আমরা 'ন' ধ্বনির allomorph বা সহরূপিম রূপ দেখা যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ন' স্থানে 'ন' বসছে আবার কোনো কোনো স্থানে 'ন'> 'ল' এর রূপ নিচ্ছে।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়াতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। যেমন-
  দাঁড়িয়ে আছি > দাঁড়িছি। [পান পাল্টানোর ঘরের কাছে দাঁড়িছি।]
  ভুলে গেছি > ভুলিছি। [জিনিসটা লিতি ভুলিছি।]
  বাছাই করছিলাম > বাছাইছিলি। [কাল পান বাছাইছিলি]
- উত্তম পুরুষে ব্যবহৃত ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার রূপকে মধ্যম পুরুষে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন-

(i) তুমি কি আমার সাথে লাটে যেতে পারব? [তুমি পারবে > তুমি পারব]

(ii) শুক্রবার কিন্তু দুয়ারে সরকার মাথায় রাখব। [বক্তা- 'তুমি' উহ্য]

আন্বয়িক বৈশিষ্ট্য: একটি অঞ্চলের মানুষের ভাষায় বাক্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তার সামাজিক অবস্থান তথা সেই অঞ্চলের পরিচয় অনেকাংশে বোঝা যায়। কাকদ্বীপ যেহেতু রাঢ়ী উপভাষার একটি বিভাষিক অঞ্চল সেকারণে রাঢ়ী অপেক্ষা আমূল কোনো স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য আমরা পাব এমনটা আশা করা অমূলক। বাংলা বাক্যের কর্তা, কর্ম, ক্রিয়ার নিয়ম অনুসারে এই অঞ্চলের মানুষ বাক্য গঠন করলেও তারা স্বতন্ত্র একটি বিভাষিক অঞ্চল হিসাবে নিজেদেরকে আত্মপ্রকাশ করে অন্যান্য বিভাষিক অঞ্চল থেকে আলাদা হয়ে। এই অঞ্চলের মানুষের ভাষায় বাক্য গঠনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা দেখতে পাই তা হল-

- প্রতিনির্দেশকমূলক শব্দ ব্যবহার করে আশ্রয়ধর্মী বাক্য গঠনের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন- যখন-তখন, যারা-তারা, যে-সে ইত্যাদি।

(i) কাল যখন পান বাছাইছিলি তখন ফোনের পর ফোন আসছিল।

(ii) আমানে ওখানটায় না, যারা নদীর ধারে বাড়ি আছে বা বড়ো বড়ো টোলার আছে জানবে তারা।

কাকদ্বীপ অঞ্চলের প্রায় সকল মানুষই বাংলা ভাষায় কথা বলেন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানকার সকল মানুষই বাঙালি। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের প্রায় সমস্ত লোকউৎসবই এই অঞ্চলে পালন করার পাশাপাশি আরোকিছু লোকউৎসব এই অঞ্চলে পালন করা হয়, যা এই অঞ্চলকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস। যেমন- হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান। যেমন-হিন্দুদের ভেলাভাসানো, গঙ্গাপূজা, লক্ষ্ম মেলা (মাঘচতুর্দশীতে কালীপূজা , এই পূজা শুরু হয় সরস্বতী পূজার ঠিক পাঁচদিন পরেই।), গাজন গান, পৌষমেলা ও গঙ্গাস্নান ইত্যাদি। মুসলিমদের মহরম, ঈদ।

ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই অঞ্চলে যে লোকসাহিত্যগুলি পাচ্ছি সেগুলি হল গাজন গান, বাউল গান, মন্ত্র (ঝাড়ফুঁক) ইত্যাদি। এই

লোকসাহিত্যগুলির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁদের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতির পরিচয় পাই। এই লোকসাহিত্যগুলিতে অধিকাংশ সময়ই তাঁরা নিজেদের আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। লোকসাহিত্যগুলিতে তাঁরা সমাজের সমসাময়িক বর্তমান পরিস্থিতি ও ঘটমান ঘটনাগুলি তুলে ধরেন মজারছলে। পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই অঞ্চলের প্রধান লোকসাহিত্য গাজন গান ও বাউল গানের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে আমরা তাঁদের লিখিত বানান ব্যবহার করেছি।

বাউল গান- 'হেলমেট'

''গাড়ী চড়তে লাগে বেশ
মনের মানুষ সঙ্গে করে ঘোরো সারাদেশ।
গাড়ী চালাও হেলমেট পরে
(করো) নিজেকে সেপ্টি
নিয়ন্ত্রণে চালাও গাড়ী
(রাখো) দুদিকে দৃষ্টি
(আবার) এই কথা না মানিলে হতেও পারো শেষ।...''

-এই বাউল গানের মধ্য দিয়ে বাউল শিল্পী সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। আমরা প্রায়শই কমবয়সী ছেলে-মেয়েকে দ্রুতগতিতে বাইক, স্কুটি চালাতে দেখি হেলমেট ছাড়াই। ফলে সমাজের কথা মাথায় রেখে বাউল শিল্পীরা তাঁদের নিজেদের গান রচনা করেন। এছাড়া বর্তমানে সরকারি প্রকল্প অনুযায়ী সরকার থেকে তাঁরা মাসিক কিছু টাকা ভাতা পেয়ে থাকেন। তাই সরকারী নির্দেশে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করতে যেতে হয়। এইকারণে তাদেরকে লক্ষীর ভাণ্ডার, পথশ্রী অভিযান, লোকপ্রসার, কন্যাশ্রী ইত্যাদি প্রকল্প বিষয়ক গান রচনা করতে দেখা যায়।

গাজন গান-

''চাকর- মন্দিরেতে চলছে এখন মাগের অভিজান
নিরব হয়ে দেখছি শালা গবেট ইনডিয়ান
এরা মায়ের দুধের মান বোঝেনা দেখয় যে স্ট্যাটাস
নিলাম করে দেহটাকে বাড়াছে মোশান (সুর- ফুল কেনো লাল হয়)
বৌ- ছোটো মুখে বড় কথা মারবো মুখে থাপ্পড়

চাকর- টাকা পেলে যেথয় সেথয় খুলবে এরা কাপড়
বাবু- পারসনাল আমার মেটার তাতে তোর কি
চাকর- বেশি খেলে বমি হবে বাসি তরকারি
মা- ভাগ্যে ছিলো দুরভোগ, ছেলে পুষে পেলাম শোক...''

এই গাজন গানের মধ্য দিয়ে শিল্পী বর্তমান সমাজের চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে ছেলের বউ শাশুড়িকে ভাত দিচ্ছে না, নিজের মায়ের উপর অত্যাচার ও অযত্ন দেখার পরেও ছেলের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সেই ছেলে বৌকে নিয়ে দিব্যি খুশ মেজাজে দিন কাটাচ্ছে আর টাকার জোরে দুনিয়াকে কিনে নেওয়ার স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে। এই গাজন গানের মধ্য দিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের দিকটি দর্শকের দৃষ্টিগোচর করতে চেয়েছেন গাজন শিল্পীরা।

মন্ত্র: মোচকা লাগা (তেল মালিশের মন্ত্র- সকালে মুখ ধোয়ার আগে বা সন্ধ্যাতে ফুঁক দিতে হয়।)
হাড় কোচা মাস কোচা দিন কোচা
সমূল্য মোচার দুটো থালি পেরাপিড়ি করে
কার আজ্ঞে দোহাই মা কালির আজ্ঞে
আমার এই ফুঁকে (ব্যক্তির নাম) অঙ্গে থেকে খোটকা ব্যথা
শিগ্‌গির সার, শিগ্‌গির সার, শিগ্‌গির সার।

-এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্বের মানুষ এই সমস্ত লোক বিশ্বাসের উপর ভরসা করে ডাক্তার দেখাত না। আজও বেশকিছু মানুষ এই বিশ্বাসের উপর ভরসা করে। পাশাপাশি ডাক্তারও দেখান। চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নত হওয়ার সাথে সাথেই এই সমস্ত লোকসাহিত্যগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যে কাকদ্বীপের ভাষা: বাংলা সাহিত্যে বেশকিছু গল্প, কবিতা, উপন্যাসের পটভূমিতে ও ভাষায় কাকদ্বীপ অঞ্চল উঠে এসেছে। যেমন- বিভু নাগেশ্বরের 'মায়া গোয়ালিনীর ঘাট', 'ভানু ভূঁইর হাট', ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র দুয়ার', 'নোনা', 'জলের সীমানা', সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ধানের গন্ধ', শিশির দাশের 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা' ইত্যাদিতে। এই অঞ্চলের জনজীবন, সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, জীবন-জীবিকার পরিচয় পাই এই সাহিত্যগুলির

মধ্যে। উল্লেখিত সাহিত্যিকদের মধ্যে বিভু নাগেশ্বরই একমাত্র এই অঞ্চলের মানুষ, বাকিরা নন। অর্থাৎ কাকদ্বীপের ভাষা যে কেবলমাত্র কাকদ্বীপের সাহিত্যিকের লেখনীতে ধরা পড়েছে তা নয়। অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের মুখে এই অঞ্চলের মুখের ভাষাকে ব্যবহার করেছেন।যেমন- ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র দুয়ারে' আমরা পাই-

> ''ওই ব্যাটারির কত চাহিদা জানু? কাকদ্বীপের বাজার থিকে বাক্স বাক্স ব্যাটারি লিযাচ্ছে হাটের দোকানিরা-''[১২]

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে আমরা দেখিয়েছিলাম 'ন'> 'ল'রূপে উচ্চারিত হয় এই অঞ্চলে। তার বাস্তব উদাহরণ আমরা পাচ্ছি সাহিত্যে- 'নিয়ে যাচ্ছে > লিযাচ্ছে'।

কাকদ্বীপের ভাষা আসলে অঞ্চল বৈচিত্র্যে রাঢ়ী উপভাষার একটি বিভাষা। এই অঞ্চলটি গড়ে ওঠার শুরু থেকে আজও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। আবার নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে এসে নিজেদের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে অন্য আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র বিভাষিক জনগোষ্ঠী হিসাবে তুলে ধরেছে এই অঞ্চলের মানুষ। আমরা এখানে ভাষার যে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছি তা যে কেবলমাত্র এই অঞ্চলে দেখা যায় সে কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি না কারণ এই অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত মানুষের জনবসতি গড়ে উঠেছে। সুতরাং অন্যান্য অঞ্চলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা অস্বাভাবিক না।

তথ্যসূত্র:

১। চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার, চক্রবর্তী, নীলিমা, (২০১৯) ভাষাবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, পৃ.১৯।

২। চৌধুরী, কমল, চব্বিশ পরগণা, উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৬, পৃ.৩৩৭।

৩।https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%AA accessed 9th January 2024।

৪। সরকার, পবিত্র, ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা- ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ কার্তিক ১৪৩০, পৃ.১৫৪।

৫। Hudson, R.A., Sociolinguistics, (2nd edition), Cambridge University press, New York, 2nd edition 1996, p.4।

৬। দাশ, ড. নির্মল, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা- ৭০০০৫০, ১৪০৭ পৃ.৩৩৬-৩৩৭।

৭। সরকার, পবিত্র, ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোঘ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা- ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ কার্তিক ১৪৩০, পৃ.১৫৬।

৮। ঘোষ, তারাপদ (সম্পা.) পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, ৩রা চৈত্র ১৪০৬ পৃ.২৫২।

৯। ক্ষেত্রসমীক্ষা- গোপাল সামন্ত, ৪৫(বয়স), দক্ষিণ শিবপুর।

১০। ক্ষেত্রসমীক্ষা- প্রবীর মিস্ত্রি, ৫০(বয়স), পাঁচ নং বাজার।

১১। ক্ষেত্রসমীক্ষা- তারক হালদার, ৫৬(বয়স), রামনগর।

১২। চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, সমুদ্র দুয়ার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১১৬

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 306-328
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.022

সংখ্যার উদ্ভব ও সংখ্যা পদ্ধতির বিবর্তন

মো. তাহমিদ রহমান, *প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, নূরুল আমিন মজুমদার ডিগ্রি কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা, বাংলাদেশ*

Received: 01.11.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The history of the origin of numbers and number systems is a vast and interesting subject. Numbers are deeply connected with the progress of human civilization. Numbers have been an intregal part for calculation in every aspect of human society, from the earliest times to the present day. When the use of numbers actually began is a great mystery. The history of number systems, like the history of the development of human society, is a dynamic and continuous process. Egypt is the origin of numbers. According to anthropologists, human life originated about 2 million years ago. Along with the various geographical transformations of the earth in the course of time, people have also changed radically. Gradually human society started to live in groups in a community. The need for numbers in expression, calculation and various other fields arose right from the time when organized human societies started to become civilized. In order to meet the demands of daily life along with the development of civilization, people invented various number systems which have evolved over time. Numeral systems developed in Egyptian, Babylonian, Greek, Roman,

Etruscans, Mayan, Cistercian civilizations differed in application and characteristics. These civilizations first attempted to interpret numbers through symbols or letters. The use of zero was absent from most number systems. Each civilization developed the concept of number system according to theirown needs. Chronologically, the Indian mathematician "Aryabhata" laid the foundations of the modern number system using zero (0) as a number. The invention and use of these ancient numerical systems have made an unimaginable contribution to the development of human civilization and the practice of knowledge. The invention of the modern number system which includes zero has revolutionized the field of calculation. The main purpose of this article is to discuss the history of numerology, the evolution of various ancient numerology systems that led to the foundation of the modern numeration system. I do strongly believe that will help us understand how numbers have become an integral part of human society.

Keywords: *Number, Civilization, numerical system, Society, symbols, Aryabhata.*

Number এর বাংলা প্রতিশব্দ 'সংখ্যা। সংখ্যার ব্যবহার যে আসলে কবে শুরু হয়েছিল সেটা একটা রহস্য। কে কোথায় কবে সংখ্যা আবিষ্কার করেছিল তা বলা মুশকিল। তবে ধারণা করা হয় আদিমানব নিজেদের প্রয়োজনে গণনার চেষ্টা থেকে সংখ্যার আবিষ্কার করেছে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে প্রায় ২০ লক্ষ বছর পূর্বে মানব জীবনের উৎপত্তি ঘটে। মানুষ তখন বসবাস করত বনে জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায়। সভ্যতার ছোঁয়া থেকে মানুষ তখন ছিল দুরহস্ত। বন্যপ্রাণী ও গাছের ফলমুল ছিল মানুষের ক্ষুধা নিবারণের উপায়। আধুনিক সভ্য মানবের মত জীবন এত সহজ ছিল না। বৈরী আবহাওয়া ও বন্য হিংস্র জীবজন্তুর সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে মানুষ হাতিয়ারের ব্যবহার শুরু করল। পাথর হলো মানব আবিষ্কৃত প্রথম হাতিয়ার। তাই নৃতাত্ত্বিকগণ সেই যুগকে পুরাতন প্রস্তর যুগ হিসেবে অভিহিত করে। সময়ের পরিক্রমায় বন্য মানুষের জীবনধারায় ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে ঘটে নানা বিবর্তন। ছয় লক্ষ বছর আগের বরফ আচ্ছাদিত পৃথিবী একসময় সবুজে ভরে উঠে। ঠিক সেই সময়কালে মানুষ

পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়ে ফেলে। পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয় এক নব অধ্যায়। এরপর থেকে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে। চাহিদার কারণে মানুষ অপেক্ষাকৃত বড় পশু শিকার করা শুরু করে এবং আগুনে ঝলসে খেতে অভ্যস্ত হয়। দলবেঁধে শিকার করার প্রয়োজনে আস্তে আস্তে মানুষ ইশারা ও আওয়াজ করা শিখে। এভাবেই বন্য ও গুহাবাসী মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পৃথিবীর বুকে কয়েক লক্ষ বছর অতিবাহিত করে ফেলে। সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক রূপান্তরের সাথে সাথে মানুষেরও পরিবর্তন হয়। নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের মতে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে সর্বপ্রথম আফ্রিকায় বুদ্ধিমান মানুষের জন্ম হয়। আফ্রিকা থেকে এই বুদ্ধিমান মানুষেরা ইউরোপ, এশিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরে। প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে এশিয়ার বেরিং প্রণালী হয়ে আফ্রিকানরা উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমায়। এই সকল অঞ্চল বরফে আচ্ছন্ন থাকায় মানুষের পদচিহ্ন রাখতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কাল পরিক্রমায় উত্তর আমেরিকা থেকে মানুষ দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করে। আবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহ পাড়ি দিয়ে মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় বসতি গড়ে তোলে। বরফাচ্ছন্ন যুগ পৃথিবীতে বহুদিন স্থায়ী ছিল এ সময় আদি মানুষ ইশারায় ভাব বিনিময় করত এবং দলবদ্ধ হয়ে শিকার করত। শিকারকে তারা ১,২,৩ ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশ করত এর অধিক হলেই তারা অনেক হিসেবে অভিহিত করত। আস্তে আস্তে পৃথিবী উষ্ণ হতে থাকে এবং বরফ আচ্ছাদিত অঞ্চল গলে বিভিন্ন নদীর উদ্ভব হয়। নদীপথে পনি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয় ফলশ্রুতিতে মানুষ নৌ পথে অভ্যস্ত হওয়া শুরু করে। নৌপথে চলতে গিয়ে দূর আকাশে রাতের চাঁদের গতিবিধি লক্ষ করে হয়তো মনের অজান্তেই সময়ের হিসাব শুরু করে। দূর আকাশের চাঁদের পরিবর্তন দেখে দেখে মানুষ একসময় বুঝতে পারে একটি পূর্ণচন্দ্র হতে সময় লাগে ৩০ দিন। ধারণা করা হয় এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে করেই গড়ে উঠে প্রাচীন ট্যালি পদ্ধতি। পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ায় একসময় বরফ যুগের অবসান হলো আর আদি মানব পড়ল এক খাদ্য সংকটে। কারণ পশু শিকার করে চলত তাদের জীবনধারণ কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ায় বরফ যুগের সেই পশুও হারিয়ে গেল। ফলে আদিমানব ক্ষুধা নিবারণে নতুন করে নির্ভরশীল হওয়া শুরু

করল বিভিন্ন ফল, লতা-পাতা, বীজ ও শস্যের উপর। আস্তে আস্তে মানব সমাজ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করলো এবং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফল শস্য উৎপাদন করা শিখলো। বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি সৃষ্টি হল। বিভিন্ন বন জঙ্গল থেকে মানুষ শস্য ফলমূল সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা শুরু করল এবং ফলশ্রুতিতে বসবাস ও জীবিকার সুবিধার কথা চিন্তা করে মানুষ স্থায়ী জায়গায় অবস্থান করা শুরু করল। মানুষ বুঝতে শিখলো বিচ্ছিন্নভাবে থাকার চাইতে দলবদ্ধভাবে এক স্থানে অবস্থান করে বাস করা বেশি নিরাপদ ও জীবিকা নির্বাহ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। আদি মানব জীবন যাপনের এই সময়কাল নৃতাত্ত্বিকদের ভাষায় প্রস্তর যুগ নামে অভিহিত। এভাবেই প্রাচীন মানুষ যখন সভ্য হওয়া শুরু করল অর্থাৎ যখন থেকে সভ্যতার বিবর্তন ঘটা শুরু করল ঠিক তখন থেকেই ভাব প্রকাশ, হিসাব-নিকাশ নানা ক্ষেত্রে সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। জন্মলগ্ন থেকে গণনার বিষয়টি তথা সংখ্যা পদ্ধতি এতোটা উন্নত ছিল না। মানুষ যখন স্থায়ীভাবে কৃষি কাজে নিয়োজিত হলো, প্রয়োজনের তাগিদে তারা হাতিয়ার উন্নত করার দিকে মনোযোগ দিল। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন বেড়ে গেল। খাবার পরে উদ্বৃত্ত শস্য হিসাব রাখার জন্য মাটিতে দাগ টেনে, কাঠি বা নুড়ি পাথর ব্যবহার করে অথবা দড়িতে গিট দিয়ে কিংবা আঙ্গুলের সাহায্যে হিসাব রাখা শুরু করল। বিজ্ঞানীদের ধারণা আজকে থেকে প্রায় বিশ হাজার বছর পূর্বে এভাবেই প্রথম মানুষ সংখ্যা দিয়ে গণনা শুরু করে। সভ্যতার শুরুতে মানুষের গণনার জন্য বড় বড় সংখ্যার প্রয়োজন হতো না। তাই এ সমস্ত পদ্ধতি সেই সময়কার গণনার যে কোন প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলতে পারতো। মনোবিজ্ঞানী জেয়ার্ড ডায়মন্ডের লেখা থেকে পাওয়া যায় নিউগিনির কিছু গ্রামে কেবল দুটি সংখ্যা প্রচলিত ছিল। তারা এক বুঝানোর জন্য আইয়া (iya) এবং দুই বুঝানোর জন্য রারিডো (rarido) ব্যবহার করত। কখনো চার ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে তারা বলতো রারিডো-রারিডো এবং পাঁচ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা তো রারিডো-রারিডো- আইয়া। ধীরে ধীরে মানুষ বসবাসের সুবিধাজনক স্থানে নগর সভ্যতা গড়ে তুলল। সময়ের পরিক্রমায় বড় সংখ্যা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪০০০ বছর আগে সুমেরীয় ও সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার

মানুষ মাটিতে দাগ টেনে বড় সংখ্যা হিসাব করার এক পদ্ধতি বের করে ফেলল। যা আজও আমাদের কাছে ট্যালি নামে পরিচিত। এই ট্যালি গণনার সংখ্যা পদ্ধতি পৃথিবীর বহু দেশে আজও প্রচলিত আছে। সাধারণত লোকসংখ্যা গণনা, গবাদি পশু গণনা, শস্য গণনার কাজে সুমেরিয় সভ্যতায় ট্যালি পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। সুমেরীয় সভ্যতা মূলত গড়ে উঠেছিল নদীবেষ্টিত দেশ ইরাক ও এর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশীয় সুমের অঞ্চলে। এই অঞ্চলের মানুষজন ছবির সাহায্যে সংখ্যাকে প্রকাশ করা শুরু করে। এই সভ্যতাকেই আবার গ্রীকরা নামকরণ করেন মেসোপটেমিও সভ্যতা হিসেবে।বেলজিয়াম প্রত্নতত্ত্ববিদ জিন ডি হ্যানজেলিন ডি ব্রাউকোর্ট ১৯৬০ সালে আফ্রিকার কঙ্গোর ফিশারমেন সেটেলমেন্ট এর সেমলিকি নদীর তীরবর্তী এলাকায় বেবুনের হাজার বছরের পুরনো একটি হাঁড় খুঁজে পান। যাতে বেশ কিছু পরিকল্পিতভাবে খোদাই করা দাগ দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো দেখে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেন যে দাগগুলো সংখ্যা গণনার হিসাব রাখার জন্য খোদাই করা হয়েছিল। এই হাঁড়টি ISHANGO BONES নামে পরিচিত যা সংখ্যা পদ্ধতির আদি নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই হাঁড়টি ২৫০০০ বছর আগের বলে দাবি করেন। বেঁবুনের এই হাঁড়টি দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার, গারো বাদামী রঙের এই হাঁড়টির এক প্রান্তে কোয়ার্টসের একটি ধাঁরালো টুকরা লাগানো রয়েছে। অনেকেই এই হাঁড়ের খোঁদাই করা দাগগুলোকে ট্যালি চিহ্ন হিসেবে অভিহিত করেন। বিজ্ঞানীরা মনে করে হাঁড়টি চন্দ্রপঞ্জিকার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এটি হলো মানবজাতির প্রাচীনতম গাণিতিক হাতিয়ার।

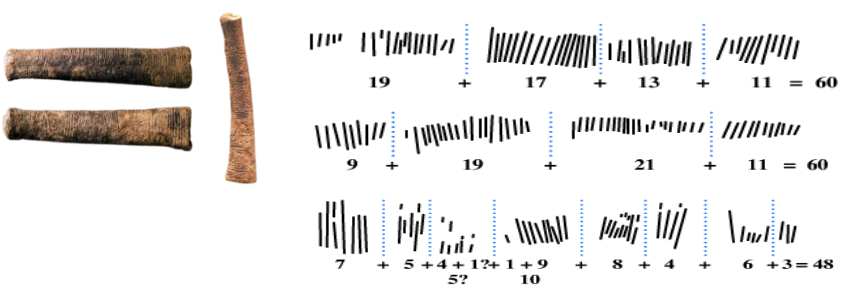

নিদর্শন এর চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা

Ishango Bones এর উপর অঙ্কিত ১৬৮ টি চিহ্ন বা দাগাঙ্কিত রেখা হারের দৈর্ঘ্য বরাবর তিনটি সমান্তরাল কলামে সাজানো। প্রতিটি কলামে দৈর্ঘ্য ও অভিযোজন ভিন্ন বিন্যাসে সজ্জিত করা। প্রথম কলামটি হাঁড়ের সবচেয়ে বাঁকাদিক বরাবর যা M কলাম নামে পরিচিত। বাম এবং ডান দিকের কলামগুলোকে যথাক্রমে G এবং D নামে অভিহিত করা হয়। সমান্তরাল চিহ্নগুলি বিভিন্ন tantalizing অনুমানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ এগুলো দশমিক সংখ্যার ইঙ্গিত বহন করে। তবে অনেক গণিতবিদ অভিমত দেন যে এটি সহজতম কোন গাণিতিক সংখ্যা পদ্ধতি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। হাড়ের আবিষ্কারক "জিন ডি হ্যানজেলিন ডি ব্রাউকোর্ট" চিহ্নগুলোকে সরল পাটিগণিতের প্রমাণক হিসেবে মত দেন। গণিতবিদ পিটার এস রুডম্যান ধারণা করেন সংখ্যাগুলো ৫০০ খ্রিস্টপূর্বে গ্রীক সময়কালের। গণিতবিদ ডার্ক হুইলব্রুক এর মতে ISHANGO BONES হল এমন একটি গণনাযন্ত্র যার বেস হলো ১২, সাববেস হলো ৩ এবং ৪। এটি দ্বারা সরল গুণের কাজ সম্পাদন করা হতো। নৃবিজ্ঞানী ক্যাডেল অ্যাভারেট হাঁড়ের অন্তদৃষ্টি ব্যাখ্যায় বলেন যে- চিহ্নের গ্রুপগুলিতে যে পরিমাণ সংখ্যা গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলি স্পষ্ট প্রাগৈতিহাসিক সংখ্যার প্রমাণ। পূর্ণ সংখ্যার সংস্করণ ও হিন্দু- আরবীয় সংখ্যার বিকাশে অনবদ্য ভূমিকার জন্য ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্টকে সংখ্যা পদ্ধতির জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। গ্রীক দার্শনিক থেলস্ (Thales) সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংখ্যা প্রকাশ করেন। থেলস্-ই প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন। প্রথম জীবনে থেলস্ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, শেষ জীবনে জ্ঞান অর্জন এবং পরিভ্রমণের মাধ্যমে এই অর্থ তিনি ব্যয় করেন। মিশরে অবস্থান কালে ছায়ার সাহায্যে পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয় করে সাধারনের প্রশংসা ভাজন হন। মানুষের ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, সেই সময় তিনি পিরামিডের ছায়া মেপে তার উচ্চতা নির্ণয় করেন। থেলস্ ই প্রথম ব্যক্তি যার নামের সাথে গণিত শাস্ত্রের বিভিন্ন আবিষ্কার জড়িত। প্রাচীনকালের সাতজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে থেলস্ একজন। তাকে গ্রীক জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যামিতি ও পাটিগণিতের জনক বলা হয়। সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাসে থেলস্ প্রবর্তিত চিন্তাধারা এক নতুন জ্ঞানের জগতের দ্বার উন্মোচিত

করে। পূর্ণ সংখ্যার সংস্করণ ও হিন্দু- আরবীয় সংখ্যার বিকাশে অনবদ্য ভূমিকার জন্য ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্টকে সংখ্যা পদ্ধতির জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুমেরীয় সভ্যতার সময় আবিষ্কৃত ট্যালি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা হলো বড় সংখ্যা যেমন: হাজার বা লক্ষের ঘরের সংখ্যা এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রকাশ করা যেত না। এই সমস্যা প্রথম অনুধাবন করেন মিশরীয় মানুষেরা। মিশরীয়রা চিন্তাধারায় যথেষ্ট উন্নত ছিল। মিশরীয়রা অনেক বড় বড় স্থাপনার কাজ করেছে। এ সকল স্থাপনার কাজ করতে গিয়ে তাদের বড় সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। মানব সভ্যতার বিকাশে মিশরীয়দের অবদান সবচেয়ে বেশি। কারণ মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস ও সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস পারস্পরিক অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। মিশরীয়দের বড় বড় স্থাপনা সমূহ নির্মাণের সময়ে হাজার হাজার শ্রমিকের খাবার ও নির্মাণ সামগ্রীর হিসাব রাখতে গিয়ে তারা সংখ্যা প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করত। ধারণা করা হয় মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল পিরামিড নির্মাণেরও বহুবছর পূর্বে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০ অব্দের দিকে। মিশরীয়দের দ্বারা প্রচলিত এসব লিখিত চিহ্নের নাম হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics). হায়ারোগ্লিফিক্স শব্দটি গ্রিক শব্দ হায়ারোগ্রিফোস থেকে এসেছে যার অর্থ পবিত্র লিপি। মিশরীয়দের হায়ারোগ্লিফিক্স লিপি মূলত চিত্রলিপি। প্রাচীন মিশরে তিন ধরনের চিত্রলিপি প্রচলিত ছিল। গ্রীকরা যখন মিশর দখল করে নেয় তখন তারা বিভিন্ন উপাসনালয়ের গায়ে এই লিপি দেখতে পায় তাই তারা এই লিপিকে পবিত্রলিপি মনে করে। উদ্ভবকাল থেকে বিলুপ্তকাল পর্যন্ত এই লিপি ছিল শব্দলিপি ও অক্ষরলিপি নির্ভর অক্ষরলিপি হিসেবে এখানে প্রায় ২৪ টি ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার হলেও স্বরবর্ণের কোন অস্তিত্ব ছিল না খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০অব্দে মিশরীয়রা সর্বপ্রথম গণনা ছাড়াও পরিমাপের জন্য সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেন। এই পরিমাপের পদ্ধতিটি কিউবিট (CUBIT) নামে পরিচিত। এক কিউবিট হচ্ছে একজন মানুষের বাহুর দৈর্ঘ্য ও হাতের তালুর প্রস্থের যোগফলের সমান। এই এককটি তাদের কাছে খুবই পবিত্র ছিল যার ফলে তাঁরা এটার সমান করে একটি লাঠি কেঁটে তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ে সংরক্ষণ করত। এই মাপ দিয়েই তারা বিভিন্ন স্থাপনা যেমন: পিরামিড, মাস্তাবা, মন্দির ইত্যাদি তৈরি করত এবং এসব স্থাপনা জ্যামিতিকভাবে খুবই

নিখুঁত ছিল। মিশরীয়দের সংখ্যা ব্যবস্থা ছিল দশ ভিত্তিক। মিশরীয়রা হায়ারোগ্লিফিক্স পদ্ধতিতে একের জন্য একটি দাগ ব্যবহারের পাশাপাশি প্রতিটি পূর্ণ সংখ্যার জন্য আলাদা করে সংখ্যা ব্যবহার না করে দশ গুণোত্তর হারে প্রতিটি পূর্ণ সংখ্যার জন্য ভিন্ন প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করত। এই পদ্ধতিতে সংখ্যার কোন স্থানীয় মান ছিলনা। মিশরীয়দের এই পদ্ধতিটি আপাতত দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য মনে হলেও সমসাময়িক কালে অনেক বড় বড় সংখ্যাকে সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল।

এই পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন সংখ্যা ছিল ১, যা দ্বারা প্রকাশ করা হতো এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ যা হাঁটু গেড়ে বসা একজন মানুষের ছবি দিয়ে প্রকাশ করা হতো। এই সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। হিসেবে ব্যালেন্স না থাকলে মিশরীয়রা 'নফর' ব্যবহার করত। 'নফর' কোনভাবেই গাণিতিক সংখ্যা শূন্য নয়। ভগ্নাংশ সংখ্যার প্রথম প্রবর্তন হয় মিশরে। এই পদ্ধতিতে স্থানীয় মানের কোন অস্তিত্ব ছিলনা।

মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি (চিত্রলিপি)

ধরা যাক মিশরীয় পদ্ধতিতে আমরা ২০২৪ লিখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের লিখার কোন উপায় ছিল না কারণ এই পদ্ধতিতে শূন্যের কোন অস্তিত্ব নেই কিন্তু যদি ২৩৭৮ লিখতে চাই তাহলে দুইটি ১০০০, তিনটি ১০০, সাতটি ১০ এবং আটটি ১ এর চিহ্ন বা প্রতীক পাশাপাশি লিখে প্রকাশ করতে হবে। ফলে ২৩৭৮ সংখ্যার প্রাচীন মিশরীয় রূপটি হবে নিম্নরূপ:

মিশরীয়দের এই সংখ্যা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পিথাগোরাস কেবলমাত্র গণিতের উপর আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় পিথাগোরাস সর্বপ্রথম জোড় বিজোড় সংখ্যার ধারণা প্রবর্তন করেন। তাই পিথাগোরাসকে বলা হয়

পৃথিবীর প্রথম তত্ত্বীয় গণিতবিদ। পিথাগোরাস কখনোই শূন্য ব্যবহারের অনুমোদন করেননি এ বিষয়ে তিনি এবং তার অনুচরেরা অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা পালন করেন। মিশরের পার্শ্ববর্তী প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ নগরী ব্যাবিলন। বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পাটিগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাবিলনীয়দের অগ্রগতি ছিল অভূতপূর্ব। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান। ব্যাবিলনীয়রা ষাটভিত্তিক (Sexesesimal) সংখ্যা পদ্ধতি উদ্ভব করে।

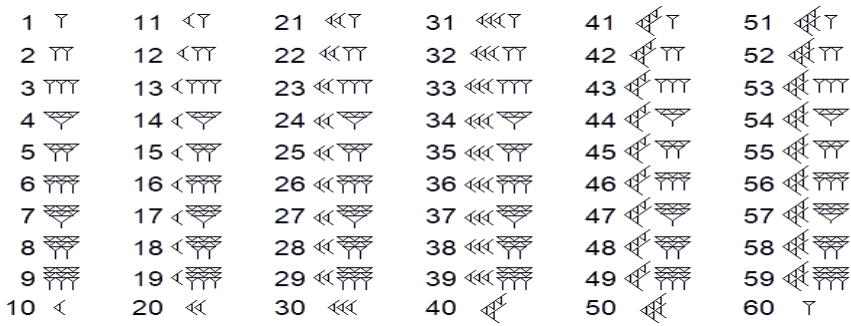

সেক্সেজেজিমাল বা ষাট ভিত্তিক এই সংখ্যা পদ্ধতি ষাট এর গুণিতক আকারে প্রকাশ করা হতো। এই সংখ্যা পদ্ধতি ছিল স্থানীয় সংখ্যা পদ্ধতি। বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রি কোণে বিভক্তকরণ, ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট, ৬০ মিনিটে ১ ঘন্টা, ১২ ঘন্টায় একদিনে প্রচলন করেছিল মূলত ব্যাবিলনীয়রাই। ব্যাবিলনীয়দের ১ মিনিট ছিল বর্তমানে প্রচলিত ২ মিনিটের সমান। তবে ব্যাবিলনীয়দের অর্জিত জ্ঞানের বেশিরভাগই কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেলেও মৃৎপাত্রে অঙ্কিত ও পাথরের ফলকে খোদাই করা লেখা থেকে জানা যায় ব্যাবিলনীয়রা পিথাগোরাসের উপপাদ্য ও দ্বিপদী উপপাদ্য সম্পর্কে অবগত ছিল। মিশরীয়দের মতো ব্যাবিলনীয়রাও শূন্যের ব্যবহার জানতো না। ষাটমূলক সংখ্যা পদ্ধতি উপর্যুক্ত চিহ্নগুলো ছাড়াও তারা আরো বেশ কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করত। এখানে একটি প্রশ্ন সবার মনে চলে আসতে পারে সেটা হল ব্যাবিলনের ষাট প্রীতির কারণ কি? এর সরাসরি উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে এর সাথে অনেকগুলো সম্পর্কযুক্ত বিষয় জড়িয়ে আছে। প্রথমত

৬০ হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা যেটি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ২০ এবং ৩০ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। তাই ভগ্নাংশ সংক্রান্ত কোনো সমস্যার সমাধানের ৬০ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সংখ্যা। মনেকরি একটি কৃষি উৎপাদনে ৩ জন কৃষক অংশগ্রহণ করল। তারা এমন ভাবে চুক্তি করল যে মোট উৎপাদনের প্রত্যেকে যথাক্রমে মোট লাভের ১/২, ১/৩ এবং ১/৬ অংশ পাবে। তাহলে যদি ৬০একক ফসল উৎপাদন হয় প্রথম জন পাবে ৩০একক দ্বিতীয়জন পাবে ২০ একক এবং তৃতীয় জন পাবে ১০ একক। অর্থাৎ লাভ যত টাকাই হোক না কেন সেটাকে যদি ৬০ এর গুণিতক আকারে প্রকাশ করা হয় তাহলে হিসাবটা বেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যদি উৎপাদন শেষে হিসাব করে দেখা যায় খরচ অবশিষ্ট এক হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তাহলে ভগ্নাংশ ব্যতিরেকে লভ্যাংশ বন্টন করতে হলে (১৬*৬০+40=1000); প্রথমজন পাবে ৩০টাকার ১৬ গুণ এবং অবশিষ্ট ৪০ টাকার অর্ধেক অর্থাৎ ৫০০ টাকা। দ্বিতীয় জন পাবে ২০ টাকার ১৬ গুণ এবং প্রথম অবশিষ্ট টাকা বিতরণের পর যে টাকা অবশিষ্ট থাকবে সেখান থেকে তৃতীয জনের দ্বিগুণ টাকা পাবে দ্বিতীয় জন অর্থাৎ ১৩ টাকা; দ্বিতীয় জন মোট পাবে ৩১৩ টাকা। অবশিষ্ট ১৮৭ টাকা পাবে তৃতীয় জন। এভাবেই খুব সহজে কোন ভগ্নাংশ ছাড়াই নির্ভুল বন্টন সম্ভব। এখানে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের মত চমৎকার গুণ ভাগ করার পদ্ধতি সে সময়ের জানা ছিল না। বর্তমানে আমরা যে দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করি সেটা আবিষ্কৃত হয়েছে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার আরও ৩০০০ - ৩৫০০ বছর পরে ভারতবর্ষে। এছাড়া ব্যাবিলনীয়রা এক সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য হিসাব করেছিল ৩৬০ দিন, যেটার প্রকৃত দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। আবার ব্যাবিলনীয়রা একদিন হিসাব করত ১২ ঘণ্টায়। বিজ্ঞানীদের মতে এসব কারণেই ব্যাবিলনীয়রা ষাটমূলক পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল।

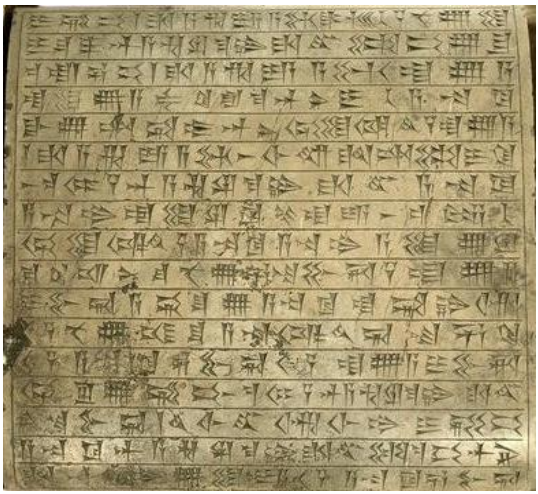

ব্যাবিলনীয়দের খোদাই করা শিলালিপি

সমসাময়িক সময়ে ব্যাবিলনীয়দের পাশাপাশি সুমেরু, মেসোপটেমিয়া, অ্যাসিরিয়র বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন একটি লিপির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যা কিউনিফর্ম নামে পরিচিত। বাংলায় এই লিপিকে বলা হয় কিলকাকৃতি লিপি। এই লিপিতে সংখ্যা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করা হতো। এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রথম যোগ ও গুনের পাশাপাশি বিয়োগের ধারণা বিকাশ লাভ করে। এই লিপির মৌলিক অংক সমূহ ছিল ১, ১০, ১০০ এবং ১০০০। এর বাইরে অন্য কিছু প্রকাশ করা হতো যোগ, গুণ কিংবা বিয়োগ করে। যেমন: ১২ লিখতে ১০ এর সাথে দুটি ১ চিহ্ন যোগ করা হতো আবার ৮ প্রকাশ করতে ১০ এর সাথে দুইটি ১ চিহ্ন বিয়োগ করা হতো। প্রাচীন যুগে এই লিপি অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সুমেরীয় ও আক্কাদিয়ান বাদে অ্যাসিরিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান, হাত্তিক, হুররিয়ান, উরাতিয়ান,হিট্টাইট,লুউইয়ান ভাষাও এই লিপিতে লেখা হয়। মিশর ছিল উর্বর ভূখণ্ড এবং এর অধিবাসীরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। কিন্তু মিশরের পার্শ্ববর্তী গ্রিসের মূল ভূখণ্ড ছিল পর্বতময় ও অনেকাংশ অনুর্বর। মিশরীয়রা কৃষিকাজ করে উৎপাদন করতো এবং ঈশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাসী ছিল অপরদিকে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে গ্রিকরা যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শিতা লাভ করে। মিশরীয় সভ্যতা ক্রমেই নতুনত্বহীন হয়ে পড়ে এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতা সমাজ বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। রাজ্য বিস্তারে

মনোনিবেশকারী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী গ্রীকরা সহজে মিশর দখল করে। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রিকদের সভ্যতার আকস্মিক উত্থান অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করা দুরূহ। বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক শিল্প ও সাহিত্যকলায় গ্রিকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণিত,বিজ্ঞান ও দর্শনে যে উপাদানসমূহ মিশর ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় অনুপস্থিত ছিল গ্রিক সভ্যতা সে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতা আনয়ন করেন। গ্রীকরা মিশর থেকে গণিত এবং ব্যাবিলনীয়দের থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান লাভ করেছে ঠিক কিন্তু সমতল জ্যামিতির মৌলিক নিয়মগুলো তাদের নিজস্ব কৃতিত্ব। মিশরীয়রা যে জ্যামিতির বিকাশ সাধন করে তা বিজ্ঞানসম্মত ছিল না কিন্তু গ্রিকরা বিজ্ঞানসম্মত জ্যামিতির বিকাশ ঘটায়। গ্রিক দার্শনিক ও গণিতবিদ আর্কিমিডিস সংখ্যা পদ্ধতি কে নিয়ে যান এক অনন্য উচ্চতায়। পিথাগোরাস ও আর্কিমিডিসের হাতে জ্যামিতির প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। এরিস্টটল সর্বপ্রথম অসীমের ধারণা প্রচলন করেন। ব্যাবিলন ও মিসরের মত গ্রিকরাও শূন্যের ব্যবহার করত না। এর বড় কারণ গ্রিক সংখ্যাব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যাবিলনীয় ও মিশর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। গ্রীকরা সংখ্যার জন্য আলাদা কোন প্রতীক উদ্ভাবন করেনি বরং গ্রীক বর্ণমালার অক্ষরের সাহায্যে তারা সংখ্যা প্রকাশ করতো। গ্রীকরা ব্যাবিলনীয় এবং মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দশ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল।

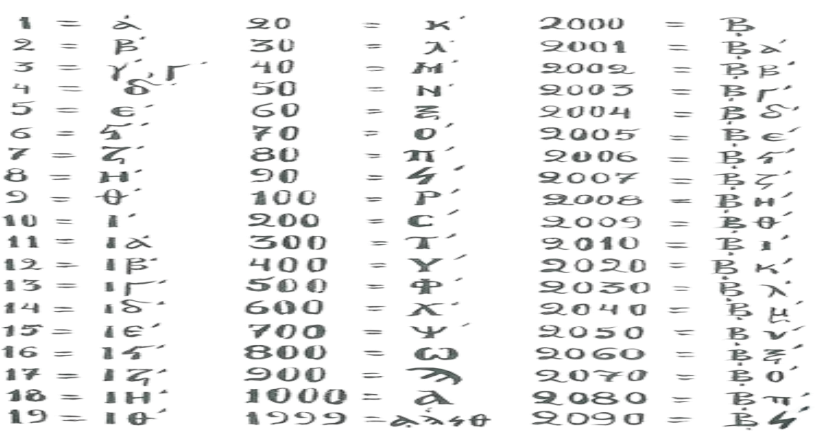

প্রাচীনগ্রিক সংখ্যা পদ্ধতির তালিকা

উপর্যুক্ত সারণি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ল্যাম্বডা দ্বারা বুঝানো হতো ৩০ কারণ ল্যাম্বডা এর অবস্থান তিন নম্বর সারিতে এবং ১০এর কলামে। বিটা দ্বারা বুঝানো হতো ২। তাই গ্রিক পদ্ধতিতে ৩২ লিখতে হলে আমাদের লিখতে হতো ল্যাম্বডা বিটা। কিন্তু সমস্যা হল সারণি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১ থেকে ৯০০ পর্যন্ত লিখতেই গ্রীকরা ৩৬টি আলাদা আলাদা অক্ষর ব্যবহার করত। অনুরূপভাবে এক লক্ষ পর্যন্ত লিখতে ৪৬ টি আলাদা অক্ষর ১০ লক্ষ পর্যন্ত লিখতে ৫৫ টি আলাদা অক্ষর এবং এক কোটি পর্যন্ত লিখতে ৬৪ টি আলাদা আলাদা অক্ষর ব্যবহার করতে হতো। আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা পৃথিবীর সকল সংখ্যাকেই শূন্য(০) থেকে নয় (৯)এই দশটি প্রতীকের সাহায্যে লিখতে পারি। গ্রিক সংখ্যা পদ্ধতির এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর মনে রাখা একদিকে যেমন দুষ্কর অন্যদিকে তাদের যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ করাও কষ্টসাধ্য। গ্রীক সংখ্যা পদ্ধতির অন্যতম নিদর্শন হলো ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বের দুইটি প্যাপিরাস যাতে পাটিগণিত জ্যামিতির নানা সমস্যা ও সমাধান লিপিবদ্ধ আছে। পঞ্জিকা গণনাতেও তারা গণিতভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ব্যবহার করত গণিতের হর্ষদ ও ড্যামলো সংখ্যার উদ্ভব ও বিকাশ ও তাদের দ্বারাই হয়। ১৩শ শতাব্দীতে লিসেস্টারের আর্চডিকন জন অব বেসিংস্টোকের দ্বারা সিস্টেরিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি নামে আরও একটি বুদ্ধিমান সংখ্যা পদ্ধতি চালু করা হয়। এই সংখ্যা পদ্ধতিটি মূলত প্রাচীন গ্রীক সংখ্যা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। জন বেসিংস্টোক একজন গ্রীক পন্ডিত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সিস্টারিকান সন্ন্যাসীদের মধ্যে গ্রিক বৃত্তি ছড়িয়ে দিতে। এর ফলে ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে পর্তুগাল থেকে পোল্যান্ড এবং ইতালি থেকে সুইডেন পর্যন্ত মঠগুলোতে এই পদ্ধতি বিস্তৃতি লাভ করে। জন বেসিংস্টোক প্রথমে এর সাহায্যে ১থেকে ৯৯পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে প্রকাশ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এটি দ্রুত ৯৯৯৯ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ David A King একই ধরনের আরও একটি সংখ্যা পদ্ধতি ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডিতে খুঁজে পান। সমসাময়িক সময়ে রোমান সংখ্যা প্রভাব বিস্তার করলেও খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা সিস্টেরিয়ান সংখ্যা পদ্ধতিটিকেই ধরে রেখেছিলেন। রোমান সংখ্যার চাইতে এই সংখ্যা পদ্ধতি তাদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার একটি কারণও ছিল আর তা হলো এই

পদ্ধতিতে কোন সংখ্যাকে কেবল একটি প্রতীক দিয়ে লেখা যেত। তবে এই পদ্ধতির বড় দুর্বলতা হলো গুণ ভাগ করা যেত না। এই সংখ্যা পদ্ধতিতে একক বর্ণনাক্রমিক দশটি প্রতীক ব্যবহার করা হতো।

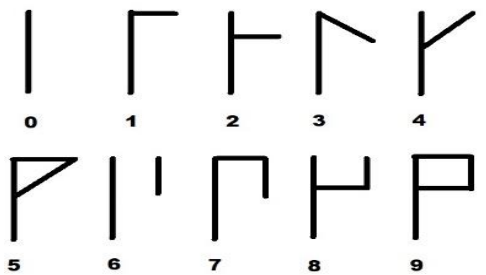

সিস্টেরিয়ান সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক

এই সংখ্যাগুলোকে সহজ গাণিতিক গণনার জন্য ব্যবহার করা হতো না এর পরিবর্তে তারিখ, পান্ডুলিপীর পৃষ্ঠা সংখ্যা, পাঠ্যের বিভাজন, নোটের সংখ্যা, তালিকা, এমনকি হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে জড়িত নোটেশনের জন্যেও ব্যবহার করা হতো। সন্ন্যাসীরা মঠগুলোতে এই সংখ্যা পদ্ধতি এতো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল যে স্থানীয় জনগণ তাদের প্রচলিত সংখ্যাগুলোতে অনেক পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়। ১৮ শতক পর্যন্ত ওয়াইন ব্যারেলের সংখ্যা এবং সেই ব্যারেলে ওয়াইনের পরিমাপ করার জন্য এই সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। বর্তমান গণিতের ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত (চতুর্থাংশ)পদ্ধতির Cisterian number system এ খ্রিস্টান ক্রসের উপর ভিত্তি করে চারটি চতুর্ভুজ রয়েছে। প্রতিটি চিহ্ন যেকোনো ১-৪ সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। এসিস্টেন্ট টি ব্যবহার করার জন্য প্রচলিত নয়টি প্রতীক আত্মস্থ থাকতে হবে। ONES চতুর্থাংশে ব্যবহৃত হতো (১-৯) এর জন্য. TENS চতুর্থাংশে ব্যবহৃত হতো (১০-৯০) এর জন্য, HUNDREDS চতুর্থাংশে ব্যবহৃত হতো (১০০-৯০০) এর জন্য,THOUSANDS চতুর্থংশে ব্যবহৃত হতো (১০০০-৯০০০) এর জন্য । সাইফার (চিহ্ন) এর সাহায্যে লক্ষ লক্ষ, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন চিত্রিত করার জন্য কয়েক শতাব্দি ধরে অনেক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এলোমেলো সিস্টারসিয়ান সংখ্যাগুলিকে

মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীরা স্বরলিপি পদ্ধতিতে চিত্রিত করে। সমস্ত প্রতীকগুলো একটি একক আনুভূমিক চিহ্ন ব্যবহার করে তৈরি করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে ১৪ ও ১৫ তম শতকে উলম্ব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেহেতু এই চিহ্নগুলো ক্রুশের মতো দেখায় তাই সন্ন্যাসীদের কাছে সিস্টারসিয়ান চিহ্ন গুলো ত্রাণকর্তার রূপক হিসেবে পরিগণিত হতো। সময়ের পরিক্রমায় ইন্দো-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি যখন হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে ছাপানো বইয়ে স্থানান্তরিত হয় এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে রোমান সংখ্যার প্রভাব বিস্তার লাভ করে, খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের জনপ্রিয় এই সিস্টারসিয়ান পদ্ধতি সভ্যতার অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ১৯৯১ সালের লন্ডন ভিত্তিক নিলাম প্রতিষ্ঠান 'ক্রিস্টিজ' সিস্টারসিয়ান সংখ্যা পদ্ধতির একটি খোদাই করা সাইফার গ্লিফ সমষ্টির সন্ধান লাভ করে। গ্রিসের সভ্যতার অবসানের আগেই খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ইতালিতে পাহাড় বেষ্টিত টাইসর নদীর তীরে একটি বিশাল সম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে ওঠে যা রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত। রোমান সভ্যতার ব্যাপ্তি প্রায় দুই হাজার বছর। যুদ্ধবিগ্রহে আগ্রহী রোমানরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক জাতি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের চাইতে শরীর চর্চা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা হওয়ার দিকে বেশি মনোযোগী ছিল। বিভিন্ন সামরিক কলাকৌশল গ্রহণ করে নিজেদেরকে সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তুলত। যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে আগ্রহী রোমানরা যখন গ্রিসের 'সিরাকাস' দখল করতে গিয়ে আর্কিমিডিস কে হত্যা করল এরপর থেকে গণিতের উন্নতি রোমানদের দখলে চলে গেল। রোমানদের আলাদা একটি সংখ্যা পদ্ধতি ছিল যদিও সেটা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০ অব্দে রোমানরা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি চালু করে। রোমানদের দ্বারা প্রচলিত এই সংখ্যা পদ্ধতিটি ইউরোপীয়রা প্রায় ১৮০০ বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে। ভৌগলিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি যখন হিন্দু- আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তখন তা আরো কার্যকর রূপে প্রভাব বিস্তার লাভ করে। রোমান সংখ্যা পদ্ধতিতে সহজে যোগ,বিয়োগ করা গেলেও অন্যান্য গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ অনুপস্থিত ছিল। এই পদ্ধতিতে ভগ্নাংশ ও শূন্যের কোন অস্তিত্ব

ছিলনা। রোমানরা তাদের সংখ্যা পদ্ধতির বেশিরভাগ চিহ্ন গ্রহণ করেছিল গ্রীক থেকে কিন্তু প্রচলিত জীবন ব্যবস্থায় রোমানরা গ্রীকদের থেকে ভিন্ন ছিল। যেমন: সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যামিতি ও গণিতের অন্যান্য বিমূর্ত বিষয়গুলো নিয়ে রোমানরা উদাসীন ছিল। রোমানরা মূলত সংখ্যাকে সরলীকরণ করে জীবন উপযোগী গণিতের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিল। গুণ ও ভাগের ক্রিয়া-কলাপকে পাশ কাটিয়ে রোমানরা অ্যাবাকাসের মত গণনা বোর্ড ব্যবহার করত। অর্থাৎ গণিতের কার্যকারিতাকে রোমানরা মারাত্মক আকারে সীমিত করে আনে। এই কারণে অনেক গণিতবিদ রোমানদের এই সময়কে গণিতের অন্ধকার যুগ হিসেবে অভিহিত করে।পণ্য বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ায় আধুনিক সংখ্যা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির পরও রোমান সংখ্যা গুলো বহু শতক পর আজও টিকে আছে। রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং রোমান সংখ্যা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে ১৪ শতকে এসে রোমান সংখ্যা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে হিন্দু- আরবীয় সংখ্যা ব্যবস্থায় বিলীন হযে যায়। আধুনিক সংখ্যা ব্যবস্থায় রোমান সংখ্যাগুলি গণিতের প্রয়োজনীয় উপাদান না হলেও নান্দনিকতার শৈল্পিক বিচারে এগুলো এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-ইউরোপীয়, পশ্চিম এশিয়ার ককেশাস ও এশিয়ান অঞ্চলের সাথে ইহার অনেক মিল ছিল এবং এর শিকড় পশ্চিম এশিয়া থেকে পূর্ব-মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এট্রস্ক্যান সংখ্যাগুলি রোমান সংখ্যার মতো একই শৈলীতে ব্যবহৃত হয়েছিল। চলমান আলোচনায় যে সকল সভ্যতার সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলো প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল অথবা একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো মায়ান সভ্যতার সংখ্যা পদ্ধতি । মায়ান সভ্যতা হলো বিশ্বের অন্যতম কয়েকটি সভ্যতার মধ্যে একটি সভ্যতা যারা স্বতন্ত্রভাবে একটি স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি তৈরি করেছিল। কিন্তু অবাক করার বিষয় হল এই যে মাত্র ৫০০ বছর আগেও লাতিন আমেরিকার এই সভ্যতাটি সম্পর্কে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মানুষেরা অবগত ছিল না অথচ আজকে থেকে প্রায় ১৫ শত বছর পূর্বে মেক্সিকো ও আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও আধুনিক মনা এই সভ্যতা উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে। মায়ান সভ্যতা

সম্পর্কে লোকোমুখে অনেক রহস্যময় কাহিনী প্রচলিত থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে মায়ান সভ্যতা পরিচিতি লাভ করে তাদের দিনপঞ্জিকার কারণে। অবাক করার বিষয় হলো মায়ান দিনপঞ্জিকায় ২০১২ খ্রিস্টাব্দের পর আর কোনো বর্ষ ছিল না। মায়ানরা বিশ্বাস করতো ২০১২ খ্রিস্টাব্দের পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। যদিও এই ধারণার সাথে অনেক গবেষক দ্বিমত পোষণ করেছেন। এতকিছুর পরও সকল গবেষক এই বিষয়ে একমত যে মায়ান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল স্বতন্ত্র ভাবে। প্রাক কলম্বিয়ান মায়ান সভ্যতার মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিটি গণনার জন্য Vigesimal সিস্টেম ব্যবহার করেছিল। এই সংখ্যাপদ্ধতি মূলত ছিল ২০ এবং পাঁচ ভিত্তিক অবস্থানিক এক ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে দশের পরিবর্তে ২০ এর উপর ভিত্তি করে এর সকল গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হতো। আমাদের প্রচলিত গাণিতিক সিস্টেমে ১,১০,১০০, এবং ১০০০ এর পরিবর্তে মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে ১,২০,৪০০, ৮০০০ এবং ১৬০,০০০ ব্যবহার করা হতো। এর চাইতেও অবাক করার বিষয় হলো যে মায়ানরা শূন্যের জন্য আলাদা প্রতীক ব্যবহার করত। ০,১ ও ৫ এই তিনটি সংখ্যার জন্য তারা শুধু আলাদা প্রতীক ব্যবহার করত। সেদিক থেকে চিন্তা করলে মায়ানরা আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতির খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। তবে যোগ, বিয়োগ সহ অন্যান্য গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি খুব একটা সুবিধার ছিল না। মায়ানরা লেখাকে দেবতার কাছ থেকে পাওয়া একটি পবিত্র উপহার বলে মনে করত। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি এক প্রকার অভিজাত শ্রেণি দ্বারা সংরক্ষিত ছিল বলে সাধারণ মায়ানরা লিখতে ও পড়তে পারতো না। অভিজাত শ্রেণি এই মর্মে বিশ্বাসী ছিল যে তারা সরাসরি দেবতাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তারা মনে করত দেবতা ও সাধারণ মানুষের মাঝে তারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত লেখার পদ্ধতিটি আংশিকভাবে হায়ারোগ্লিফিক ছিল কারণ এটি অক্ষরের পরিবর্তে পরিসংখ্যান ব্যবহার করতো। সিলেবল এবং আইডিওগ্রামের ধ্বনিগত প্রতীকগুলোর সংমিশ্রনে তৈরি করা হয়েছিল মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতির লিপিগত পাঠোদ্ধার করা অত্যন্ত জটিল ও দূরহ কাজ। স্প্যানিশ যাজকদের আদেশে তিনটি ব্যতীত অবশিষ্ট মায়ান কোডগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতির পাঠোদ্ধারে যে

কোডগুলো এখনো সংরক্ষিত আছে সেগুলো হল ড্রেসডেন কোডেক্স,প্যারিস কোডেক্স এবং মাদ্রিদ কোডেক্স। মায়ানরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ ছিল এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ছিল নির্ভুল। সমসাময়িক সভ্যতা গুলোর মধ্যে অন্যান্যদের চাইতে মায়ানরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। কোন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করেই তারা চাঁদ এবং গ্রহের গতিবিধির নির্ভুল পর্যবেক্ষণ করে দিতে পারতো। সৌর বছরের দৈর্ঘ্য পরিমাপে ইউরোপের তুলনায় মায়ান সভ্যতা বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে গাণিতিক ক্রিয়া-কলাপের চাইতে সময় পরিমাপকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এজন্য মায়ান সংখ্যা পদ্ধতির বেশিরভাগ নিদর্শন দিন, মাস এবং বছরের সাথে সম্পর্কিত দিনপঞ্জিকাতে পাওয়া যায়। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যাগুলিকে বিশের মধ্যে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি যে তিনটি প্রতীক নিয়ে গঠিত তার মধ্যে প্রথমটি হলো একটি শেলসেপ যা দ্বারা শূন্য কে প্রকাশ করা হয়, দ্বিতীয়টি একটি বিন্দু(.) যা দ্বারা ১ কে প্রকাশ করা হয়, তৃতীয় প্রতীকটি একটি দন্ড বা বার(-) যা দ্বারা পাঁচ কে প্রকাশ করা হয়। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতির প্রতিটি স্তরে বিশটি বিন্দুতে পৌঁছাতে হয়। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে এক কে একটি বিন্দু দ্বারা, দুইকে দুটি বিন্দু দ্বারা ৩কে ৩টি বিন্দু দ্বারা, ৪কে চারটি বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয় পাঁচ প্রকাশের জন্য একটি আনুভূমিক বার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ১থেকে ১০০পর্যন্ত সংখ্যাগুলি মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বিন্দু চার বারের বেশি পুনরাবৃত্তি করা হয় না। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মায়ান সংখ্যাগুলিকে নিচে তালিকা করে উপস্থাপন করা হলো।

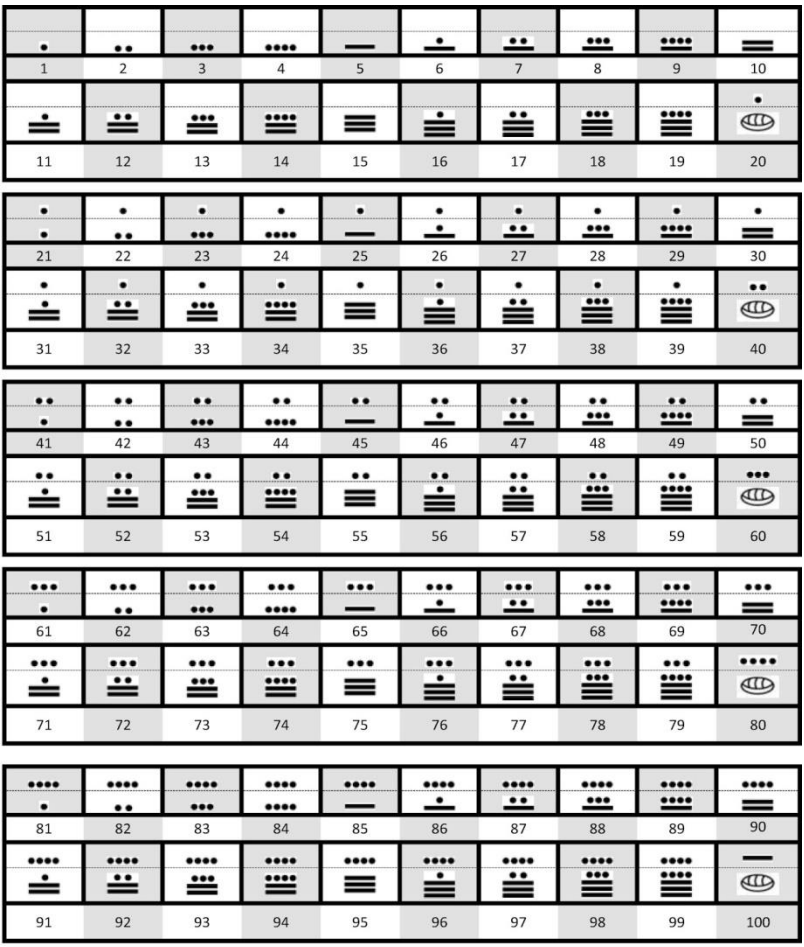

পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এর ভিতরে অনেক ধরনের সংখ্যা ব্যবস্থা আছে যেগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে এরকম কিছু সংখ্যা পদ্ধতি হলো নিউগিনির ওক্সাপমিন জনগোষ্ঠী সংখ্যার যে পদ্ধতি ব্যবহার করত তা ওক্সাপমিন সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই সংখ্যা পদ্ধতি ছিল ২৭ ভিত্তিক। মানবদেহের ২৭ অঙ্গের চিহ্ন থেকে তারা এ

২৭ ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। আফ্রিকার নাইজার - কঙ্গো এলাকার জনগোষ্ঠী তাদের ইয়োরুবা ভাষাতে যে সংখ্যা পদ্ধতি চালু করেছিল তা ইয়োরুবা সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই সংখ্যা পদ্ধতি ছিল ২০ ভিত্তিক। এই পদ্ধতির জটিলতা হল একই সাথে যোগ মূলক পদ্ধতির সাথে বিয়োগ মূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।পাপুয়া নিউগিনির অধিবাসীগণ তাদের নিজস্ব ভাষায় এনডোমে যে সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল তা এনডোম সংখ্যা পদ্ধতির নামে পরিচিত। এই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ছিল ৬। পাপুয়া নিউগিনিতে হুলি ভাষায় ১৫ ভিত্তিক একধরনের সংখ্যা পদ্ধতি চালু ছিল যা হুলি সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত।মায়ান সভ্যতায় মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি ব্যতীত,২০ ভিত্তিক আরো এক ধরনের গণনা ব্যবস্থা চালু ছিল যা জটজিল সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত । হাত ও পায়ের বিশটি আঙুল কে কেন্দ্র করে এই সংখ্যা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এসবের বাইরেও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে নানা আঙ্গিকে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধরনের এই সংখ্যা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ছিল ও গণনার বিভিন্ন ধরনের অভিনব কৌশল অবলম্বন করা হতো।সময়ের পরিক্রমায় সভ্যতা যখন আধুনিক রুপ লাভ করেছে আর সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে সংখ্যা পদ্ধতিরও উন্নতি ঘটেছে। মায়ান সভ্যতা যে সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল সেখানে অনেক বড় সীমাবদ্ধতা হলো মায়ান দিনপঞ্জিকা। যেখানে ২০১২ এর পরে আর কোন বর্ষ সংখ্যার উপস্থিতি ছিল না অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করতো ২০১২ খ্রিস্টাব্দের পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ ২০২৪খ্রিষ্টাব্দ কিন্তু পৃথিবী দিব্যি তার নিজ গতিতে চলমান। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যা পাওয়া যায় তা হল বর্তমানে যে পদ্ধতিতে আমরা সংখ্যা লিখি সেটা প্রাচীন ভারতীয় এবং আরবীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। আধুনিক এই সংখ্যা পদ্ধতিকে কেউ বলে ইন্দো-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি, কেউ বলে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি। ভারতীয় গণিতবিদগণ প্রথম ও চতুর্থ শতাব্দীর মাঝে সমগ্র বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত অবস্থানগত ১০ ভিত্তিক সংখ্যার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত।শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত মোট দশটি গ্লিফের উপর ভিত্তি করে এই সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।এতদিন যাবত গণিতের অনেক সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার হলেও, কোন সংখ্যা পদ্ধতিতেই শূন্যের ব্যবহার রাখা

হয়নি। শূন্যের কার্যকর ব্যবহার শুরু হয় ভারতীয় সভ্যতায়। পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোতে শূন্যের ব্যবহার ছিল না ঠিকই কিন্তু শূন্য সম্পর্কে ধারণা প্রচলিত ছিল। যেমন: মিশরীয়রা হিসেবে ব্যালেন্স না থাকলে শূন্য বা নফর দিয়ে তা প্রকাশ করত। ৬০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্ট শূন্যকে সংকেত বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার না করে সংখ্যা হিসেবে সফলভাবে ব্যবহারের প্রথম কৃতিত্ব দেখান। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত শূন্য এর ব্যবহার সম্পর্কিত নিয়ম কানুন 'Brahamasphuta Siddhanta' নামক বইয়ে প্রকাশ করেন। ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে শুরু হলেও, ৬০০খ্রিস্টাব্দের আগে এর লিপিবদ্ধ কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মীয় প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আরবীয়দের যাতায়াত বহু পূর্ব থেকেই। আরবের প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতির চেয়ে ভারতে প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতির গাণিতিক হিসাব নিকাশ ছিল অনেক সহজ বোধ্য এবং কার্যকরী। দারুন এই সংখ্যা পদ্ধতিটি আরবদের মনে তাই খুব সহজে জায়গা করে নেয়। ভারতে শিখে যাওয়া এই সংখ্যা পদ্ধতিটি আরব সমগ্রবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। নবম শতাব্দীতে 'আলখোয়ারিজমী' এবং 'আলকিন্দি' রচিত বই 'আরবীয়-গণিতে' ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিটি গৃহীত হয়। এর পর থেকেই ইউরোপে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। আর এই জনপ্রিয়তার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন 'লিওনার্দো দ্য পিসা' যার ডাকনাম ছিল 'ফিবোনাচ্চি'। তার নাম অনুসারে গণিতে আলাদা একটি অধ্যায় সৃষ্টি হয় যা ফিবোনাচ্চি ধারা নামে পরিচিত। ছন্দ প্রকরণে গণিতে ফিবোনাচ্চি ধারা প্রথম ব্যবহার করেন ভারতীয় গণিতবিদ পন্ডিত পিঙ্গলা।আধুনিক সংখ্যা ব্যবস্থা মূলত স্থানিক সংখ্যা ব্যবস্থা। যা আমাদের জীবন, বিজ্ঞান, শিক্ষা সহ রাষ্ট্রীয় সকল ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়। জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে সংখ্যার প্রয়োজন। সংখ্যা ব্যতীত জীবনে চলা কল্পনাতীত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংখ্যা জড়িয়ে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনের কোণে নতুন ভাবনা উদয় করে যে, সংখ্যা পদ্ধতি আগামী বিশ্বকে কোথায় নিয়ে যাবে। আমরা যে দশটি অংক দ্বারা সংখ্যা গঠন করি সেগুলোকে শৃঙ্খলায়িত করা হয়েছে সুন্দর একটি পরিকল্পনায়। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্ক গুলোকে আমরা ৯টি সার্থক

সংখ্যায় রূপান্তর করেছি। ৯ এর চেয়ে বড় সংখ্যাকে দুই বা দুই এর চেয়ে বেশি অংকের যোজনা দিয়ে লিখতে হয়। কয়েকটি অঙ্ক পাশাপাশি বসে যখন কোন মান প্রকাশ করে, তখন অঙ্ক গুলো তাদের নিজ নিজ অবস্থানের স্বকীয়তা বজায় রাখে যাকে স্থানীয় মান হিসেবে অভিহিত করা হয়। শূন্য(০) সহ দশটি অঙ্কের মাধ্যমে যোজনা দিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করার এই নিয়ম ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে উদ্ভব হয় এবং আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতির দ্বারা ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ইউরোপীয়রা একে হিন্দু-আরবীয় অংক পাতন প্রণালী নামে অভিহিত করে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্কর আচার্য তার কন্যাকে উৎসর্গকৃত পাটিগণিতের বই 'লীলাবতী'-তে সংখ্যার স্থানের নাম যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা হল:

'একদশশতসহস্রযুত লক্ষ প্রযুত কোটাযঃ ক্রমশঃ
অর্বুদমজং খর্ব্ব নিখ মহাপদ্মশঙ্কবস্তস্মাতা।
জলধিশ্চান্ত্যংমধ্যং পরার্দ্ধমিতি দশগুনোত্তরাঃ সংজ্ঞাঃ।
সংখ্যায়াঃ স্থানানাং ব্যবহারার্থং কৃতাঃ পূর্ব্বৈঃ।'

সংখ্যা পদ্ধতির ক্রমবিবর্তনিক ইতিহাস প্রাচীন যুগ পেরিয়ে আজ পর্যন্ত এসেছে। ভবিষ্যতের সংখ্যা ব্যবস্থার চিত্র কেমন হতে যাচ্ছে সেই প্রশ্নই উদিত হোক তৃষ্ণার্ত মনে।

তথ্যসূত্র:

১) গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রথম সংস্করণ: মাঘ,১৩৭৬, ঢাকা ।
২) উপমহাদেশে গনিতের ইতিহাস, ইতিহাসের গনিত, অভীক রায়, প্রথম প্রকাশ-২০২২, ঢাকা।
৩) সংখ্যা, সেলিনা বাহার জামান, প্রথম প্রকাশ-২০০৭, ঢাকা
৪) বিজ্ঞান চিন্তা, পত্রিকা, ঢাকা -১২ ফেব্রুয়ারি২০২০।
৫) প্রথম আলো পত্রিকা, ঢাকা, ১০মে ২০২২
৬) ব্যাপন, বিজ্ঞান পত্রিকা, বর্ষ০৯, সংখ্যা ০৪, ঢাকা।
৭) দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ঢাকা, ১৮মে ২০২১ মুদ্রিত।

৮) ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি, গান্তি প্রসাদা রাও, এপ্রিল ২০২৩, ভারত
৯) প্রাচীন ভারতীয় গনিত ও জ্যোতির্বিদ্যা, সৌমেন সাহা, প্রথম প্রকাশ-২০১৪, ঢাকা।
১০) দ্যা হিস্ট্রি অব নাম্বার সিস্টেম, গ্যাব্রিয়েল স্মে,২০১৭, ইউএসএ।
১১) Number Theory and It's History - By Oystein Ore
১২) History of Ancient numeral system. By- Cassandra and Ala'a
১৩) www.luiss.edu
১৪) www.timeanddate.com
১৫) www.euemath.com

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 329-339
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.023

কাজী নজরুল ইসলামের ‘বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি’ : প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার সমন্বয়

তাপস মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.11.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the world of modern Bengali poetry, Kazi Nazrul Islam is a name that remains unforgettable. Without him, the discussion of Bengali poetry would be incomplete. Though not educated in the traditional academic system, his poetry has introduced a new dimension to Bengali literature, earning eternal glory for all Bengalis. The world poet Rabindranath Tagore was also deeply impressed by Kazi Nazrul Islam's poetic talent. However, Nazrul did not adhere to conventional poetic styles. Instead, he used his talent to voice rebellious words for the common people, earning him the title of the ‘Rebel Poet.’ But this was not his only identity. His personality also reflected a deep love and connection to nature. While rebellion marks the early phase of Nazrul's poetry, love and nature consciousness emerge in his later works, where love and passion intertwine. A beautiful combination of love and

nature consciousness can be seen in his poem 'Bataayan-Pashe Gubak Tarur Saari'.

Keywords: Nazrul Islam, Bengali Literature, Consciousness, Love & Nature.

> "আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন।"[১]

—কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এই মন্তব্যে কোনো সহৃদয় পাঠক মতান্তর পোষণ করবেন না। আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে 'বিদ্রোহী কবি' হিসাবে নজরুল ইসলামের পরিচিতি সর্বজন বিদিত। তবে তাঁকে শুধুমাত্র 'বিদ্রোহী কবি'র আখ্যায় ভূষিত করলে মতান্তর সৃষ্টি হওয়ায় স্বাভাবিক। কারণ তাঁর কবি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে 'বিদ্রোহ' বিষয়টি তাঁর কিছু কাব্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু তাই বলে সকল কাব্যের বিষয়ই 'বিদ্রোহ' নয়। প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার প্রকাশও তাঁর কোনো কোনো কাব্যের মধ্যে লক্ষ করা যায়। সুশীলকুমার গুপ্ত নজরুলের কাব্যগুলির ভাববস্তু বিচার করে তিনটি সুস্পষ্ট ধারা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'জিঞ্জীর', 'সন্ধ্যা' ও 'প্রলয়-শিখা' কাব্যে দেশপ্রেম, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে কবির বিক্ষোভ, নৈরাশ্য ও হতাশার প্রকাশ ঘটেছে। 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'চক্রবাক'-এ প্রকাশিত হয়েছে কবির মানবিক প্রেম, বাৎসল্য ও প্রকৃতি প্রেম। আর 'চিত্তনামা' ও 'মরু-ভাস্কর' হল জীবনী বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ।

কাজী নজরুল ইসলামের কবি জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রেমমূলক কাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'চক্রবাক' (১৯২৯)। এই কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা—'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি'। কবিতাটি 'কালিকলম' পত্রিকায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে

'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে ও 'সঞ্চিতা' কবিতা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি রচনার পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে শোনা যায়—কবি চট্টগ্রামে হাবীবুল্লাহ বাহার ও সামসুন্নাহারদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য গেলে পূর্ব বাংলার অতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশ কবিকে মুগ্ধ করে। কবি যে ঘরে থাকতেন তার জানালার পাশে পুকুর পাড়ে থাকা সুপারি গাছের সঙ্গে কবির নীরব সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাই আসন্ন বিদায় মুহূর্তে কবি পূর্ব বাংলার মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশের সেই সখ্যতা ভুলতে না পারার জন্যই প্রকৃতি-প্রেম ও হৃদয়াবেগের প্রাবল্যেই 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর হল প্রেম-বিরহ। আলোচ্য কবিতাটিতেও সেই সুরই অনুভূত হয়। এখানে কবি প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়াকে একাকার করে দেখেছেন। তাই এই কবিতায় বিদ্রোহী কবির কোদণ্ড টঙ্কার শোনা যায় না। তার পরিবর্তে—

> "এখানে ওঠে সারেঙ্গীর টুংটাং, গজলের গুনগুনানি; আছে সজল মেঘের ছায়া, কর্ণফুলীর ছলছল ব্যথা, চক্রবাক-চক্রবাকীর মুখর বিরহ।"[২]

'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি যেন 'চক্রবাক' কাব্য গ্রন্থের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা। 'বিদ্রোহী কবি' নজরুল ইসলামের কাব্য সাধনায় প্রেমের কবিতার পরিমাণ বিস্ময় উৎপাদন করে। কিন্তু যাঁরা নজরুলের জীবন সম্পর্কে অবহিত তাঁরা এর স্বাভাবিকতায় সন্দিহান হন না। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'বিদ্রোহী প্রেমিক' হিসাবে কবি নজরুল ইসলামের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন—

> "এখন খুব স্পষ্ট গলায় বলা দরকার যে, বিদ্রোহ তাঁর কবিতার একটি বৃহৎ লক্ষণ বটে, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ নয়। তাঁর কবিতার আর একটি প্রধান উপাদান ভালবাসা। তাঁর মতন এতটা জোরালো রোল তুলে সম্ভবতঃ আর কেউ কখনও বিদ্রোহের দামামা বাজাননি। ঠিক কথা। কিন্তু প্রেমের কথাই বা তাঁর মতন এমন মধুর গলায় আর ক'জন কবি বলতে পেরেছেন? অনেকের ধারণা বিদ্রোহী কিংবা যোদ্ধার গলায় প্রেমের কথা ঠিক মানায় না। খুবই ভুল ধারণা। যোদ্ধারাই সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। পৃথিবীর যাবতীয় মহাকাব্য তার প্রমাণ দেবে।

মাস কয়েক আগেকার কথা। রেডিয়োতে 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' অনুষ্ঠানে নজরুল-গীতি শুনছিলাম। দু'রকমের গানই সেদিন গাওয়া হল। বীরত্বব্যঞ্জক এমন গান, যা শুনলে কাপুরুষের রক্তেও আগুন ধরে যায়। তার পাশাপাশি এমন মিঠে গজল, যা শুনলে বীরপুরুষের চক্ষুও একটি ললিত স্বপ্নের নেশায় আপনা থেকেই বুজে আসে। এই হ'ল নজরুলের ষোল-আনা পরিচয়। আট আনা বিদ্রোহ, আট আনা ভালবাসা।"[৩]

কবি নজরুল ছিলেন যৌবন উচ্ছ্বাসে ভরপুর একজন প্রাণবন্ত মানুষ। তাঁর ব্যক্তিজীবনে বারবার প্রেম এসেছিল। স্বাভাবিক কারণেই কবির সব প্রেমানুভূতি স্বীকৃতির যোগ্য ছিল না। কবির প্রেমাকুতিও সর্বক্ষেত্রে মিলনধন্য হয়নি। বরং বলা যায় নজরুলের প্রেমানুভাবে বিরহ বেদনা চিরলগ্ন ছিল। পরিণামে তাঁর অজস্র কবিতায় ও গানে প্রেমের বিষন্ন বেদনাকে কবি রূপদান করেছিলেন। 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি আপাত দৃষ্টিতে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। কবির সংক্ষিপ্ত প্রবাস জীবনে দীঘল সবুজ সুপারি বৃক্ষরা কবির বাতায়ন পথে নিত্য দৃষ্ট হত। আর সেই চকিত চাউনির মধ্যদিয়ে কবিচেতনায় আন্দোলিত সুপারি বৃক্ষের সারি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবির চোখে এরা পরিয়ে দিয়েছিল মায়া কাজল। প্রবাস জীবনের শেষে এই মিলন মেলা ভাঙবার দিনে কবিচিত্ত বেদনায় টনটন করে উঠেছিল। কবি তাঁর হৃদয়ানুভবকে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলেও মূক তরুর কাছ থেকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পাননি। তাই এক অচরিতার্থ ভালোবাসার বেদনা নিয়ে কবি বিদায় প্রার্থনা করেছেন।

কবিতাটির অন্তরঙ্গ পাঠে অনুভব করা যায় গুবাক তরুর বহিরঙ্গ আচ্ছাদনের অন্তরালে কবির মানবিক প্রিয়া সংগুপ্ত হয়ে আছেন। গুবাক তরুর সারি আর কবির গোপন প্রিয়ার স্মৃতি এই কবিতায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কবির ভাষায়—

"... তোমার শাখার পল্লব-মর্মর
মনে হ'ত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।

তব ঝির্-ঝির্ মির্-মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির সাড়ির আঁচল খানি!
—তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর ছাওয়া!"[৪]

একটু স্পর্ধার প্রকাশ ঘটলেও একথা বলা অন্যায় হবে না যে, প্রেমের কবিতা হিসাবে 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটি সংকীর্ণ অর্থে 'প্রেমবৈচিত্ত্যে'র কবিতা। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে 'প্রেমবৈচিত্ত্যে'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।"[৫]

(উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রঃ ১৫/১৪৭)

অর্থাৎ প্রেমের উৎকর্ষতা বশত প্রিয়ের অতি সন্নিকটে থেকেও বিরহ জনিত কারণে যে আর্তি তাই হল প্রেমবৈচিত্ত্য। আলোচ্য কবিতাটিতেও কবি গুবাক তরু বা গোপন প্রিয়ার নিকটবর্তী থেকেও প্রেমোৎকর্ষতা বশত বিরহ চেতনাতেই আচ্ছন্ন হয়েছেন। তবে 'বৈষ্ণব পদাবলি'র প্রেমবৈচিত্ত্যের সঙ্গে এর তফাতটুকুও লক্ষণীয়। সেখানে পূর্ণ মিলনের মুহূর্তে অনতিক্রম্য বিচ্ছেদ বেদনা জাগ্রত হয় কিন্তু বর্তমান কবিতায় সেই পূর্ণ মিলন অনুপস্থিত। কবির আক্ষেপ—

"জানি —মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপানি!"[৬]

'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতাটির অনন্যতা এইখানে যে বাতায়নবর্তিনী সারিবদ্ধ গুবাক তরুর প্রতি কবির হৃদয়-ভাবনা উৎসারিত হলেও তারই মধ্য দিয়ে কবির এক গোপন নীরব প্রিয়ার উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করা যায়। অথচ সেই একান্ত মানবিক অভিজ্ঞতার স্পর্শে কবির রোমান্টিক প্রকৃতি-প্রেমের জলবিম্বটি ভেঙে যায়নি। ষোলোটি স্তবকে বিধৃত এই কবিতাটির প্রথম স্তবকে কবি তাঁর নিশীথ জাগার সাথীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করেছেন। আসন্ন বিচ্ছেদের বাস্তব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি বলেছেন —

"আজ হ'তে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,

আজ হ'তে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি!..."[৭]

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে আসন্ন বিচ্ছেদের মুহূর্তটি এক অসাধারণ প্রাকৃতিক চিত্রকল্পে রূপময় হয়ে উঠেছে। মিলনের নৈকট্যময় রাত্রির অবসানে চাঁদ যখন পাণ্ডুর অন্ধকারে এলোচুল সংস্কৃত করে দূর বনান্তে প্রায় বিলীন, সে সময় কবি তাঁর বেদনাতপ্ত ললাটে অনুভব করেছেন হৃদয়ের মৃদু ব্যজন। তৃতীয় স্তবকে রাত্রির স্বপ্ন শেষে কবি চোখ মেলে চেয়ে দেখেছেন তাঁর শয্যাপ্রান্তে যেন নিস্পন্দ নয়ন মেলে দাঁড়িয়ে আছে গুবাক তরুর সারি। চতুর্থ স্তবকে কবি গুবাক তরুর শ্রেণিকে তাঁর পীড়িত চিত্তের শুশ্রূষাকারিনী রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে দেখা যায় নিশীথ জাগরণের মুহূর্তে এই গুবাক তরুর সারি যেন তাদের আন্দোলিত পত্রপুঞ্জ নিয়ে কবির বেদনা-বিধুর চিত্তে সুশীতল শুশ্রূষা প্রসারিত করে দিত। বিরহ তাপিত কবিচিত্তে শ্যামলী প্রিয়ার রূপাবয়ব নিয়ে এই গুবাক তরুর শ্রেণি কবিকে নিয়ত সঙ্গদান করত। সপ্তম ও অষ্টম স্তবকে কবি গুবাক তরুর রূপকে তাঁর গোপন প্রেম হতাশাকেই বুঝি ভাষারূপ দিয়েছেন। কবির বক্তব্য— গভীর প্রীতিবশত কবি বারবার তাঁর চিত্তের শুশ্রূষাকারিনীর দিকে, তাঁর নিশীথ রাত্রির জাগরণের সাথীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু সেই হাত কেউ ধরেনি। অর্গলিত বাতায়নে ঠেকে তা বারবার ফিরে এসেছে। আমরা অনুমান করতে পারি এই রুদ্ধ বাতায়ন আসলে সমাজ শাসনের প্রতীক। আমাদের সমাজে মানবিক আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ শাসনে প্রতিহত হয়। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনে যে গোপন প্রেমিকার অশরীরী স্পর্শ দেহ-মনে নিয়ত অনুভব করেছেন সেই গোপন প্রিয়ার কাছ থেকে উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। সামাজিকতার নানা বাধা দুজনেরই হৃদয়ের ভাব বিনিময়ের বাতায়ন পথকে রুদ্ধ করেছে। এই অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা নিয়ে সমাগত বিদায় লগ্নে কবির মনে আকুতি জেগেছে। তাইতো কবিতাটির নবম স্তবকের প্রথমেই কবি বলেছেন —

"— আজি বিদায়ের আগে
আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে!
মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন!"[৮]

কবির হৃদয়ে এই মিলনাবেগ উচ্ছলিত হয়ে উঠলেও কবি তাঁর জীবনের অদৃষ্ট ললাট লিপি পাঠ করে জেনে নিয়েছেন তাঁর গোপন প্রেমিকার সাথে কোনোদিনই মুখে মুখে জানাজানি সম্ভব হবে না। তাঁর জীবনের অনিবার্য বিধিলিপি —

"বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি!"[৯]

কবিতাটির দশম স্তবকে একটু ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয়। কবির স্বীকারোক্তিতে ধরা পড়ে কবি তাঁর গোপন প্রেমিকাকে 'যাহা নও তাই ক'রে' হৃদয় ভরে অনুভব করেছেন। এই মুহূর্তে কবির একমুখীন আবেগ যেন ধরা পড়েছে। গোপন প্রেমিকার উপযুক্ত সঙ্গ না পেয়ে প্রেমিক কবি মনে মনে প্রেমের অমরাবতী রচনা করে তৃপ্ত হতে চেয়েছেন। বাস্তব জীবনে স্বেদ বিগলিত বাহুবন্ধনে প্রেমিকাকে কাছে না পেলেও কবি তাঁর হৃদয় ভাবনার অমরলোকে গোপন প্রেয়সীকে চির অক্ষয় করে পেতে চেয়েছেন। তাই কবির ঘোষণা —

"তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী!..."[১০]

পরবর্তী দুটি স্তবকে কবির গোপন প্রিয়ার স্বরূপটি গুবাক তরুর রূপকল্পে প্রকাশিত হয়েছে। তরু ও বিহঙ্গের সম্পর্ক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কবি এই কথা ঘোষণা করতে চেয়েছেন যে, ইতিপূর্বের প্রেম-অভিজ্ঞতাহীন প্রেমিকার হৃদয়প্রান্তে তিনি তাঁর প্রথম প্রণয় লেখাটি রচনা করতে পেরেই ধন্য হয়েছেন—

"তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক্ সান্ত্বনা মোর, হোক্ বা না হোক্ দেখা।..."[১১]

দূর থেকে ভালোবেসে জীবনের প্রথম প্রণয় নিবেদন করে কবি কৃতার্থ হতে চেয়েছেন। এই প্রেম মিলনধন্য হয়নি বলে কবি কিন্তু ভেঙে পড়েননি। তিনি বিরহানন্দে মগ্ন হতে চেয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন মিলনহীন এই প্রেমের স্মৃতি তাঁর চিত্তাকাশে দগ্ধ ধূপ গন্ধের মতো নিয়ত বিরাজমান হয়ে থাকবে।

কবিতাটির ত্রয়োদশ স্তবকে কবির প্রেমাবেগের ইতিহাস স্পষ্টতা পেয়েছে। কারণ এখানে কবি গুবাক তরুর রূপকে তাঁর গোপন প্রিয়ার কাছে এই বেদনাস্নিগ্ধ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছেন —

"...তুমিও কি অনুরাগে
দেখেছ আমারে —দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়ন খুলি'?
হাওয়ায় না মোর অনুরাগে তব পাতা উঠিয়াছে দুলি',? "[১২]

অনুভব করা যায় আলোচ্য কবিতায় যে কবিপ্রিয়ার সাক্ষাৎ আভাসে ইঙ্গিতে মেলে সে কবিপ্রিয়ার সঙ্গে কবির দেওয়া নেওয়ার সেতুটি কোনোদিনই রচিত হয়নি। একমুখীন আবেগ নিয়ে সেই নারীর নানা ব্যবহারে কবি খুঁজে পেয়েছেন প্রেমের চকিত প্রকাশ। স্বাভাবিকভাবেই কবির অতৃপ্ত মন বিদায়ের ক্ষণে হলেও প্রিয়তমার প্রেমের স্বীকৃতি পেতে চেয়েছে।

কবিতাটির চতুর্দশ স্তবকে কবি ভাবনার পরিবর্তন লক্ষণীয়। ক্ষণিকের অতিথির বিদায় শেষে গুবাক তরুর স্মৃতিচারণের রূপকল্পে কবি তাঁর দূরবর্তিনী প্রেমিকার কাছে এক অস্ফুট আবেদন রচনা করেছেন— যেদিন আকাশের চাঁদ ঝরে পড়বে গাছের পাতায় পাতায়, আলোর উৎস জাগবে বিশ্ব ভুবনে; সেদিন কি এই বন্ধ বাতায়নশূন্য কক্ষটির দিকে চেরে গুবাক তরুর স্মৃতি উদ্বেলিত হবে? বিস্বাদ হয়ে যাবে কি আলোক চন্দ্রিমা? একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আসলে কবি তাঁর প্রেমিকা নারীর উৎসব মুখরিত দিনেও তাঁর স্মৃতিপটে সংকীর্ণ উপস্থিতি কামনা করেছেন। আর এর মধ্যদিয়ে ব্যক্ত হয়েছে মানবের চিরন্তন আকুতি এবং অমরতার আকাঙ্ক্ষা। এই অমরতার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মানুষ শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন; রচনা করেন স্মৃতিস্তম্ভ। কবিও তাই তাঁর নীরব উদাসীন প্রেমিকার সঙ্গে মুখে মুখে কথা কইতে না পারার বেদনাকে ভুলে যেতে চেয়েছেন ক্ষণিক স্মৃতির সুনিশ্চিত আশ্বাসে।

কবিতাটির পরবর্তী স্তবকে কবির বক্তব্য থেকে আমরা সুসংগতভাবে মনে করতে পারি কবির গোপন প্রেমিকা তাঁর বাস্তব জীবনে সুখ সৌভাগ্যের অধিকারিনী ছিলেন না। কবি তাই বেদনা রক্তিম কণ্ঠে বলেছেন —

"তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু ব্যথা না হানে,
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে!"[১৩]

কবিতাটির অন্তিম স্তবকে প্রেমের প্রতিদান না পাওয়ার বেদনায় কবির মনের অভিমান ঝলসিত হয়েছে। কবি তাঁর অচরিতার্থ প্রেমের গোপন নায়িকাকে উদ্দেশ্য করে অভিমানে ক্ষুব্ধ এই বাণী উচ্চারণ করেছেন —

"ভুল ক'রে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি' "[১৪]

কিংবা

"খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে—মাটিতে পেলে না যাকে!"[১৫]

আলোচ্য কবিতাটি নজরুল ইসলামের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই অনবদ্যতার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, কবিতাটির মধ্যে ভাব প্রকাশের শৃঙ্খলা ও রূপ রচনায় কবির শিল্পী সুলভ স্থৈর্য অবশ্য অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার যে বেণীটি কবি রচনা করেছেন তা আদ্যন্ত সুসংবদ্ধ; প্রেম ও প্রকৃতি কোথাও স্বেচ্ছাচারী হয়ে একে অপরকে গৌণ বা শিথিল করে দেয়নি। তৃতীয়ত, কবিতাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগের যে আন্দোলন অনুভব করা যায় তা মাত্রাবৃত্তের নাতিদীর্ঘ পর্ব, নাতিমন্থর লয়ে চমৎকার ভাষারূপ পেয়েছে। কবিতাটির মূল বৈশিষ্ট্য প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার সমন্বয়। এখানে বাচ্য হল প্রকৃতি প্রীতি আর ব্যঞ্জনা হল মানবিক প্রেম। কবি নজরুল ইসলাম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর গোপন প্রেমিকার শরীরী রূপ, স্বভাব-প্রকৃতি ও প্রণয় বৈশিষ্ট্যকে রূপায়িত করেছেন। কবির গোপন প্রিয়া কবি চিত্তে কতটা স্থান লাভ করেছিলেন তা একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রকল্পে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে —

"জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!"[১৬]

কবির প্রেমিকা যে এক অনাঘ্রাতা কুসুম; তাঁর জীবনে যে এখনও কোনো অতিথির পদসঞ্চার ঘটেনি তা কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন অতি চমৎকার চিত্রকল্পের মাধ্যমে। চিত্রকল্পটি পরিপূর্ণভাবে প্রাকৃতিক অথচ এর অন্তরাল থেকে মানবিক প্রেমের ইতিহাস সুস্পষ্ট ভাবে অনুভূত হয় —

"হয়ত তোমার শাখায় কখনো বসেনি আসিয়া শাখী,
তোমার কুঞ্জে পত্রকুঞ্জে কোকিল ওঠেনি ডাকি'।
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন

জেগেছে নিশীথে জাগে নি ক' সাথে খুলি' কেহ বাতায়ন।
—সব আগে আমি আসি'
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথ, গিয়াছি গো ভালবাসি'!
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক্ সান্ত্বনা মোর, হোক্ বা না হোক্ দেখা।....."[১৭]

বলা বাহুল্য প্রাকৃতিক চিত্রকল্প রচনায় কবির কৃতিত্ব যেমন ধরা পড়েছে ঠিক তেমনি এর অন্তরাল থেকে ব্যঞ্জিত হয়েছে এক নারীর জীবন ইতিহাস। ষোলোটি স্তবকে নির্মিত কবিতাটি প্রাকৃতিক চিত্রকল্পে ও প্রেমের ব্যঞ্জনায় অসাধারণ রূপে সার্থক। কবি সমগ্র কবিতাটির মধ্যে গুবাক তরুকে লক্ষ করে অচরিতার্থ প্রেমের যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার মৃদু সৌরভ পাঠকের অন্তরাকাশকে ভরিয়ে রাখে। এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে কবির অনুভূতির গাঢ়তায় ও সরল প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ নির্ভর প্রকাশ ভঙ্গিমার কারণে। কবিতাটি পাঠ করলে অতি সহজে অনুভব করা যায় এই কবিতাটি আসলে এক অকপট সরল প্রেমিক হৃদয়ের ব্যর্থ প্রেমের বিধিলিপি। কবিতাটি 'চক্রবাক' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত একটি কবিতা। চক্রবাক দম্পতি কিংবদন্তি প্রসিদ্ধ চিরবিরহী পক্ষী যুগল। আলোচ্য কবিতাতেও এই চিরবিরহের বার্তায় ব্যক্ত হয়েছে। কবি যাকে স্বপ্নে নিশীথ জাগার সাথী হিসাবে পেয়েছেন সে কখনও এই বাস্তব মাটির বুকে 'মুখে মুখে' তাঁর হৃদয়ের কথা কবিকে জানায়নি। এক অনতিক্রম্য বিচ্ছেদ বেদনায় কবির সংকীর্ণ মিলন উৎসব ম্লান হয়ে গেছে। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা প্রেমিকার নৈকট্য লাভের দিনগুলিকেও বিষে নীল করে দিয়েছে। তবুও নীলকণ্ঠ কবি দগ্ধ ধূপের মত পুড়ে পুড়েও আপন আন্তরিক প্রেমানুভবের সৌরভে ভরে দিতে চেয়েছেন প্রেমিকার চিত্তাকাশ; রচনা করতে চেয়েছেন বিরহানন্দের অমরাবতী। সুতরাং প্রাকৃতিক চিত্রকল্পকে আশ্রয় করে ব্যক্তিগত প্রেম-বিরহকে নিখিল মানবের প্রেম-বিরহে রূপান্তরিত করার মধ্যেই কবিতাটির কাব্য সৌন্দর্য অনুভব করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. দে, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত), 'নজরুল স্মৃতি', সাহিত্যম, কলিকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ: ১৬ ই মে ১৯৮৭, পৃ. ৩
২. গুপ্ত, সুশীলকুমার, 'নজরুল-চরিত মানস', ভারতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৬৭, পৃ. ১১১
৩. দে, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত), 'নজরুল স্মৃতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
৪. ইসলাম, নজরুল, 'সঞ্চিতা', ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা-৭০০০০৬, অষ্টসপ্ততিতম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ২১৩-২১৪
৫. ভট্টাচার্য, দেবিদাস, 'বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস', করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ১৯৭৪, পৃ. ৩৪৪
৬. ইসলাম, নজরুল, 'সঞ্চিতা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪
৭. তদেব, পৃ. ২১৩
৮. তদেব, পৃ. ২১৪
৯. তদেব, পৃ. ২১৪
১০. তদেব, পৃ. ২১৪
১১. তদেব, পৃ. ২১৫
১২. তদেব, পৃ. ২১৫
১৩. তদেব, পৃ. ২১৬
১৪. তদেব, পৃ. ২১৬
১৫. তদেব, পৃ. ২১৬
১৬. তদেব, পৃ. ২১৩
১৭. তদেব, পৃ. ২১৪-২১৫

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 340-351
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.024

হুমায়ূন আহমেদের ‘মিসির আলি! আপনি কোথায়?’ উপন্যাসের মনঃসমীক্ষণাত্মক সমালোচনা

ড. প্রসেনজিৎ দাস, *স্নাতক শিক্ষক, পালাটানা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উদয়পুর, গোমতী, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 15.10.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Humayun Ahmed, a prominent figure in the literary, cultural, and artistic landscape of Bangladesh, is renowned as a novelist, short story writer, essayist, playwright, filmmaker, and professor. His popularity has soared in the Bangladeshi literary world since the 1970s. One of his most celebrated novel series is 'Misir Ali'. A popular novel from this series is 'Misir Ali! Apni Kothay?'. The protagonist, Misir Ali, is a psychology professor and psychiatrist. People approach him with various problems. Misir Ali is highly trusted for his psychological counseling.

Faruk, one of Misir Ali's students, approaches him with a complex issue. He believes his wife, Ayna, occasionally disappears into mirrors. Seeking a solution to this problem, Faruk turns to his beloved professor, Misir Ali. Faruk is convinced that only Misir Ali can unravel the mystery surrounding his wife. Through psychological examinations of Faruk and Ayna, Misir Ali resolves the issue. According to Misir Ali's analysis, the entire incident is a figment of Faruk's imagination. As a psychology student, Faruk is

aware of the concept of 'delusion'. His wife, Ayna, has aided him in this delusion. Moreover, Faruk's wife's name is also Ayna, and he has a particular fascination with her. Considering all these factors, Faruk has delved into the world of delusion.
Novelist Humayun Ahmed, in 'Misir Ali! Apni Kothay?', introduces a fictional scenario and provides a thorough analysis of it. The author presents each event through a subtle psychological analysis.

Keywords: Psychology, Parapsychology, Telepathy, Psychoanalysis, Hypothesis, Reality, Delusion.

বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যের জগতে হুমায়ুন আহমেদ একটি জনপ্রিয় তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং অধ্যাপক। তবে উপন্যাসের প্রতিই তিনি অধিক দায়বদ্ধ ছিলেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা দুই শতাধিক। লিখেছেন বহু জনপ্রিয় উপন্যাস সিরিজ 'শুভ্র', 'মিসির আলি', 'হিমু' প্রভৃতি।

কথাকার হুমায়ুন আহমেদের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস সিরিজ 'মিসির আলি'। এই উপন্যাস সিরিজের মিসির আলি চরিত্রটিকে নিয়ে তিনি লিখেছেন ২২টি উপন্যাস। 'মিসির আলি' সিরিজের প্রতিটি উপন্যাসে পাত্র পাত্রী ও ঘটনার মানসিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের প্রাধান্য রয়েছে।

'মিসির আলি' সিরিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'মিসির আলি! আপনি কোথায়?'। গভীর মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে হুমায়ুন আহমেদ আলি চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসে মিসির আলিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন মনোবিজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও মনোসমীক্ষকের ভূমিকায়।

মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাঁর অপরিসীম খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। তারা মনে করে "মিসির আলি স্যার এমন একজন পূণ্যবান ব্যক্তি যার কাছাকাছি বসে থাকলেও পূণ্য হয়।" [১]

মিসির আলির চিন্তা করার ধারা এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিন্যাস তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। এসকল গুণাবলীর কথা ছেড়ে দিলেও মানুষ হিসাবে মিসির আলির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। মিসির আলিও ছাত্রছাত্রীদের অকৃত্রিম স্নেহ করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেন। যেমন, মিসির আলি একদিন ক্লাসে গিয়ে বলেছিলেন-

'আমি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তার চিন্তা করার ক্ষমতার ভেতর একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করেছি। তোমরা হচ্ছ আমার প্রথম সাবজেক্ট। তোমরা সবাই তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করবে এবং বোর্ডে লেখা পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেবে।

১. রাতে বাতি নিভিয়ে ঘুমাও না বাতি জ্বালিয়ে ঘুমুতে যাও?
২. উচ্চতা ভীতি কি আছে?
৩. দিঘির পানির কাছে গেলে কি পানিতে নামতে ইচ্ছা করে?
৪. আগুন ভয় পাও?
৫. পরিচিত কোন ফুল পেলে কি গন্ধ শুঁকে দেখ?'[২]

ছাত্রছাত্রীরা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিল। মিসির আলি এর মধ্য দিয়ে মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে ক্লাসের তিনজন হাত দরিদ্র ছাত্রকে খুঁজে বের করেছিলেন যাদের ইউনিভার্সিটির পড়ার খরচ তাঁকে যোগাতে হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা মিসির আলির গভীর মনঃবিশ্লেষণ ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাই।

মিসির আলি একজন সাইকোলজির অধ্যাপক এবং একজন মনঃসমীক্ষক হলেও প্যারা-সাইকোলজি এবং প্যারা নর্মাল জগৎ সম্পর্কে অপরিসীম আগ্রহ ও কৌতূহল রয়েছে। তাই সারা জীবন ধরে তিনি অতিপ্রাকৃতের সন্ধান করেছেন এবং অবিশ্বাস্য সব ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ছাত্রদের তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন লজিক ব্যবহারে।

আমার এই নর্মাল ভূবনে প্রতিনিয়ত বহু প্যারা-নর্মাল ঘটনা ঘটে চলেছে, বিজ্ঞানীদের কাছে যার কোন ব্যাখ্যা নেই। টেলিপ্যাথি এমনি একটি বিষয় যার কোন সহজ বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় না। আলোচ্য উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয় যে ফারুকের স্ত্রী আয়না প্যারা নর্মাল মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন

এক নারী। সে টেলিপ্যাথির মাধ্যমে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম । এই উপন্যাসে আয়নার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার প্রথম পরিচয় পাই প্রথম পরিচ্ছদে। সে তার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার মাধ্যমে মিসির আলিকে কবিতা শুনিয়েছে। এছাড়া উপন্যাসে দেখা গেছে পাঁচটি খুনের মামলার সঙ্গে জড়িত মুকসেদ ফারুকদের পাশের ফ্ল্যাটের বাংলার প্রফেসার সাহেবের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল একথা আয়না ফারুককে জানালেও ফারুক গুরুত্ব দেয়নি। ভেবেছিল সবই আয়নার কল্পনা। তখন আয়না তার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুলিশকে মুকসেদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। পুলিশ সাহেবের কথায় জানা যায়-

'শরীর খারাপ লাগছিল। আমি থানা থেকে দুপুরবেলা বাসায় গেলাম। খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎ স্বপ্নে দেখি অতি অপরূপা এক মেয়ে আমাকে বলেছে ওসি সাহেব! ঘুম থেকে উঠুন। ভয়ংকর খুনি কামাল কোথায় আছে আমি জানি। এই হল ঠিকানা। সে ঠিকানা বলল। একবার না কয়েকবার। আমার ঘুম ভাঙল। ইউনিফর্ম পরলাম। আমি পুলিশ নিয়ে ফ্ল্যাট ঘেরাও করলাম। হারামজাদাটাকে পেয়ে গেলাম।'[৩]

লেখক হুমায়ুন আহমেদ একজন অতিযুক্তিনিষ্ঠ মানুষ এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন প্যারানর্মাল জগতে সাইকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ জন্মে। তাঁর এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপন্যাসে বাস্তব জগৎ থেকে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন রাশিয়ার এস রেলায়েন্ড নামের একজন শৌখিন চিত্রকর পদার্থবিদের সামনে তিন মিনিট গ্রেভিটেসনে ছিলেন। মেঝে থেকে এক ফুট উঁচুতে ভেসে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। সায়েন্টিস্টরা কিছুই ধরতে পারেনি। ইসরায়েলের যুরি গেলাষর নামক এক ব্যক্তি দৃষ্টিতে চামচ বাঁকা করতে পারতেন। যদিও ম্যাজিশিয়ানরা দাবি করেছিল যে সেখানে কিছু ম্যাজিকের কৌশল ছিল। বিবিসি টেলিভিশনে তাঁর চামচ বাঁকানো দেখানো হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সায়েনটিস্ট ও ম্যাজিশিয়ানরাও, কিন্তু কেউই কিছু ধরতে পারেনি।

মূলত হুমায়ুন আহমেদ আমাদের চারপাশের নর্মাল ভুবনের পাশে অতিলৌকিক প্যারা নর্মাল ভুবনকেও এই উপন্যাসে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং

তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি বাস্তব জগতের কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন।

মিসির আলি চরিত্রের মূল দিক হল লজিক ব্যবহার করে মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবন জটিলতার সহজসূত্র নির্দেশ। মিসির আলির ভাষায়- "অন্ধকারে ঢিল ছোড়া আমার স্টাইল না। আমি লজিক ব্যবহার করি। লজিক পাশাখেলা না। লজিক অন্ধকারে ঢিল ছোড়ে না।"[৪]

মনোবিজ্ঞানী Sigmund Freud সম্মোহন পক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চিকিৎসার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। তিনি দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করে এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। প্রথমত, রোগীকে সম্মোহিত করে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় ধারণাগুলো সঞ্চারিত করা। দ্বিতীয়ত, রোগীকে সম্মোহিত করে তার রুদ্ধ আবেগের মুক্তি দেওয়া।প্রথম পদ্ধতির নাম 'সম্মোহন পদ্ধতি' (Hiponotic Method) এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি হল 'বিরেচন পদ্ধতি' (Carthartic Method)

হুমায়ুন আহমেদ 'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছেন মিসির আলির মধ্য দিয়ে। উপন্যাসে দেখা যায় তরিকুল ইসলাম আকস্মিক ভাবে কুকুর ভীতিতে কাবু হয়ে গেলে মিসির আলি তার চিকিৎসা করেছেন-

"মিসির আলির হাতে পকেট ঘড়ির চেইন। চেইনের মাথায় ঘড়ি। তিনি ঘড়িটা পেন্ডুলামের মতো সামান্য দুলাচ্ছেন। তাদের বাঁ দিকে খাটের উপর আয়না বসে আছে। আয়নার চোখে তীব্র কৌতূহল। আয়নার পাশেই তার মা। ঘোমটা টেনে তিনি নিজেকে আড়াল করেছেন। মহিলা কিছুটা ভয় পাচ্ছেন। তিনি এক হাতে মেয়েকে শক্ত করে ধরে আছেন।

মিসির আলি বললেন, হেডমাস্টার সাহেব!

জ্বি।

আপনি সারারাত ঘুমান নি এখন আপনার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে।

জ্বি।

আপনি কল্পনা করুন নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে গেছেন। জায়গাটা ফাঁকা। গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই। জায়গাটা কি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন।

তরিকুল ইসলাম চোখ বন্ধ করে গাঢ় স্বরে বললে, দেখতে পাচ্ছি।

জায়গাটা কেমন একটু বলুন তো?

সুন্দর। খুব সুন্দর। ফুলের বাগান আছে।

ঠান্ডা বাতাস কি বইছে?

জ্বি।

ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছেন না?

পাচ্ছি।

একটা পুরানো কাঠের বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন?

হুঁ।

দোতলা বাড়ি না?

জ্বি।

খুঁজে দেখুন দোতালায় উঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটা বের করুন।

আচ্ছা।

সিড়ি খুঁজে বের করে আমাকে বলুন। সিঁড়ি পেয়েছেন?

পেয়েছি।

এখন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করুন। এক একটা ধাপ উঠবেন আর আপনার চোখ গাঢ় হতে থাকবে। সপ্তম ধাপে উঠে গভীর ঘুমে আপনি তলিয়ে যাবেন। উঠতে শুরু করুন। প্রথম ধাপ উঠেছেন?

জ্বি উঠেছি।

দ্বিতীয় ধাপ?

হুঁ।

ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

তৃতীয়।

হুঁ।

আপনার শরীর ভারী হয়ে গেছে। আপনার পা তুলতেও কষ্ট হচ্ছে চতুর্থ ধাপ। উঠেছেন?

হুঁ।

চতুর্থ, পঞ্চম এখন সপ্তম ধাপ উঠবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনি পা দিয়েছেন সপ্তম ধাপে।

তরিকুল ইসলাম বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসেছে। আয়না আপলক তাকিয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, তরিকুল ইসলাম সাহেব।

জ্বি।

ঘুমাচ্ছেন?

জ্বি।

আপনার কেমন লাগছে?

ভালো।

আমি দু'বার হাত তালি দেব। তালির শব্দে আপনার ঘুম ভাঙবে। ঘুম ভাঙার পর আপনি কুকুর ভয় পাবেন না। কুকুর ভীতি আপনার পুরোপুরি দূর হবে।

মিসির আলি দু'বার হাত তালি দিলেন। তরিকুল ইসলাম চোখ মেললেন। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। আয়না বলল, বাবা কুকুরের ভয়টা কি গেছে?

তরিকুল ইসলাম বললেন, কুকুরের কিসের ভয়?"[৫]

এইভাবে হিপ্নোটিক সাজেশনের মধ্য দিয়ে মিসির আলি তরিকুল ইসলামের কুকুর ভীতি দূর করেছেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে মানসিক রোগীর মন থেকে রোগের লক্ষণটি দূর করা সম্ভব। তবে লেখক বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে-

"এই বইয়ে লেখা হিপ্নোটিক সাজেশনের পদ্ধতিটি কেউ ব্যবহার করতে চাইলে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। Trance state -এ চলে যাওয়া কাউকে ভুল সাজেশন দেওয়া ঠিক না। এতে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।"[৬]

'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসের মূল রহস্যটি ঘনিয়ে উঠেছে মিসির আলির ছাত্র ফারুকের স্ত্রী আয়নাকে নিয়ে। ফারুকের স্ত্রী আয়না মাঝে মাঝে আয়নার ভেতরে ঢুকে যায় এই রহস্যের সন্ধানে ফারুক তার প্রিয় অধ্যাপক মিসির আলির সাহায্য প্রার্থনা করেছে। মিসির আলির প্রতি ফারুকের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং অগাধ বিশ্বাস। মিসির আলির মনোবিশ্লেষণ তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে আসছে ছাত্র জীবন থেকে। তাই নিজের জীবনের রহস্য অনুসন্ধানে ব্যর্থ হতে প্রিয় শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়েছে। কারণ, "মিসির আলি স্যার আমার (ফারুক) কাছে অতিমানব।"[৭] ফারুকের বিশ্বাস একমাত্র তিনিই পারেন তার স্ত্রীর রহস্যের সমাধানসূত্র নির্দেশ করতে।

মিসির আলি ছাত্র ফারুকের চিঠি পেয়ে নেত্রকোনা জেলার কইলাটি গ্রামে ফারুকের শ্বশুড় তরিকুল ইসলামের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। তরিকুল ইসলাম জামাইয়ের শিক্ষক মিসির আলিকে এতটাই আদর যত্ন দিয়ে ভরিয়ে দিলেন যে, "আদরকে কেউ অত্যাচারে পরিণত করতে পারে মিসির আলির সেই অভিজ্ঞতা ছিল না।"[৮]

শহুরে জীবনে অভ্যস্ত মিসির আলি ঢাকা থেকে কইলাটি গ্রামে এসে অল্প সময়ের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেন। তাছাড়া রহস্যের খুঁজে এসে দুদিন পরেও কোন রহস্যের সন্ধান পাননি। তৃতীয় দিন আয়নাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর কাছে "মেয়েটিকে এই পৃথিবীর বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে অন্য কোনো ভূবনের। পৃথিবীর কোন মেয়ে এত রূপ নিয়ে জন্মায় না।"[৯]

এখানে মিসির আলি একজন মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও প্যারা নর্মাল ভূবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর আয়নাকে দ্বিতীয় দর্শনে তাকে সাধারণ মেয়ের মতই মনে হয়েছে। তিনি এর একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন আয়না অস্বাভাবিক মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন নারী। অন্যের ব্রেইনে প্রভাব ঘটানোর মত মানসিক ক্ষমতা তার রয়েছে। এজন্য ব্রেইনের ইলেক্ট্রিকেল সিগন্যাল প্রভাবিত করে সে কখনো কখনো নিজেকে সুন্দর হিসাবে উপস্থাপন করে।

আয়না মাঝে মধ্যেই একনাগাড়ে দু-তিন দিন দরজা বন্ধ করে থাকে। সেই সময় তার খাওয়া দাওয়া বন্ধ থাকে এমনকি জল পর্যন্ত খায় না। তার পর খুব

স্বাভাবিক ভাবেই দরজা খুলে বের হয়ে আসে। তরিকুল ইসলামের কাছে একথা শুনে মিসির আলি প্রথম যে ধারণাটি করেছেন তা হল আয়না তরিকুল ইসলামের পালিতা কন্যা। কারণ, তিনদিন ধরে দরজা বন্ধ করে থাকা সত্ত্বেও তরিকুল ইসলাম কিংবা তার স্ত্রীর মধ্যে কোনো অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়নি। তারা দুজনেই অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত। সম্ভাব্য দুটি দিক নিয়েই চিন্তা করেছেন প্রথমত, মাতাপিতা হয়তো মেয়ের পাগলামি দেখে অভ্যস্ত। দ্বিতীয়ত, কোন মা-বাবাই সন্তানের পাগলামি দেখে অভ্যন্ত হতে পারে না। সন্তানের অস্বাভাবিকতা তাদের চঞ্চল করে তুলবেই। এইভাবে প্রতিটি ঘটনাকে যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করে মিসির আলি একটি সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হন।

ফারুকের স্ত্রী আয়না আয়নার ভিতরে ঢুকে যাওয়ার অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে, এই রহস্যের সমাধানে মিসির আলি প্রথমে তিনটি হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছেন। প্রথমত: তিনি মেনে নিয়েছেন যে আয়নার ভিতরে ঢুকার অস্বাভাবিক ক্ষমতা তার রয়েছে। তা মেনে নেওয়ার ভিত্তি হল আয়নার স্বীকারোক্তি এবং ফারুকের বক্তব্য, কিন্তু বিজ্ঞান এই হাপপোথিসিসকে গ্রহণ করবে না। কারণ, আয়না একখন্ড কাঁচের টুকরো যার পেছনে প্রলেপ লাগানো থাকে। এর ভেতরে মানুষের ঢুকা সম্ভব নয়। মিসির আলি নিজে তা মেনে নিলেও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে তা অগ্রাহ্য করবে। তার পরেও এই হাইপোথিসিস দাঁড় করানোর কারন হল ভুলের ভেতর দিয়ে অনেক সময় শুদ্ধকে খুঁজে পাওয়া যায়।

মিসির আলির দ্বিতীয় হাইপোথিসিস হল, আয়নার ভেতরে কেউ কখনো ঢুকেনি, সুতরাং সেও ঢুকতে পারে না। তবে এক রিয়েলিটি (reality) থেকে অন্য রিয়েলিটিতে (reality) যেতে আয়না লাগে না। মানুষ বিছানায় ঘুমিয়েও রিয়েলিটি পরিবর্তন করতে পারে। আয়না মেয়েটির ক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারে। এটি মনোবিজ্ঞান সম্মত হাইপোথিসিস।

মিসির আলির তৃতীয় হাইপোথিসিস অনুযায়ী সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই আয়নার স্বামী ফারুকের কল্পনা। ফারুক সাইকোলজির ছাত্র। সুতরাং ডিলিউসন (Delusion) এর বিষয়টি সে জানে। তার স্ত্রী আয়না তাকে ডিলিউসন

(Delusion) এ সাহায্য করেছে। তাছাড়া ফারুকের স্ত্রীর নামও আয়না এবং আয়নার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে ফারুক ডিলিউসন (Delusion) এর জগতে চলে গেছে।

মূল সিদ্ধান্তে পৌছানোর পূর্বে মিসির আলি ফারুক এবং আয়নাকে হিপ্নোটিক সাজেশনের মাধ্যমে তাদের সমস্যার প্রকৃত সমাধানসূত্র নির্দেশ করতে চান। একজন অভিজ্ঞ মনোসমীক্ষকের ন্যায় মিসির আলি তাদের হিপ্নোটিক সাজেশন দিয়েছেন এভাবে:

"এখন তাকাও আমার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি আয়না জগতে ঢুকে যাবে। সেই জগৎ

গুটি পাকিয়ে আয়নার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

আয়না এই বলটা হাতের মুঠির মধ্যে নাও। এখন তুমি যাত্রা শুরু করেছ আয়না জগতের দিকে। তোমার জন্য আনন্দময়। সেখানে ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ছায়া ছায়া অস্পষ্ট জগৎ। তুমি কি তৈরি?

জ্বি।

আয়না জগতে ঢুকে যাবার পর তোমাকে আমি প্রশ্ন করব তুমি উত্তর দেবে।...

আচ্ছা।

মিসির আলি কাগজ কলম হাতে নিলেন। কাগজে লিখলেন নদী, পাখি, ফুল। কাগজটা বলের মতো জগৎটা মাটির নিচে। সিঁড়ি বানানো আছে। একেকটা সিঁড়ি পার হবে আর আয়না জগতের কাছাকাছি যেতে থাকবে, তোমার এখন ঘুম পাচ্ছে, আয়না ঘুম পাচ্ছে?

পাচ্ছে।

প্রথম সিঁড়ি পার হলে। এই দ্বিতীয় সিঁড়ি। আয়না ঘুম পেলে চোখ বন্ধ করে ফেল। তুমি তৃতীয় সিঁড়ি পার হয়েছ। এখন পার হলে চতুর্থ সিঁড়ি। আর একটা ধাপ শুধু বাকি। এই ধাপটা পার হলেই তুমি আয়না জগতে। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

অস্পষ্ট।

আয়না বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে। সামান্য দুলছে। ফারুক নিজেও বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে। সেও দুলছে। মিসির আলি নিশ্চিত আয়না জগতে আয়না একা ঢুকবে না। ফারুক নিজেও ঢুকে যাবে।

আয়না?

হুঁ।

এখন শেষ ধাপ পার হও। আয়না জগতে ঢুকে যাও। আয়না দুলুনি বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল মিসির আলি ফারুকের দিকে তাকালেন সেও মূর্তির মতো স্থির।"[১০]

মিসির আলি ফারুক ও আয়নাকে হিপ্নোটিজমের মধ্য দিয়ে আমাদের নরমাল ভূবন থেকে নিয়ে গেছেন প্যারানরমাল ভূবনে। তিনি সাইকলজির পদ্ধতি ব্যবহার করে খুঁজে পেতে চেয়েছেন প্যারাসাইকোলজিক রহস্যের সমাধান।

মিসির আলি হিপ্নোটিক সাজেশনের মধ্য দিয়ে ফারুক ও আয়নাকে পরাবাস্তব জগৎ থেকে যখন পুনরায় বাস্তবে ফিরিয়ে আনলেন দেখা গেল আয়নার হাতে কাগজে লেখা নদী, ফুল, পাখি শব্দগুলি Mirror Image হয়ে গেছে। যার উপর ভিত্তি করে তিনি বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে, ফারুক ও আয়না সত্যিই আয়নার জগতে যাতায়াত করে। তাদের প্রতি মিসির আলির উপদেশ-

"প্রকৃতি একই ধরণের দুজনকে কাছাকাছি এনেছে। তার নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। তোমরা আলাদা হয়ো না। তার জন্য তোমাদের যদি পুরোপুরি আয়না জগতে স্থায়ী হতে হয় হবে। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই। Good luck."[১১]

মিসির আলি আয়না জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানেন না। একজন মনোসমীক্ষক হিসাবে তিনি শুধু আমাদের নরমাল ভুবন সম্পর্কেই ধারণা করতে পারেন, প্যারা নরম্যাল জগৎ সম্পর্কে কোন ধারনা করতে পারে না। তাই আয়না ও ফারুকের রহস্যেরও কোন সমাধান তিনি দিতে পারেননি।

ঔপন্যাসিক 'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসে একটি কাল্পনিক ঘটনার অবতারণা করে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসে প্রতিটি

ঘটনাকে লেখক সূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. আহমেদ হুমায়ুন, মিসির আলি সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৮০।
২. তদেব, পৃ. ৭৯।
৩. তদেব, পৃ. ৬৪, ৬৫।
৪. তদেব, পৃ. ৭৪।
৫. তদেব, পৃ. ৫১, ৫২।
৬. তদেব, পৃ. ৫৩।
৭. তদেব, পৃ. ৮৪।
৮. তদেব, পৃ. ১৫।
৯. তদেব, পৃ. ১৭।
১০. তদেব, পৃ. ৮৫, ৮৬।
১১. তদেব, পৃ. ৮৯।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আহমেদ হুমায়ুন, মিসির আলি সমগ্র (প্রথম খন্ড), অনন্যা, ঢাকা, ২০১২।
২. আহমেদ হুমায়ুন, মিসির আলি সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩।
৩. বাসার আফজালুল, বিশ শতকের সাহিত্য তত্ত্ব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৩।
৪. মিত্র মাধবেন্দ্র, মিত্র পুষ্পা (অনুবাদ), সিগমুন্ড ফ্রয়েড: মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪।
৫. রহমান হাবিবুর, পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বঃ দ্রুপদী ও আধুনিক, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪।

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 352-369
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.025

কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারের নির্বাচিত ছোটগল্পে রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা

মাসুদ আলী দেওয়ান, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 22.10.2024; Accepted: 29.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Political thinking is shaped by social injustice and deprivation, with the trend of social change developing around the social and economic status of the people. Political consciousness is more evident in rural society. The political atmosphere has been present since the early days of Bengali short story writing. Upon observing the nature of Bengali short stories, it is clear that political consciousness has had a significant influence. Leftist ideologies entered the short story from the earliest days of independence, and their influence gradually waned in the post-independence period, particularly during the sixth and seventh decades of the twentieth century. Abul Bashar is a writer from a different stream in Bengali fiction. He is a prolific writer, known for his storytelling, prose, creativity, and artistic expression. Due to social inequality and financial oppression, he became actively involved in politics. His political involvement allowed him to gain firsthand experience of rural life, bringing him closer to the common people and the land. He spent ten years in politics without contributing to any branch of literature. However, disillusioned with political ideologies, he re-

entered the literary world. As a result, politics occupies a significant portion of his stories. These political stories are the product of the experience he gained while being directly involved in politics.

Keywords: Abul Bashar, Political thinking, Social injustice, Social and economic position, Political consciousness.

একবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় কথাসাহিত্যিক হলেন আবুল বাশার। শারদীয় 'দেশ'পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফুলবউ' উপন্যাস তাঁকে পাঠকদের কাছে পরিচিতির পাদপ্রদীপে নিয়ে আসেন।তাঁর বেশির ভাগ গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ জনজীবনকে অবলম্বন করে। মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ অঞ্চলের জনজীবন, দালাদলি, সম্প্রদায়-সাম্প্রদায়িকতা, মানুষ ও মানবিকতা আবুল বাশারের গল্পে স্বমহিমায় উঠে এসেছে। তাঁর গল্প কাহিনীর বহিরঙ্গের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন সমাজ বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তেমনই গল্পের অন্তরঙ্গে প্রচ্ছন্ন আছে রাজনীতি। তাঁর গল্পের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে দেশ-কাল-সময়ের চিহ্ন। সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে গল্পকার আবুল বাশার তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিকে উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রগুলির মধ্যে সহজাত সংস্কার ও ধর্ম বিশ্বাসের সাথে মিশে থাকে এক ধরনের হতাশা, নৈরাজ্য, বিচ্ছিন্নতা ও বিপন্নতা।আর সেই বিপন্নতার সাথে সম্পৃক্ত সময় ও রাজনীতি। 'রাজনীতি' শব্দটি অত্যন্ত জটিল এবং বহুল প্রচারিত একটি বিষয়। অল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা সার্বজনীন কল্যাণ ও চেতনাকে প্রকাশ করাই হলো রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু বর্তমানের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় রাষ্ট্রশক্তিকে নিজেদের অধিকারের আনতে গিয়ে দলাদলি, নতুন আইন প্রণয়ন, নিজ স্বার্থে সেই আইনকে শোষণ ও শাসন যন্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে। আবুল বাশার মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র যে কেবলমাত্র অত্যাচারের যন্ত্র, ক্ষমতা অধিকার করায় তার মূল লক্ষ্য- মার্ক্সবাদের এই নীতিকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন রাজনীতি গান্ধীজীর সত্যনিষ্ঠা ও মার্ক্সের সাম্যবাদের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাবে। এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের ভাবধারা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্টরা ইংরেজ শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিল। শ্রমজীবি মানুষরা নিজেরাই তাদের নিজস্ব ভবিতব্যের নির্ধারক করতে পারবে, এমন এক সমাজ গঠনের সংকল্প নিয়েছিলেন কমিউনিস্টরা।কমিউনিস্ট সমাজের মূল ভিত্তি হলো রাষ্ট্রহীন, শ্রেণীহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। অত্যাচার, স্বৈরাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হলো কমিউনিস্ট আন্দোলন। হাজার হাজার আত্মত্যাগী যুবক সমতাবাদী ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ মনে করে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে জীবন উৎসর্গ করেন। সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বর্ণ বৈষম্যে, স্থানীয় কৃষকদের সংকট মোচন প্রভৃতি বিষয়ে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টরা আন্দোলন গড়ে তোলেন। সমাজে প্রান্তিক, শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের নিরাপদ বসবাসযোগ্য গড়ে তুলে সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনার পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের সমাপ্তি ঘটানো এবং একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার মাটিতে কমিউনিস্টদের শিকড় গাঁথা রয়েছে। শোষিত, বঞ্চিত মানুষ ও জাতির অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে তারা সর্বদা সোচ্চার করে গেছেন।

বামফ্রন্ট সরকারের শেষের দিকে স্থানীয় নেতারা এক ভয়ঙ্কর রূপ নিতে শুরু করে। ক্ষমতায় থাকা কিছু নেতা ও মন্ত্রী নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের দ্বারা পার্টিকে কালিমালিপ্ত করেন। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, নিজেদের আখের গোছানোর প্রবৃত্তি দিনে দিনে নেতাদের মধ্যে বাড়তে শুরু করে। বেনামে ব্যবসা করা, নিজের পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়া, অসাধু ব্যবসায় মদত দেওয়াতে সি পি আই(এম) নেতাদের একটা বড় অংশ জড়িয়ে পড়ে। শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি বামফ্রন্ট সরকার পড়ে যাওয়ার পিছনে একটি অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। জমি অধিগ্রহণ আইনের মাধ্যমে নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে শিল্পের জন্য জোর করে জমি গ্রহণ করার চেষ্টা করা হলে বিরোধীরা এক বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলেন ।কৃষকদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না

করে তাদের সম্মতি না নিয়ে, ন্যায়সম্মত কোনো ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই বামফ্রন্ট সরকার জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করেন। জনগণ সরকারের জমি অধিগ্রহণে বাধা দিতে গেলে পুলিশি অত্যাচার শুরু করা হয়। নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে চোদ্দ জন নিরীহ জনগণের প্রাণহানি ঘটে। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বড়ো কোন দুর্নীতির অভিযোগ না থাকলেও, সেই সরকারের বিরুদ্ধে আনা সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল দলতন্ত্র, স্বজনপোষণ ও দাম্ভিকতা। যতদিন এগিয়ে গিয়েছিল, ততই এই তিনটি বিষয় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে লাল পার্টির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গল্পকার আবুল বাশার প্রথম জীবনে বামপন্থী দলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি সাহিত্যচর্চা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর যৌবনের একটা অংশ রাজনীতির পিছনেই কাটিয়ে দেয়। যে রাজনীতি শোষিত, লাঞ্ছিত ও অসহায় মানুষদের কণ্ঠ হয়ে সমাজ বিল্পবের কথা বলত, আপন স্বার্থসিদ্ধির কথা না ভেবে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলত, আবুল বাশার সেই রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। লেখন কোন ভোগী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই রাজনীতির মধ্যে পরিবর্তন আসে, দলীয় নেতারা নানা দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে, যা লেখককে খুবই ব্যথিত করে তোলে। ফলে একসময় তিনি সেই রাজনীতি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আর সেই রাজনীতি সাথে জড়িয়ে থাকতে গিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তারই ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর গল্পে। আবুল বাশারের অনেক গল্পে উঠে এসেছে বামপন্থী নেতাদের দুর্নীতি, দলীয় রাজনীতি ও নিজেদের স্বজনপোষণের কথা।তাঁর গল্পে অবহেলিত, লাঞ্ছিত এক সম্প্রদায় তাদের জীবন, গল্প নিয়ে হাজির হলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

'চন্দ্রদীপ' গল্পে বামপন্থী দলের কর্মী জীবনের এক করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে। গল্পে বামপন্থী কর্মী হিসেবে চন্দ্রদীপ নামক এক কেন্দ্রিয় চরিত্রের কথা ব্যক্ত হয়েছে। রাজনীতির ঘোর আবর্তে পড়ে চন্দ্রদীপের জীবন কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় 'চন্দ্রদ্বীপ' গল্পে পাওয়া যায়। লাল পার্টি করার অপরাধে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ানো পুলিশের হাত থেকে বাচার লক্ষ্যে চন্দ্রদীপ নানা নামধারন করেছে, নানান পরিস্থিতিতে কোথাও রছুল মিঞা,

কোথাও মুরারী, কোথাও জিতেন আবার কোথাও বা জয়দেব পরামানিক নামধারণ করেছে। চন্দ্রদীপের কোথাও রছুল মিঞা ও কোথাও মুরারী নামধারনের মধ্য দিয়ে লেখক আবুল বাশার রাজনীতির পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যের বার্তাও দিতে চেয়েছেন। আসলে রাজনীতির মোহে পড়ে কিছু মানুষ অনেক সময় একে অন্যের অনিষ্ট সাধনে যুক্ত থাকেন। গল্পের শুরুতেই গল্পকার আবুল বাশার গল্পের নায়ক চন্দ্রদীপের মধ্য দিয়ে মিস্টার জেড নামক এক বিপ্লবীর কথা তুলে ধরেছেন।মিস্টার জেডকে ধরার জন্য সে দেশের সরকার এই ফরমান জারি করেন যে, তাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কৃত করার খবর শুনে মিস্টার জেড দেশ ছেড়ে গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আত্মগোপনের পরিকল্পনা করে। কিন্তু সীমান্ত এলাকার সীমান্তরক্ষীরা কড়া পাহারায় রত থাকায় মিস্টার জেড সীমান্ত পার হওয়ার সময় রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে যায়। সীমান্তরক্ষীরা তার সম্পূর্ণ শরীর তল্লাশি করে। পরিশেষে মিস্টার জেডের কাছ থেকে কিছু না মেলায় রক্ষীরা তাকে দেশদ্রোহী বলে সন্দেহ করে। কিন্তু নানা কথার ছলে রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন।এখানে গল্পকার মিস্টার জেডের মধ্য দিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের এক বার্তা দিতে চেয়েছেন।

মিস্টার জেডের এই গল্পটি কিভাবে চন্দ্রদীপের চলার পথে একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠেছে, তা গল্প আলোচনা করলেই অনুধাবন করা যায়। চন্দ্রদীপ যেন এক মরুযাত্রী, যার যাত্রাপথের কোন শেষ নেই। তার কাছে একমাত্র সঙ্গী হিসেবে রয়েছে মিস্টার জেডের গল্পটি। এই গল্পটি চন্দ্রদীপের কাছে মরুপথের উদ্যান। জলের উৎসের মতো গল্পটি চন্দ্রদীপের জীবনকে সতেজ করে রেখেছে। লাল পার্টির রাজনীতিতে (কমিউনিস্ট পার্টি) জড়িয়ে পড়ে চন্দ্রদীপ সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গল্পের নায়ক চন্দ্রদীপ মিস্টার জেডের গল্প থেকে একথা জানতে ও বুঝতে পারে যে, একজন বিপ্লবী তার আশ্চর্য উন্নত মাথাটি সারাজীবন বহন করে নিয়ে চলে। পুলিশ আর সরকারি গোয়েন্দার সতর্ক চোখ তাকে সর্বদা তাড়া করে চলে। এমত সময় মিস্টার জেডের গল্প ছাড়া চন্দ্রদীপের কাছে আর কিছু ছিল না, যা থেকে সে বাঁচার রসদ পাবে। রাজনীতির আবর্তে এসে সংসার জীবনের সাথে চন্দ্রদীপের

প্রত্যক্ষ যোগ নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা ও লোকাল কমিটির সাথেও তার আর কোন যোগ থাকে না। তার পার্টি যেন দর্পণ চূর্ণের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, যে দর্পণে মুখ দেখলে শুধু গ্লানি অনুভূত হয়। চন্দ্রদীপের বিশ্বাস গল্পটি যতদিন তার কাছে থাকবে, ততদিন সে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে না। সে মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস পোষণ করেন যে, তার পার্টির নেতাদের সঙ্গে পুনরায় আবার কোন একদিন যোগাযোগ করে উঠতে পারবেন। এখন চন্দ্রদীপ যে এলাকায় আত্মগোপন করে রয়েছে, সেই চর এলাকায় জনবসতি কম। এই চর এলাকার একপাশে একটা পুলিশ ফাঁড়ি থাকলেও তার লক্ষ্য চোরামাল চালান এবং সীমান্তের ওপারে গরু চালানের দিকে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে চন্দ্রদীপ চর এলাকায় রছুল নামধারণ করে খেতমজুরের বেশে আত্মগোপন করে থাকে। পেশায় খেতমজুর রছুল ওরফে চন্দ্রদীপ লুঙ্গি পড়ে, পায়ে টায়ারের চটি, বেনিয়ান ধরনের জ্যাকেট গায়ে, ঘাড়ে গামছা রেখে একজন সত্যিকারের খেতমজুরের রূপ ধারণ করে। নগেনের কথায়, চন্দ্রদীপ যতই নিজেকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য লালকে নাল বলে কৃষক হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, আসলে কৃষক হওয়ার পরীক্ষা যে বড় কঠিন। নগেন তাকে খুব সাবধানে থাকতে বলেছে, কেননা চর এলাকায় খুব ঘনঘন কালো গাড়ি অর্থাৎ পুলিশের গাড়ি আসা-যাওয়া করছে। খেতমজুর সেজে থাকা রছুল মিঞা আসলে রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী ।এই বিশ্বাস কোন ব্যক্তি চন্দ্রদীপের না, বিপ্লবী চন্দ্রদীপের। সে বাবু সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় সাধারণ মানুষ তাকে খুব আদর করে। সাধারণ মানুষের এই ভালোবাসায় চন্দ্রদীপ চর এলাকায় থাকার জন্য মাটির কোঠাবাড়ির উপরতলার একটি ঘর পেয়ে যায়। চর এলাকায় থাকতে গিয়ে অনেক মুরুব্বি রসিকতার সুরে চন্দ্রদীপকে বিয়ে করে সংসার করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মাছ যেমন জলের ভিতর থাকে, বিপ্লবী থাকবে জনগণের ভিতর- মা-ও-জে-দং এর এই উপমা অনেক ক্ষেত্রে বিফল হলেও সর্বত্র বিফল হয়নি, কেননা চন্দ্রদীপ এখন রছুল মিঞা।

নগেন নামক চরিত্রের বলা উক্তির মধ্য দিয়ে গল্পকার আবুল বাশার বিপ্লবী ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। নগেনের কথায়- ---

> ''দ্যাশে কি বিল্পব হবে রছুল ভাই? কত জান নষ্ট করলে তোমরা! কত মাথাঅলা সোনার চাঁদ বলি হয়ে গেল।''[১]

ঝিঙেদহর মোড়ে এক কমরেডকে কোন কারন ছাড়াই পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেন। কোন অপরাধ ছাড়াই লাল পার্টির দুইজন কর্মীকে পুলিশ জেলে পুরে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। এই সব দামাল ছেলেদের সংসার, বাবা-মা ছিল কিন্তু বিপ্লবের আবর্তে এসে সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়। চন্দ্রদীপের কথায় জনগণই যার ঠিকানা তার আবার সংসার কিসের দরকার। চন্দ্রদীপের দলে প্রবেশ করতে গেলে মৃত্যুর টিকিট কাটতে হয়, কেননা মৃত্যু হল তার দলের এন্ট্রি ফ্রি। চন্দ্রদীপের কথায়, তারা এভাবে মৃত্যুবরণ না করলে জনগণ তাদের বিশ্বাস করবে না। তারা যখন দলে এসেছিল, তখনই তারা একটি শপথ করেছিল যে বাবা মায়ের দেওয়া রোমান্টিক নামটা তারা ভুলে যাবে। রছুল মিঞা নামটির ভিতরই চন্দ্রদীপ নিজেকে খুঁজে বেড়িয়েছে বা অনুভব করেছে। আপন মনে চন্দ্রদীপ চরের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চরের ফাসিতলায় এসে হাজির হয়। ফাসিতলা নাম শুনেই চন্দ্রদীপের গা ছমছম করে ওঠে। জায়গাটা শীতল আর ভয়ানক নির্জন। এখানে কার ফাঁসি হয়েছিল এবং কেন ফাঁসি হয়েছিল তা কারো জানা নেই। ফাসিতলায় এসে চন্দ্রদীপের মনে ভয় না জাগলেও গভীর নির্জনতা চলে আসে।

ফাঁসিতলার ডোবার উপরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা একটি মৃতদেহ চন্দ্রদীপ দেখতে পায়, কাছে গিয়ে মৃতদেহটি চিত করতেই দেখেন সেটি মেটে সেখের মৃতদেহ। এই মৃতদেহ দেখে ভয়ানক চমকে যান চন্দ্রদীপ। মেটে সেখের এই মৃতদেহটি তাকে অনেকটা ভাবিয়ে তোলে। এরপর সে বুঝতে পারেন যে, তাঁর এই রছুল মিঞা নামের পাশাপাশি তাকে এই জায়গা অর্থাৎ চর এলাকা ছাড়তে হবে। রাতে ঘুমোতে গিয়ে তার বারবার মেটে সেখের কথা মনের অজান্তে মনে পড়ে যায়। কেননা তারই আদর্শের ছোঁয়ায় মেটে সেখ জিতেনপুরে পার্টির সংগঠন গড়ে তোলেন। বিড়ি বাধা একজন সাধারন মানুষ তারই আদর্শের ছোঁয়ায় অনেক বদলে গিয়েছিল। জিতেনপুরের বিড়ি শ্রমিকের মধ্যে তার প্রভাব অনেকটা ছিল। রছুল ওরফে চন্দ্রদীপ অনুমান করেন, তাকে কোন সংবাদ দেওয়ার জন্য মেটে সেখ চর এলাকায় আসার সময় পুলিশ তাকে পিছু ডেকে ধরে ফেলেন এবং হত্যা করেন। এরপর সে মনে মনে ঠিক করে নেয়,

সে এখন থেকে আরও রছুল মিঞা নয়, সে এখন জয়দেব পরামানিক। তার পরিচয় হবে সে নিমগাঁয়ের লোক।চন্দ্রদীপ ক্রমাগত নাম পরিবর্তন করতে গিয়ে এবং সেই নামধারনের মধ্যে থাকতে থাকতে গিয়ে বুঝতে পারে যে, তার একটা স্থায়ী বা নির্দিষ্ট নামের দরকার। কেননা তার দল আজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ায় সে একা এবং জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার মন আজ যেন কোথাও ফিরতে চাইছে। চন্দ্রদীপ তার বুকে জমা কষ্ট নিয়ে পার্টির কোনো নেতাকর্মীকে পাওয়ার আশায় পার্টির গোপন ঠিকানাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগে। কিন্তু সব জায়গা যেন জনশূন্য, কোথাও কারো দেখা নেই। এমত অবস্থায় চন্দ্রদীপ যেন তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করেন। সে বুঝতে পারে, তার আর বাড়ি ফেরা হবে না, মার সঙ্গে দেখা হবে না। সে আরও ভাবতে লাগে, সে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তারা হয়তো তাকে চিনতে পারবে না। তার জীবনের গতি হয়তো হারিয়ে যাবে, তার হয়তো আর চাকরি হবে না। তার বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য পুলিশ ধরলে তাকে যে কত বছর কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে থাকতে হবে তারও কোনো হিসাব নেই। ঠিক এমন সময় চন্দনার কথা তার মনে পড়ে যায়। চন্দনার আর এক নাম ছিল বুড়ি। চন্দ্রদীপকে সে দীপদা বলে ডাকত। চায়ের দোকানের আলোচনা থেকে জানা যায়, পুলিশ কিভাবে বিপানকে বটতলার নিচে ধুনুরিদের মধ্যে থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিপান খুব মিশুকে ছেলে ছিলেন। যার সুবাদে সহজে ধুনুরিদের সাথে মিশে গিয়ে ছিলেন।পুলিশ পাগলা শেয়ালের মত তাকে খুঁজতে লাগলে সে বটতলায় ধুনুরিদের চটের উপর গিয়ে বসে পড়ে। হাতে তুলে নেয় ধোনার যন্ত্র এবং তুলো পেজিয়ে ওঠে তার ধুনে। সেই সময় বিপানের এই রূপ দেখে পুলিশ কখনই তাকে চিনতে পারত না কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলের কেষ্টবিষ্টুর দল তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। প্রকাশ্য রাস্তার উপরে কেষ্টবাবুরা পুলিশের সামনে বিপানের গালে চড় মারেন এবং চোখে অ্যাসিড ঢেলে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দেয়। চায়ের দোকানের বিপানের এই করুণ পরিণতির কথা শুনতে গিয়ে চন্দ্রদীপের শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে উঠে। সে নিজেকে জাতি-ধর্ম, গোত্রহীন, গৃহহীন, পথহারা মানুষ ভাবতে শুরু করে। কারন সে বিপানের মত তার সুন্দর চোখ দুটি হারাতে চায় না। কেননা এই চোখ দিয়ে সে বিপ্লবের অগ্নিক্ষরা অক্ষরগুলো পাঠ

করেছে, কাব্য সাহিত্য পাঠ করেছে, ভারতবর্ষের দুঃখ, দারিদ্রকে দেখেছে, সর্বোপরি তার এই চোখ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু শেষমুহূর্তে চন্দনার পিছু থেকে ডেকে উঠলে, সেই ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়। 'চন্দ্রদীপ' গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পকার একজন ফেরারি বিল্পবির কথা বলতে চেয়েছেন। রাজনীতির সাথে জড়িয়ে থাকতে গিয়ে একজন বিল্পবীর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে, গল্পকার আবুল বাশার তাই দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

'একটি রক্তাক্ত ভুল' গল্পে আবুল বাশার রাজনীতির এক কদর্য রূপ তুলে ধরেছেন। আমাদের চারিপাশে যেসব সমস্যা হঠাৎ জেগে উঠে কোন শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে ব্যাহত করে তার সমাধান করাই হল রাজনিতি।ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রেখে কাছে টেনে নেওয়া রাজনীতির অঙ্গীকার হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে তেমনটি লক্ষ্য করা যায় না। কেননা এই অঙ্গীকার পূরণ করতে গেলে কোথাও কোন সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, বঞ্চনা, নীচ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে না, কিন্তু বাস্তবে সেটি সম্ভব নয়। আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত অসহায় ভরা দৃষ্টি নিয়ে দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির কদর্য রূপ দেখে চলেছি। গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য এমন এক নেতৃত্বের প্রয়োজন, যার উদারতা হবে আকাশের মতো। যেখানে কমরেড নামক নেতারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে এক তরতাজা সতেজ প্রাণকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়।আলোচ্য গল্পে তেমনই কিছু ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের প্রধান চরিত্র প্রতুল, যার উপস্থিতির গল্পের শুরুতে লক্ষ্য করা যায়। প্রতুলের দাদা অতুল, যিনি সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত। গল্পের নায়ক প্রতুলের বাল্যকালের বন্ধু গৌতম, যার ডাকনাম ছিল গোরা। সাবলীল ও স্বতস্ফূর্ত বন্ধুত্বের রূপ প্রতুল ও গোরার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাদের বন্ধুত্বের মাঝে অর্থ ও সামাজিক কোন প্রতিপত্তি বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। গোরার পরিবার আর্থিক দিক থেকে অনেক দুর্বল হওয়ায় গোরা কখনো অন্যের সামনে নিজেকে জাহির করতেন না, সব সময় যেন মাথা নিচু করে চলতেন। প্রতুলের বলা সকল কথা গোরা একজন ভালো শ্রোতার মতো শুনতেন। গোরা সর্ব সময় প্রতুলের পাশে পাশে থাকতেন। একটি মুহূর্তে সে যেন প্রতুলকে না দেখে থাকতে পারতেন না। কোন কথার অবাধ্য না হওয়া

গোরাকে প্রতুল ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়, যা কোন মতেই গোরা বুঝতে পারেনি। কমরেড অতুলের দ্বারা ডাকা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলনে প্রতুলের সাথে গিয়ে গোরা মৃত্যুবরণ করে। গোরার সেই মৃত্যুর দিনটিকে পার্টি তার নিজের সুবিধার কথা ভেবে শহীদ দিবস হিসাবে পালন করতে লাগে।

গোরার বোন শঙ্খমালা, গল্পের মধ্যে নিমা নামে যার বেশি উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় ছোট থেকেই নিমা মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছে। অনার্স সম্পূর্ণ করে টিউশন পড়িয়ে নিজের এবং মেস ভাড়ার খরচ কোনভাবে জোগাড় করত। একটা চাকরি পাওয়ার তাগিদে মন্ত্রী অতুলের সাথে দেখা করার বাসনা নিয়ে প্রতুলের কাছে আসার মধ্য দিয়ে গল্পে প্রথম নিমার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রতুলের দাদা অতুল ভোটে জিতে মন্ত্রী হয়েছে। নিমার ভাবনা, প্রতুল যদি একবার তাকে দাদা অতুলের কাছে নিয়ে যায়, তবে তার একটা চাকরি হয়ে যাবে। আর এই আশায় নিমা প্রতিনিয়ত প্রতুলকে তার দাদার কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে থাকেন। প্রতুল দাদা অতুলের উগ্র রাজনীতিকে পছন্দ না করায় দাদার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে পিসির বাড়ি এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাই সে কোনমতে নিমাকে অতুলের কাছে নিয়ে যেতে পারে না। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতুলের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গল্পের শুরুতেই প্রতুলের চোখের জলের প্রসঙ্গ উঠে আসে। যেখানে তার মনে হতে লাগে, তার চোখের জলের কানাকড়ি দাম নেই। চোখে বারবার জল চলে এলেও সেই অবাধ্য জলকে কোথাও লুকিয়ে রাখার মতো জায়গার খোঁজ প্রতুলের জানা ছিল না। রাজনীতির মোহে পরে প্রতুল তার প্রাণোধিক বন্ধু গোরাকে হারিয়ে ফেলে। গোরা তাকে অন্ধের মত বিশ্বাস করত। প্রতুল বাধ্য ছেলের মতো গোরাকে নিজের ইচ্ছে মতো যেদিকে খুশি টেনে নিয়ে চলত, সেও কোন প্রশ্ন না করে প্রতুলের সাথে চলে যেত। আজ সেই গোরায় প্রতুলের কাছ থেকে অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছে, যা ভাবতে গেলে প্রতুলের খুব কষ্ট হয়। গোরার মৃত্যুর জন্য প্রতুল নিজেকে দায়ী করতে থাকে, যার ফলে সে আর গ্রামে ফিরে যায় না। রাজনীতিকে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। দাদা অতুলের রাজনৈতিক ভাবনাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে প্রতুল, যার ফলে দাদার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন

করে দেয়। ভোটে জিতে অতুল উপমন্ত্রী হয়। আর এই মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে প্রতুল অনায়াসে নিজের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে নিতে পারত। কিন্তু প্রতুল সেই সুযোগ গ্রহণ করেনি। সে তার জীবন যাপনের জন্য যৎসামান্য উপার্জন করেন, যে কাজ করে উপার্জন করে তা বলার মতো বা উল্লেখ করার মতো নয়। গোরার মৃত্যুকে নিয়ে প্রতুলের বুকে জমে ওঠা কষ্টের কথা নিমাকে বলতে থাকে। যতদিন গেছে বন্ধু গোরার জন্য প্রতুলের কষ্ট যেন ততই বেড়ে চলেছে, যার জন্য প্রতুলের মাঝে মাঝে নিজেকে পাগল পাগল মনে হয়। চাকরি চাইতে আসা নিমাকে প্রতুল নানাভাবে তার বুকে জমে থাকা কষ্টের কথা শোনাতে চাইলে নিমা তার সেই কষ্টের কথা ততটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না, যতটা প্রতুলের ভাবনায় আসে। প্রতুলের গ্রাম সীতানগর, সেখানেই তার দাদার বেড়ে ওঠা। আজ সেই অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে অতুল মন্ত্রী হয়েছে। অতুল চিরকালই খুব দাপুটে নেতা ছিল। আর এই দাপুটে হওয়ার কারণে কোনদিনই প্রতুল তার দাদাকে সহ্য করতে পারত না। যেখানে প্রতুলকে বলতে শোনা যায়---

> ‘‘দাদার সংগ্রামী রাজনীতির গ্রাম বাংলায় অনেক রক্ত ঝরিয়েছে, অনেকে গ্রামেই শহীদ আছে।’’[২]

কমরেডরা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে সেই শহীদ যুবকদের শহীদস্তম্ভ তৈরি করেছে। এই শহীদরাই যেন প্রতুলকে গ্রামে প্রবেশ করতে দেয় না অর্থাৎ কিছু সুযোগ সন্ধানী কমরেডদের কথার মোহে পড়ে যেসব সহজ-সরল ছেলেরা তাদের বুকের রক্ত উৎসর্গ করেছে, তাদের কথা ভেবে প্রতুল গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না।

একই রাজনৈতিক সত্তা কিভাবে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে তা গল্পকার আলোচ্য গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। রাজনীতির মোহে পড়ে অতুল নিজ গ্রাম ও পরিজনদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। দাদা গোরার মৃত্যুর বিনিময়ে বোন নিমা মন্ত্রী অতুলের কাছে চাকরির দাবি করে।নিমার এই চাকরি চাওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পকার একদিকে যেমন নিমার অসহায় জীবনের কথা তুলে ধরেছেন, অপরদিকে নিমার লোভী মানসিকতারও কিছুটা পরিচয় ফুটে উঠেছে। আবুল বাশারের সুক্ষ্য তুলির টানে অতুলের মধ্যে থাকা রাজনীতির মোহ এবং নিমার লোভী মানসিকতার চিত্র ফুটে

উঠেছে। 'একটি রক্তাক্ত ভুল' নামকরণের মধ্য দিয়ে গল্পকার আবুল বাশার কিছু রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পটি সামগ্রির আলোচনা থেকে সহজে অনুধাবন করা যায়, গল্পটির সর্বাঙ্গ জুরে রাজনৈতিক সত্তা ফুটে উঠছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রতুলের মধ্যে, নিমার চাকরি পাওয়ার মধ্যে, মন্ত্রী অতুলের সাথে ভাই প্রতুলের সম্পর্ক বিচ্ছেদের মধ্যে, শান্ত স্বভাবের ছেলে গোরার মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পে রাজনৈতিক ভাবনা ফুটে উঠেছে।

গল্পকার আবুল বাশার 'বড় জোর দুই মাইল' গল্পে বামপন্থী এক মুসলমানের কথা ফুটে উঠেছে। শরিয়ত হাজির বাড়ি রাজনীতির প্রধান। গল্পে এক বিচিত্র ও জটিল মৃত্যুর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইমরান নামক এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গল্পটি তার পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। ইমরানকে কে বা কারা খুন করেছে? কি উদ্দেশ্যে খুন করেছে? সেই বিষয়টিকে নিয়ে গল্পে এক জটিল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অনেকে মনের মধ্যে এই খুনের কারণ হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে দায়ী করে থাকে। ইমরানের খুনের তদন্ত ভার যার উপর পড়েছে, সে হল গৌরাঙ্গ ওরফে গোরা দারোগা, যাকে অনেকে চারি আনার দারোগা বলে থাকেন। গোরা দারোগার ভালো নাম হল গোরা মুখুজ্জে। পুলিশের চাকরিতে প্রবেশ করার আগে তিনি সাহারানপুরের হাইস্কুলের ফিলজফির শিক্ষক ছিলেন। ইমরানকে খুন করে প্রথমে তার শরীর থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে, পরে সেই মাথাটি অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। ইমরানের সেই প্রকাণ্ড পরিণত মাথাটা ঘাতকরা কেন সরিয়ে ফেলল? কি কাজেই বা মাথাটা লাগবে? এইসব নানা প্রশ্ন অনেকের মনে জাগতে শুরু করে। অবশ্য এই ধরনের মার-মৃত্যু ষড়যন্ত্র যখন হয়, তখন মাথা একদিকে আর শরীর একদিকে পড়ে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে এটি যে সামান্য ডাকাতির ঘটনা নয়, তা বলাই বাহুল্য। যে খুনটি যে প্রচন্ড বিদ্বেষবশত হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকের ধারণা কাঁথাউড়ির মাহেশ্বরা নয়তো ঘোষেরা গোপনে লোক লাগিয়ে ইমরানকে খুন করেছে। যদিও ইমরানের এই খুন নিয়ে অনেকের মধ্যে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়। ইমরানের হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে গোরা দারোগার যেন হতবুদ্ধি হওয়ার মত অবস্থা হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির ফলে মানব জীবনে নানা বিপর্যয় নেমে আসে। উগ্র ধর্মীয় ভাবনায়

ভাবিত কিছু মানুষের সাথে রাজনৈতিক নেতারা যোগ দিয়ে নিজেদের স্বার্থের জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক –সামাজিক- সাংস্কৃতিক জীবনের উপর দাঙ্গার প্রভাব পড়ে। বহু ধর্ম, জাতি ও বর্ণের দেশ ভারতবর্ষে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বাস করে, আবার সময়ে সময়ে ধর্ম, ভাষা কিংবা জাতিকে কেন্দ্র করে হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ে। ইমরান একবার বন্দুক উঁচিয়ে কাঁথাউড়ির মাহেশ্বদের মারার জন্য তেড়ে গিয়েছিলেন। তার সেই তেড়ে যাওয়ার কথা বাতাসের গা থেকে বৃষ্টির ফোটার মত ঝরে পড়ার আগেই সে খুন হয়ে যায়। মাত্র তিন মাস আগে জিন্নাতন বানুর সঙ্গে ইমরানের বিয়ে হয়। নিলামপুরের দৌলত কাজীর মেয়ে জিন্নাতন, তার ডাকনাম জিনু। তাদের বিয়েতে গোরা দারোগার নিমন্ত্রণ থাকলেও সে বিশেষ এক কারণে আসতে পারেননি।আজ এসেছেন ইমরানের মৃত্যুর তদন্তভার নিয়ে।মাথাচ্ছেদ স্বামীর হাতখানি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে জিন্নাতুন তুলে নিয়ে বসে আছেন। কত না নিপুন ভালোবাসায় স্বামীর নখে নেলপালিশের রঙ লাগিয়ে ছিলেন জিন্নাতন, তখন ইমরান জীবিত ছিল।তার কোলের উপর স্বামীর হাতখানা সমাদরে পড়ে আছে। ইমরানের মৃত্যুতে তার সেই যৌবন যেন দমকা হাওয়ায় নষ্ট হয়ে গেছে।

হাজী শরিয়ত একজন বামপন্থী মুসলমান। তার বাড়ি বামপন্থী রাজনীতির প্রধান আশ্রয় হওয়ায় পঞ্চায়েত প্রধান এই বাড়িকে মান্য করে চলেন। চৈতালীর বলা, একক ব্যক্তি ইমরানকে খুন করেছে, এই কথাটি কোন মতেই পঞ্চায়েত প্রধান মেনে নিতে পারেন না। যার ফলস্বরূপ প্রধানকে ক্ষিপ্ত গলায় বলতে শোনা যায়,তিনি কাঁথাউরিকে প্রটেকশন দিচ্ছেন। প্রধানের মতে তিনি একজন কমিউন্যাল লোক,কেননা একজন খুন করেছে বলে দিয়েই সেই একজনেরই ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মাহেশ্বদের খালাস করতে চাইছেন। তার মতে, এটা একটা পলিটিক্যাল মার্ডার, মাহেশ্বদের কাছে সে ঘুষ খেয়েছে। গোরা দারোগা একজন হিন্দু হয়ে আরেকজন হিন্দুকে বাঁচাতে চাইছেন, আর সে কারণেই তাদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছেন। তার মতে ইমরানের খুন এক রাজনৈতিক খুন, কেননা তার পরিবার সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত। আর এই রাজনীতির কারার কারণে তাকে খুন হতে হয়েছে। বামপন্থী হওয়ায়

বিদ্বেষবশত ইমরানকে খুন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধান কিছুটা হুমকির সুরে গোরা দারগাকে বলেন, যদি ইমরানের খুনের কারণে মহেশ্বদের না ধরে থানায় আটক করেন, তবে জনমত নির্বিশেষে নয়ানজুলির লোকেরা তার বিরুদ্ধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করবেন।পঞ্চায়েত প্রধানের এহেন অভিযোগের কথা শুনে গোরা দারোগার ভাবনায় আসে---

> ''মাথায় ইলেকশন ছাড়া এসব লোকের কিছুই থাকে না। ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতা এদের এখন আশ্রয়স্থল। উটপাখি যেমন বালিতে মুখ গোঁজে, হাতে লালঝান্ডা নিয়ে এরাও এখন ধর্মে মুখ গুঁজে সাম্প্রদায়িকতার বালিঝড় ওড়াচ্ছে।''[৩]

প্রধান মহাশয় তার কথার মধ্য দিয়ে সবকিছুকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পঞ্চায়েত প্রধান বারবার গোরাকে ঘুষ নেওয়ার কথা বলতে থাকলে, প্রধানের এহেন অযৌক্তিক কথা শুনতে শুনতে স্বামীর হয়ে চৈতালী তার প্রতিবাদী গলায় বলে উঠে, তার স্বামী ঘুষ কখনো দু'চোখে দেখেননি, সে স্কুলের মাস্টারমশাই ছিলেন।

গল্পের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রাজনৈতিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। ইমরানের পরিবার লাল পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক। হাজী শরিয়ত সাহেবকে সকলে সমীহ করে চলে। নিজ কর্মকাণ্ডের দ্বারা ধ্বংস ডেকে আনা এক পরিবারকে বাঁচানোর জন্য পঞ্চায়েত প্রধানের বলা কথায় মধ্য দিয়ে লাল পার্টির (বামফ্রন্ট) স্বজনপোষণের বিষয়টি গল্পকার আবুল বাশার তুলে ধরতে চেয়েছেন। বেশ কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের কথা ফুটে উঠেছে। সেই দিক থেকে 'বড় জোড় দুই মাইল' গল্পকে রাজনৈতিক গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

গল্পকার আবুল বাশার তাঁর 'হিংসার উৎস' গল্পে ক্ষমতাতন্ত্রের একটি অন্ধকার দিক তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুই রূপের পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার। হরচৌধুরী নামক বিধায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের এক কদর্য রূপ ফুটে উঠেছে। যাকে কেন্দ্র করে গল্পটি তার পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে, তিনি হলেন ফাটা মঘাই ওরফে কেশব।ফাটা মঘাই হলের একজন পেশাদার খুনি। এম.এল.এ হরচৌধুরীর বডিগার্ড হিসেবে তাকে বহাল করা হয়। মঘাই যে হরচৌধুরীর বডিগার্ড সেকথা

লেবুতলার কোন মানুষ বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। মঘাইয়ের গ্রামের বটম দাদা তাকে এই কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন। তার নামে তেরোটা খুনের মামলা থাকার কথা জেনেও এম.এল.এ সাহেব বডিগার্ড হিসেবে নিয়োগ করেন। পুলিশের ভয়ে মঘাইয়ের গ্রামে থাকা বেশ বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসবে। মঘাই জানত, হরচৌধুরী একজন সৎ মানুষ, বাড়ি ছেড়ে দূর গাঁয়ে থেকে মানুষের জন্য কাজ করা জনসেবক। এমন সৎ ব্যক্তি তাকে কেন বডিগার্ড হিসেবে নিয়োগ করলেন, তা মঘাই বুঝে উঠতে পারে না। মঘাইয়ের ভালো নাম হল কেশব। হরচৌধুরী তাকে কাজে নিয়োগ করে বুলেট মোটরবাইকের পিছনে বসিয়ে নিয়ে বলে উঠে,সে কেশবকে তার দেহরক্ষী হিসাবে নিয়োগ করেছে, এর আগে সে এইভাবে কাওকে কোন কাজ দেয়নি। কেননা তার কোন দেহরক্ষী লাগে না। বিধায়ক হরচৌধুরীর এক ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পেয়েছে। বাইরে ভালো মানুষের মুখোশে ভিতরে নিজ চাহিদা পূরণের জন্য অন্ন নামক নারীর সতীত্ব নষ্ট করেছেন। নিজের রাজনৈতিক পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে বিধায়ক মশাই দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রেখে অন্নকে ভোগ করেছেন। তার উপর যেন কোন আঘাত না আসে তার জন্য কেশব নামক এক পেশাদার খুনিকে নিজের দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। এবং শেষে নিজের পথের কাটাকেপরিষ্কার করার লক্ষ্যে দরবেশকে হত্যা করে তার দায় কেশবের ঘাড়ে চাপিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।বিধায়ক হরচৌধুরীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার রাজনৈতিক নেতার কদর্য চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

'কারাগার' গল্পে গল্পকার আবুল বাশারের রাজনৈতিক ভাবনা পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির এক বিশেষ দিকের কথা তুলে ধরেছেন। এই পার্টিতে থাকা উগ্র মেজাজের ছেলেরা যে পার্টির বোল্ড ক্যাডার তারও কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। বরুণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বা তার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে পার্টির বোল্ড ক্যাডারের এক ভয়ঙ্কর রূপ ফুটে উঠেছে। পার্টির নেতারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যে এই ক্যাডারদের তৈরি করে থাকেন। পার্টির প্রয়োজনে এই সব ক্যাডাররা কোন কিছু না ভেবে নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দেয়। তাই পার্টি নিজের লক্ষ্যে

পৌঁছানোর জন্য, এইসব উগ্র মেজাজের ক্যাডারদের যত্ন করে পুষে থাকেন। এই গল্পের নায়ক প্রমিথের বিবাহিত জীবনে পার্টির ক্যাডার রূপী বরুণ কিভাবে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে, তারও পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের নায়িকা দীপিতাকে বরুণ জোর করে নিজের ভালবাসার কথা জানিয়ে নিজের কাছে টানার চেষ্টা করে। বরুণের ভালোবাসার প্রস্তাব প্রথমে দীপিতা রাজি না হলে বরুণ ভোজালি দিয়ে তার গলা কেটে নামিয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়। গলা কাটার ভয়ে শেষ পর্যন্ত দীপিতা বরুণের ভালোবাসা গ্রহণ করেন। উগ্র মেজাজের ছেলে বরুণকে দীপিতার পরিবার মেনে নিতে না চাইলে সে একটি তীক্ষ্ণ ভোজালি দীপিতার হাতে দিয়ে সেটিকে তার পরিবারকে দেখানোর কথা বলেন। বাবা-মা মরা মেয়ে দীপিতা মামার সংসারে মানুষ হয়।তার মামাতো ভাই দিবাকর পার্টির ক্যাডার বরুণকে কোন মতেই মেনে নিতে পারে না, তাই সে বরুণের খারাপ দিকগুলি নানাভাবে প্রমিতের সামনে তুলে ধরে, যাতে প্রমিত দীপিতাকে বিয়ে করে সেই উগ্র মেজাজের ক্যাডারের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেন। দীপিতার সাথে বরুণের মিলামেশাতে দিবাকরের বাবা কোনো আপত্তি তোলেন না। কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হলেও দিবাকরের বাবা। তার পার্টির বোল্ড ক্যাডার হিসেবে বরুণের পরিচিতি। তাই ভয়ে দিবাকরের বাবা ভাগ্নি দীপিতার সাথে বরুনের মেলামেশাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই গল্পে রাজনৈতিক ভাবনা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমিত ও দীপিতার বিয়ের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে চলে আসে। 'কারাগার' নামকরণের মধ্য দিয়েও রাজনৈতিক ভাবনার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

দীপিতাকে নিয়ে দিবাকরের এহেন কথা রোজ শুনতে শুনতে একদিন প্রমিত বলে উঠে, দিবাকরইতার প্রকৃত অভিভাব, কারণ সে দীপিতার জীবন সম্পর্কে যত শঙ্কিত, ওর মামা-মামি তার দশ ভাগের এক ভাগও সেই বিষয়ে ভাবেন না। দিবাকর সম্পর্কে প্রমিতের এই কথা শোনার পর সে বলে ওঠে, তার বাবা কিছুটা আলগা স্বভাবের মানুষ। মেয়ে কার সঙ্গে, কিভাবে মেলামেশা করছে, তা দেখেও না দেখার ভঙ্গি বা ভান করে থাকেন। মেয়েকে এই না দেখার ভঙ্গি শুধু যে তার উদাসীনতার পরিচয় ঠিক তা নয়, তিনি বরুণের উগ্র মানসিকতাকে ভয় পান।বরুণ তার পার্টির লোক, চিরকাল ধরে সে কমিউনিস্ট পার্টি করে আসছেন। গল্পকথকের সময়ে এই পার্টিতে বরুনের

মতো অনেক উগ্র মেজাজের ছেলেরা প্রবেশ করেছে, এরাই এখন এই পার্টির বোল্ড ক্যাডার। পার্টির জন্য এরা যেকোন সময় নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিতে পারে। তাই পার্টি তার নিজের প্রয়োজনে বরুণদের মতো ক্যাডারদের যত্ন করে পুষে রাখে, পার্টি কোনভাবে এদের হাতছাড়া করতে চায় না।কমিউনিস্টের ছত্রছায়ায় বড়ো হয়ে উঠা বরুণের উগ্র ভাবনার কথা প্রমিত দিবাকরকে পার্টির উপরের নেতৃত্বকে বলার কথা বলেন। তার এই কথা শুনে দিবাকর হাসি মুখে বলে উঠে---

> ''বাবাই তো নেতা, আর কাকে বলতে যাব আমি। উপরের নেতারা তো বাবার কাছেই ঘটনার ডিটেলস চাইবে।''[৪]

উপরের নেতারা বরুণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তার বাবা কিছু না বলে এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যায়। তার বাবার এই এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে আর কেউ সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না, সকলেই সেই বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। দিবাকরের এই কথা শুনে প্রমিত বরুণের এই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে তাকে সরাসরি দীপিতার সাথে কথা বলতে বলে।

গল্প আলোচনার পরিশেষে একথা বলা যেতেই পারে, গল্পে আবুল বাশারের রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় যথার্থ পরিমাণে পাওয়া যায়। এস.ইউ.সি.আই ও নকশাল এই দুই বাম দলকে আবুল বাশার খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই দুই দলের প্রতিচ্ছবি তাঁর নানা গল্পে ফুটে উঠেছে।লেখকের সমকালীন রাজনীতি চাওয়া পাওয়ার রাজনীতি ছিল না, তা ছিল আত্মত্যাগের রাজনীতি।বামপন্থী রাজনীতি বলতে গল্পকার বুঝতেন চাষির সাথে থেকে, শ্রমিকের সাথে থেকে লড়াই করা, তাদের হয়ে সোচ্চার হওয়া। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই ধারনার মধ্যে পরিবর্তন আসে। স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, নিজ আখের গোছানর মতো প্রবৃত্তি নেতা-কর্মীদের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগে। এসবেরই এক প্রতিচ্ছবি আবুল বাশার তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। 'শ্রেষ্ঠ গল্প', আবুল বাশার, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২

২। 'একটি খামে ভরা কাহিনী', আবুল বাশার, সৃষ্টি প্রকাশক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৯

৩। 'একই বৃন্তে ' , আবুল বাশার, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০

৪। 'একটি খামে ভরা কাহিনী', আবুল বাশার, সৃষ্টি প্রকাশক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৯

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১। 'কালের পুত্তলিক' (বাংলা ছোটগল্পের একশ বিশ বছর ১৮৯১-২০১০) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৮২

২। 'স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম-মানস', বিশ্বজিৎ পাণ্ডা, সৃষ্টিসুখ প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০২০

৩। 'নকশাল বাড়ি: তিরিশ বছর আগে এবং পরে', আজিজুল হক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯

সাক্ষাৎকার:

১। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকার, 'বইয়ের দেশ', জানুয়ারি ২০১৯

পত্রিকা:

১। 'আদরের নৌকা' সম্পাদক অভীক দত্ত, প্রকাশিত আদরের নৌকা বইমেলা সংখ্যা ২০০৮

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 370-381
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.026

অশরীরী চিন্তা-চেতনায় শীর্ষেন্দুর কিশোর উপন্যাস : ভূত ও মানুষের পারস্পারিকতায় এক স্বতন্ত্র মাত্রা

নমিতা হালদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.11.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ghosts have long been a significant part of human culture and society, with varying representations across different communities worldwide. In literature, they appear in numerous forms, often embodying fear and mystery, especially in children's stories. The tradition of ghost stories dates back to ancient times, where ghosts were depicted as eerie and somewhat self-aware beings, often creating terrifying situations in human society. These early ghosts were deeply conscious of their existence, which led them to disturb the living. However, over time, the portrayal of ghosts has evolved, particularly from the mid-20th century, with literature reflecting a shift in how ghosts interact with humans. Instead of being enemies, ghosts began to coexist with humans in a more harmonious manner.

Among the authors who have revolutionized the image of ghosts, turning them from menacing figures to more friendly ones, Shirshendu Mukhopadhyay stands out in Bengali literature. His works brought a fresh perspective to children's literature, breaking

the monotony of traditional ghost stories. Mukhopadhyay infused humor into his depiction of ghosts, challenging the conventional frightening portrayal. His approach reflects a broader fascination with ghosts, which blend curiosity and fear in the human imagination. In popular belief, ghosts are the spirits of the dead, often imagined as vengeful or seeking to fulfill unresolved desires, such as the legend of the vengeful woman who becomes a ghost after dying with unfulfilled longing.

Mukhopadhyay, however, dismantled these age-old myths, presenting ghosts not as terrifying enemies, but as beings who fear humans. His transformation of the ghost image is rooted in the works of earlier writers like Upendrakishore, Trailokyanath, and Parashuram, who introduced ghost stories in Bengali literature. Yet, Mukhopadhyay's approach was unique. He combined elements of humor, simplicity, and art to redefine the ghost figure, allowing them to be part of society in a more relatable and engaging manner. This shift in how ghosts are portrayed – as beings who can coexist with humans rather than terrorize them – is the central focus of this analysis.

Keyword: Shirshendu Mukhopadhyay, Ghost, Human, Society, Traditional, Juvenile literature, Terrible.

বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র ভূত। বাংলা সাহিত্যে ভূতের কথা এসেছে নানাভাবে। আশ্চর্যের বিষয় শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, ভূতের কথা এসেছে বিশ্বের প্রায় সব ভাষার সাহিত্যে। বিশেষ করে শিশু-কিশোর সাহিত্য সাম্রাজ্যে ভূত একটি অনিবার্য চরিত্র। বর্তমান সমাজে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এমন অত্যাধুনিক যুগেও এই জাতীয় সাহিত্যের কদর কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। পাঠকরা অনেক বেশি আগ্রহ নিয়ে বরং এই ধরণের লেখার প্রতি দিন দিন আকৃষ্ট হয়েছে। ফলে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে ভৌতিক কাহিনি লেখার প্রবণতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। যেহেতু বর্তমান সময়ের পাঠকরা ভৌতিক কাহিনির প্রতি তীব্র আকর্ষণবোধ করছে সেহেতু দেখা যায়, একরকম ভূতের গল্প-উপন্যাস লিখেই অনেক সাহিত্যিক সাহিত্যজগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন। মানুষ ভয় পেতে ভালোবাসে।

ভয়ের সঙ্গে মানুষের চিরাচরিত সম্পর্ক। আর মজার বিষয় হল এই যে, সেখানে ভূত যে থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, আসলে ভয়ের পরিবেশটা থাকলেই যথেষ্ট। সেই পরিবেশ মানুষের মনে এমন এক শিহরণ জাগায় যা তাদেরকে আনন্দ দেয়। অবশ্য বিশ শতকের প্রারম্ভে সেই ভৌতিক পরিবেশ ছিল অনেক বেশি ভয়ানক ও গা-ছমছমে। তখনকার ভূতেরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ছিল অনেক বেশি সচেতন। তাই তো নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে প্রায়ই মানুষের ওপর চড়াও হত। মানুষের ক্ষতি করে বুঝিয়ে দিত যে তারা ভয়ঙ্কর। তাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। কাজেই সেসময় ভাঙা বাড়ি বা পরিত্যক্ত জায়গাও পরে থাকতে দেখা যেত বিস্তর। বর্তমান সমাজে যা প্রায় দেখায় যায় না। তবে ধীরে ধীরে ভূত সম্পর্কে এমন ভাবনা পালটে যাচ্ছে এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে ভূতেদের এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তারা মানুষের সামনে আর ভয়ঙ্কর রূপে নয়, বরং বন্ধু রূপে আসতে চাইছে। মানুষের বন্ধু হয়ে মানবসমাজে মিলেমিশে থাকতে চাইছে। এমন বন্ধু ভূতের সার্থক রূপকার হলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি ভূত সম্পর্কে প্রাচীন ধারণাকে এক লহমায় চূর্ণ করে দিয়ে ভূতকে মানব দরদী তথা বন্ধুতে পরিণত করে তোলেন। যদিও এর পূর্ব প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর, ত্রৈলোক্যনাথ, পরশুওরাম প্রমুখ লেখকের হাত ধরে। তবে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যেভাবে ভূতের পুরোনো ভয়ঙ্কর মিথকে ভেঙে দিয়ে তেনাদেরকে একেবারে মানুষের অত্যন্ত নিকট জন করে তুলেছেন তা সত্যিই অনন্য। অসাধারণ বর্ণণায় ও নিপুণ কৌশলে ভূতকে বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন আধুনিক সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যের এই প্রবাদপ্রতিম বরেণ্য লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের সুখিগঞ্জ মহকুমার বাইনখাড়া বা বানিখাড়া গ্রামে, ২রা নভেম্বর ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে। তা ছিল একেবারে বাণভাসি অঞ্চল। লেখকের নিজের ভাষায়,

"বর্ষাকালে এঘর থেকে ওঘর যেতে নৌকো লাগত।"[১]

পিতা ফণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, মাতা গায়েত্রী দেবী। তাঁরা দুজনেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। ফলে বাড়িতে প্রায়ই সাধু-সন্ত, জ্যোতিষী-তান্ত্রিকদের ছিল

অবাধ যাতায়ত। তাঁর বাড়ির পরিবেশটা ছিল বেশ পড়ুয়া ধরণের। তাঁর বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা সবাই খুব পড়তেন। আর বাড়িতে অনেক বই থাকার কারণে খুব ছোটোবেলা থেকেই তাঁর পাঠাভ্যাসও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ছোটোদের বই পড়ার ব্যাপারে অনেক পরিবারে নানান রকম বিধিনিষেধ থাকলেও তাঁর পরিবারে কিন্তু তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অবশ্য এ ব্যাপারে বাবা-মার উদারতাই তাঁকে দিয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। তিনি বাল্যকাল হতেই বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখের লেখা পড়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন সর্বভুক পাঠক। এ বিষয়ে তিনি 'আত্মকথা'য় জানিয়েছেন,

> "আমি ছিলাম আগ্রাসী পাঠক। বিশ্বসাহিত্যের অনেক মণি-মাণিক্যিই আমার ঝুলিতে আছে। আমি ক্লাসিকাল সাহিত্য পড়েছি, পাশাপাশি পড়েছি থ্রিলার। আমার বাবাও একটা সময় খুব থ্রিলার পড়তেন। বাবা আমাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে প্রচুর থ্রিলার কিনেছিলেন। আমি যখন ছুটিতে শিলিগুড়ি যেতাম তখন এসব বই পড়তাম। মনে আছে বাবা কিনেছিলেন 'The Complete Plays of Bernard Shaw'। কোনো এক ছুটিতে গিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম বার্নাড শ এর সব নাটকগুলো। পড়তে আমার খুব ভালো লাগত।"[২]

কথাসাহিত্যের জগতে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন ছোটোগল্পকার হিসাবে। প্রথম ছোটোগল্প 'জলতরঙ্গ' (১৯৫৯) যখন 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর। সাহিত্য জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে কবিতা লেখা শুরু করলেও সাহিত্য জগতে তিনি মূলত কবি হিসাবে পরিচিত হতে পারেননি; পাঠকমহলে তিনি পরিচিত হয়ে আছেন স্বাধীন ভারতের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় কথাশিল্পী হিসাবে। শীর্ষেন্দু অল্প বয়সে কলম ধরলেও তা কিশোরদের জন্য ছিল না, ছিল বড়দের জন্য। বড়দের সাহিত্য রচনা করে জনপ্রিয় হওয়ার বেশ কিছু বছর পর ছোটোদের সাহিত্যে হাত দেন। তিনি মনে করতেন ছোটোদের জন্য লেখা একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ছোটোদের মনের কথা তাদের মনের মতো করে পরিবেশন করতে না পারলে, তা অপাংক্তেও হয়ে যায়। তাই শীর্ষেন্দু কখনও ভাবেনও নি যে তিনি কোনোদিন শিশু-কিশোরদের জন্য লিখবেন। কিন্তু 'আনন্দমেলা'র তৎকালীন সম্পাদক কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুরোধেই

তিনি ছোটোদের জন্য লেখালেখি শুরু করেন। কবি নীরেন্দ্রনাথের মতে বড়োদের জটিল, মনস্তাত্ত্বিক জীবন-জীজ্ঞাসায় দিন দিন কলমে যে নোংরা জমছে, তা শুদ্ধ করা উচিৎ। একমাত্র ঈশ্বররূপী ছোটোদের জন্য লেখার মধ্য দিয়েই সেই নোংরা পরিষ্কার হতে পারে। এ সম্পর্কে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আত্মকথা'য় বলেছেন,

> ''আমি অরিজিনাল কিশোর সাহিত্যিক নই। শিশু সাহিত্য কখনও রচনা করব বলে ভাবিওনি। আমার মনেও কখনও হয়নি তা পারব বলে। তারপর ১৯৭৫-৭৬ সালে যখন যাদবপুরে থাকি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তখন 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক। উনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। খাওয়াদাওয়া করলেন। তারপর আমাকে তিনি হঠাৎ বললেন 'তুই আনন্দমেলার জন্য একটা গল্প দে।' আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভয় পেয়ে বললাম, 'নীরেনদা, আমি কখনো লিখিনি বাচ্চাদের জন্য। আমার মানসিক দিকটাই তৈরি হয় নি বাচ্চাদের জন্য লিখব বলে।' উনি বললেন 'লেখ না একটু চেষ্টা করে।' ওই একটা গল্প লিখলাম 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক'। নীরেনদার ভালো লাগলো। আবার বললেন, 'এবার আর একটা লেখ।' আর তারপরেই বললেন 'উপন্যাস লেখ।' আমি তো আরও ভয় পেয়ে গেলাম। বাচ্চাদের উপন্যাস। গল্প তবু ঠিক আছে, উপন্যাস আমি কি করে লিখব। তারপরে লিখলাম 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। তারপরে দেখেছি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সেই যে শুরু হল আজ অব্দি চলছে; তবে কিশোরদের জন্য লেখালেখি আমার নীরেনদার জন্যই হয়েছিল।''[৩]

অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অল্প বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করলেও ছোটোদের জন্য লিখতে শুরু করেন সাহিত্যে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর কুড়ি পরে। ১৯৭৫-৭৬ সালে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তাগিদে লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ছোটোদের জন্য লেখার অনুপ্রেরণা অনুভব করেন। কিন্তু ছোটোদের জন্য লিখতে গিয়ে শীর্ষেন্দু প্রথম যে সমস্যায় পড়েন তা হল বিষয়ের অভাব। আমরা আগেই বলেছি যে, শীর্ষেন্দু মনে করতেন, ছোটোদের জন্য রচিত সাহিত্য ছোটোদের মনের মতো না হলে তা অপাংক্তেয় হয়ে যায়। এই কারণে তিনি সাহিত্যজীবনের

শুরুর দিকে ছোটোদের রচনায় হাত দেন নি। কিন্তু পরবর্তীতে লিখতে হওয়ায় তিনি নানারকম চিন্তা-ভাবনা করে আকর্ষণীয় সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন কিশোর সাহিত্যে। এমনই এক চিন্তা-ভাবনার ফসল স্বরূপ সাহিত্যে জায়গা করে নেয় ভূত-প্রেতেরা। এপ্রসঙ্গে লেখক কৃত্তিবাস পত্রিকায় জানিয়েছেন,

> "...আমি কোনো দিন ছোটোদের লেখা লিখব বলে ভাবিনি। জীবনের অন্তত প্রথম কুড়ি বছর ছোটোদের জন্য কিছু লিখিনি। তারপর যখন লিখতে শুরু করলাম, তখন আমার বিষয়ের অভাব হল। কী লিখব ছোটোদের জগৎ নিয়ে? আমি তো সেটা চিনিই না। তখন আমি মাথা থেকে নানা রকম চিন্তা করে ভূতকে আমদানি করলাম। আর মজা করতে আমি ভালোই বাসি। তাই ভূতকে নিয়ে মজা করতে শুরু করলাম। এইভাবে 'গোঁসাইবাগানের ভূত' লেখা হল। এরপর 'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক' লেখা হল। এই ভাবে আস্তে আস্তে ভূতটা আমার ব্র্যান্ডের মতো হয়ে গেল। ভয় পাওয়ানো ভূত আমি পছন্দ করি না।"[৪]

সুতরাং, বড়দের সাহিত্যাকাশে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কিশোরসাহিত্যে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করেন সত্তরের দশকে। এরপর যত দিন এগিয়েছে ততই তিনি কিশোরসাহিত্যে গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কিশোরদের মনের মতো করে যে কোনো বিষয় নিয়ে স্বচ্ছ, সুন্দর, স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। তবে বাংলা কিশোর সাহিত্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ পরিচিতি মজাদার ভূতের সার্থক রূপকার হিসেবে। তিনি নিজে ভূতের পাল্লায় পড়েছেন বহুবার। আর সেসব ভূত মোটেই সুবিধার ভূত ছিল না, তারা রীতিমত সব ভয়ঙ্কর ভূত। কিন্তু ছোটোদের জন্য সৃষ্ট ভূতেদের তিনি কখনোই ভয়ঙ্কর করে আঁকতে চান নি। এঁকেছেন মানুষের উপকারী বন্ধু হিসাবে। শীর্ষেন্দুর লেখা এমন এক কিশোর উপন্যাস হল 'গোঁসাইবাগানের ভূত'। যেখানে ভূত ও মানুষের বন্ধুত্বের ছবি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'গোঁসাইবাগানের ভূত' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। অদ্ভুত এবং ভুতুড়ে কাণ্ডের সমাহারে এক চমকপ্রদ কাহিনি উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। প্রধান চরিত্র বুরুন বার্ষিক পরিক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে ভালো নাম্বার পেলেও অঙ্কে তেরো পেয়ে একেবারে বোকা

বনে গেছে। ফলস্বরূপ তাই রাগী ডাক্তার বাবা অঙ্ক শিখতে বুরুনকে পাঠায় আড়াই মাইল দূরে করালী মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি কামরাডাঙায়। শুধু তাই নয় এবার থেকে তার নিজের কাজ সব নিজেকেই করতে হবে। এতেও সে তেমন অপমান বোধ করেনি। কিন্তু পোষা পাখির মুখে তার অঙ্কে তেরো পাওয়ার শ্লোগান শুনে সে সত্যিই প্রচণ্ড রেগে যায়। তারপর একসময় কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা গোঁসাই ডাকাতের বাগানে এসে ঢুকে পড়ে। সেখানে পরিচয় হয় নিধিরাম ভূতের সঙ্গে। বুরুন দেখে নিধিরাম জলের উপর কেমন সুন্দর পা ফেলে দিব্যি হেঁটে চলে এল। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা মোটেই সম্ভব নয়। হয় দেবতা, নয় অপদেবতা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা শক্তির গুণেই এমন কর্ম সম্ভব। তাই বুরুনের পক্ষে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বুরুনের মনটা এতই খারাপ যে আর কোনো কিছুকেই সে ভয় পাচ্ছে না। এদিকে নিধিরামও বুরুনকে ভয় পাওয়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কখনও জলের উপর হাঁটছে তো কখনও নিজের মুণ্ডুটাকে টুপির মতো খুলে নিয়ে আবার যথাস্থানে লাগিয়ে রাখে। বুরুনকে ভয় খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে বলে,

"মাথায় খুব উকুন হয়েছে কিনা তাই চুলকোচ্ছে।"[৫]

বুরুন এতেও ভয় না পেয়ে শুধু 'ও।' বলে প্রসঙ্গটাকে শেষ করে দেয়। নিধিরাম তাতে বেজায় চটে যায়, চোখের সামনে ভূত দেখেও যে এমন নির্বিকার ভাবে কুল খেতে পারে তা নিধিরামের জানা ছিল না। সে বুরুনকে জানায় এটা ইয়ার্কি নয়, ম্যাজিকও নয়। সে এই জঙ্গলের দুশো বছরের পুরোনো ভূত। তাতেও বুরুন ভয় না পাওয়ায় নিধিরাম মরিয়া হয়ে তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টায় নিজের ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতটা খুলে নিয়ে চারিদিকে তলোয়ারের মতো ঘোরাতে লাগল, একইরকম ভাবে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত খুলে নেয়। দুটো পা দুহাতে খুলে নিয়ে দেখায়। একবার অদৃশ্য হয়ে ফের হাজির হয়ে দেখাল। কখনও তেরো-চোদ্দো ফুট লম্বা তো কখনও আবার হোমিওপ্যাথির শিশির মতো ছোট্ট হয়েও বুরুনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও বুরুনকে ভয় দেখাতে না পেরে শেষে অসহায়ভাবে ছলছল চোখে বুরুনের দিকে চেয়ে থাকে।

মানুষের সমাজের মতো ভূতেদেরও সমাজ আছে। তাতে মানুষদের মতোই আছে আচার-বিচার, নিয়ম, রীতি, নীতি। ভূতকে সর্বদাই মানুষ ভয় পায়। সেই হিসাবে ভূতেদেরও নিজেদের সমাজে মান-মর্যাদা আছে। উঁচু, নীচু শ্রেণি বিভাজন আছে। তাই ভূত হওয়া সত্ত্বেও নিধিরামকে বুরুন ভয় না পাওয়ায় নিধিরাম কাঁদো কাঁদো স্বরে বুরুনকে বলে,

> "তুমি আমাকে বড় মুশকিলে ফেললে দেখছি। এখন নিজেদের সমাজে আমি মুখ দেখাব কেমন করে বলো তো! গোঁসাই সর্দার শুনলে আমার গর্দান যাবে।"[৬]

শুধু তাই নয়, এর জন্য নিধিরামকে গোঁসাইবাবা তার বর্তমান পোস্টের থেকে নীচু পোস্টে নামিয়ে দেবে এবং তার মাথা কেড়ে রেখে দেবে। তখন ভূত সমাজের কেউ আর নিধিরামকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে না। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিধিরামকে অন্য ভূতেরা দুয়ো দিতে থাকে। অপমানে, দুঃখে নিধিরামের চোখ ফেটে জল আসে। কিন্তু তাও চেষ্টা করতে ছাড়ে না। সর্বদা বুরুনের উপকার করে। নিজে সবসময় বুরুনের সঙ্গে থাকতে না পেরে সে তার অনুচরদের বুরুনের আশে পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের তথা নতুন ভূত, আনাড়ি ভূত, ভিতু ভূত, গাড়োল ভূত, পাগল ভূত, সাধু ভূত, চোর ভূত প্রত্যেককে বলা আছে যে বুরুন ডাকলেই যেন তক্ষুনি তাকে খরব দেওয়া হয়। ভূত হয়েও সর্বদা ভয়ে তটস্থ হয়ে থেকেছে নিধিরাম। শুধুমাত্র বুরুনকে ভয় খাওয়ানোর জন্য। এছাড়াও এ উপন্যাসে পাই খোনাসুরকে। সেও বুরুনের বন্ধু। বেশ মজার ভূত এই খোনাসুর। হাবু যে বশীকরণ মন্ত্র দিয়ে বুরুন ও ভুতুমকে আটকে রেখেছে সেকথা বুরুনের দাদু রামকবিরাজকে প্রথম জানাই ওই খোনাসুরই। আর জানাতে এসে কবিরাজ মশাইয়ের কাছে নিজের গা-গতরের ব্যথার খানিকটা ওষুধও নিয়ে যায়। হাবুর নামে গাল-মন্দ করে যায় রামকবিরাজের কাছে। এ যেন আমাদের সমাজের আর পাঁচটা সাধারণ মানুষেরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে খোনাসুরের মধ্য দিয়ে।

উপন্যাসটি নিয়ে সিনেমা করেন পরিচালক নীতিশ রায় ও প্রযোজক মৌসুমী রায়চৌধুরী। ২০১১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর একই নামে ছবিটি মুক্তিলাভ করে।

এমন ভালোমানুষ আর মজাদার সব ভূতের ছবি শীর্ষেন্দুর অন্যান্য ভৌতিক কিশোর উপন্যাসগুলিতেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেখানে ভূত ও মানুষের সম্পর্ক নিবিড়ভাবে ধরা পড়েছে। এখানে আরও একটি বিষয় ধরা পড়েছে যথা, ভূতকে মানুষ নয় বরং মানুষকেই ভূত ভয় করেছে। এমন সব মজাদার ভূত হল 'হেতমগড়ের গুপ্তধন' উপন্যাসের নন্দকিশোর মুন্সীর ভূত, 'ঝিলের ধারে বাড়ি' উপন্যাসের কুলদা চক্রবর্তীর ভূত, 'বিপিনবাবুর বিপদ' উপন্যাসের পীতাম্বরের ভূত, সে তো নিজে ভূত হয়েও আরেক ভূতের ভয়ে মরিয়া; 'টুপি' উপন্যাসের ঝিকু বিশ্বাসের ভূত ইত্যাদি। 'হেতমগড়ের গুপ্তধন' উপন্যাসে নন্দকিশোর মুনসির ভূত জানায় যে, ছেলেবেলায় কত সে ভূতের ক্ষমতার গল্প শুনেছিল; ভূতেরা নাকি লম্বা হাত বাড়িয়ে বাগান থেকে লেবু ছিঁড়ে আনতে পারে, তারা নাকি মাছভাজা খায়, মানুষের ঘাড় মটকায়। কিন্তু নন্দকিশোর নিজে ভূত হওয়ার পর জানতে পেরেছে এসবই মিথ্যে কথা। অর্থাৎ ভূতের কানাকড়ি ক্ষমতাও নেই। এইভাবেই লেখক ভূত সম্পর্কে বহু প্রচলিত মিথ্যে ধারণাকে বিশেষ করে ভূতের ভয়ঙ্কর রূপকে বিসর্জন দিয়ে তাদের সহজ-সরল রূপকে এনে পাঠকের ভয় ভাঙতে চেয়েছেন। ভূতের কোনো অতিরিক্ত ক্ষমতা নেই; একথায় লেখক ছোট্ট ছোট্ট পাঠকদের মন থেকে যেমন ভূতের ভয়কে চিরতরে ভেঙে দিয়েছেন তেমনি আবার ভূতেরদেরও দুঃখের দিকটি দেখাতেও ভোলেননি। তাই তো নন্দকিশোর মুন্সীর ভূত বহু আক্ষেপ করে মাধবকে জানিয়েছে,

> "দূর দূর! ডাহা মিথ্যে। ভূত হওয়ার পর আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি ভূতেদের কানাকড়ি ক্ষমতা নেই। বাতাসের মতো ফিনফিনে শরীর নিয়ে কিছু করা যায় মশাই? আপনিই বলুন!"[৭]

অর্থাৎ লেখক ছলে, বলে, কৌশলে বুঝিয়ে দেন যে ভূতকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের রচনায় ভূত হয়ে উঠেছে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো। যারা সুখ-দুঃখে সবসময় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কখনও বা নিজেদের সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছে মানুষের কাছে। তবে লেখক ভূতকে সাহিত্যে এমন ভাবে উপস্থাপন করলেও নিজের কিন্তু ছিল খুব ভূতের

ভয়। তিনি স্বচক্ষে ভূত দেখেও ছিলেন। সেসব ভূত সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর। তিনি তাঁর ভূত দেখার অভিজ্ঞতা স্বীকার করে জানিয়েছেন,

> "কাটিহারেই ঘটেছিল অবিস্মরণীয় সেই ঘটনা। নিশুতি রাতে একদিন আমার ঘুম ভেঙে গেল। আর শুনলাম মেমসাহেবের হাই হিলের শব্দ, পিছনের বাগান দিয়ে হেঁটে এসে আমাদের ডাইনিং হলে ঢুকে ডাইনিং টেবিলের চারপাশে কয়েকবার চক্কর দিয়ে ফের ফিরে চলে গেল। কি ভয় যে পেয়েছিলাম তা বলার নয়। তারপর থেকে কিছুদিন বাদে বাদেই ওই একই ঘটনা। আর এই ঘটনা পরবর্তী পাঁচ-ছয় বছর ধরে ঘটে চলল। যার ব্যাখ্যা আমার বুদ্ধির অতীত।"[৮]

লেখকের এমন ভূতের ভয় থাকা সত্ত্বেও নিজ সাহিত্যে ভূতকে অমন মজাদার করে উপস্থাপন করার অন্যতম কারণ হল, শিশু-কিশোরদের মন থেকে ভূতের ভয়কে চিরতরে বিনাশ করা। আসলে তিনি নিজে ভূতকে যেভাবে চিনেছেন, ছোটো পাঠকদের তেমনভাবে চেনাতে চাননি। ভূতকে তাদের বন্ধুরূপে দেখিয়েছেন। ভূতকে এমন মানবিক করে উপস্থাপন করার কারণ হিসাবে এক পত্রিকায় তিনি জানান,

> "ভয় দেখানো ভূতকে নিয়ে লিখতে ইচ্ছে হল না। ভূত আমার কাছে সুপারহিরো চরিত্র। সাধারণ মানুষ যা করতে পারে না, ভূত তাই করে। ভূত মজাও করে। বাচ্চারা এটা পছন্দ করছে খুব।"[৯]

ভূতের ভয়ের যে ক্ষতিকর প্রভাব লেখকের জীবনে পড়েছিল তা ছোটদের উপরেও পড়ুক এটা কখনই চান নি। তাই লেখার ক্ষেত্রে নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে তেনাদেরকে একেবারে মানবিক করে গড়ে তুলেছেন। কখনো রাজাগজা তো কখনও আবার ভোলাভালা করে উপস্থাপন করেছেন। যারা বেশিরভাগ সময় মানুষের উপকার করেছে। যেমন 'ছায়াময়' উপন্যাসে দেখি ছায়াময় ওরফে চন্দ্রকুমারের ভূত সাহায্য করেছে ইন্দ্রজিৎপ্রতাপকে। মানব সমাজের অনুসারী যে ভূত সমাজ, তা শীর্ষেন্দুর অনেক লেখাতেই উঠে এসেছে। যেমন ধরা পড়েছে তাঁর 'ঝিলের ধারে বাড়ি' উপন্যাসেরর ভূত কুলদা চক্রবর্তীর মধ্যে। কুলদা চক্রবর্তী জীবিত অবস্থায় চতুর্ভুজের মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। সেই অবস্থায় মন্দিরে নরবলি দিতে যাওয়ার অপরাধে নবীনের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠপুরুষ কালীচরণ তাকে মন্দির থেকে

বের করে দেন। তারপর থেকে একদিনও তিনি ওই মন্দিরে ঢুকতে পারেননি। কিন্তু ভূত হওয়ার পরেও তিনি চতুর্ভুজের মন্দিরের পুরোহিতের পদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। আসলে ভূত লেখকের কাছে মৃত্যু পরবর্তী ক্ষমতাশালী মায়াবী চরিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই তেনাদের ভয় নয় বরং বন্ধু ভাবতে শিখিয়েছেন পাঠকদের। ভূত ও মানুষ হয়ে উঠেছে যেন একে অপরের পরিপূরক।

উপসংহারে বলা যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট সমস্ত ভূত উপকারী মানববন্ধু। তারা মানুষদের বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে না। বরং বিপদে আপদে তেনারা মানুষদের সহায়তা ও সাহচর্য দান করে থাকে। ভূতেদের এমন ভাবে চিত্রিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় চেয়েছেন যে কিশোর কিশোরীরা ভৌতিক গল্প উপন্যাসের রহস্য-রোমাঞ্চকর, শিহরণ জাগানো নির্ভেজাল মজা উপভোগ করুক। আসলে ভূতের ভয়াল, ভয়ঙ্কর রূপ অপরিণত শিশু-কিশোরদের মনে যাতে স্থায়ীভাবে না বাসা বাঁধে তার জন্যই তিনি ভূতকে মজাদার করে তুলেছেন। কারণ ভয়ের জন্য তাদের শুধু সারাজীবন ভীরু অপবাদই সইতে হবে এমন নয়, সেইসঙ্গে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশেও বিঘ্ন ঘটবে। তাই ভয় পাওয়ানো ভূতকে তিনি একেবারেই বিসর্জন দিয়ে সাহিত্যে মজাদার ভূতেদের আমদানি করেছেন। ভূত সম্পর্কে আদিকাল থেকে সমাজে প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে এক লহমায় ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করেছেন শীর্ষেন্দু। অশুভ শক্তিকে শুভ শক্তিতে পরিণত করে সামাজিক বদল ঘটাতে চেয়েছেন লেখক। মানুষের সংস্কারের চাকাকে উলটো পথে ঘুরিয়ে বিশ্বাসের বদল ঘটিয়েছেন তিনি। এখানেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প উপন্যাসের অনন্যতা।

তথ্যসূত্র:

১. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আত্মকথা, আমার জীবনকথা, অশোকগাথা পাবলিকেশন, কলকাতা বইমেলা, ২০১৯, ভূমিকা অংশ।
২. তদেব, পৃ-৬১

৩. তদেব, পৃ-৪৬।
৪. বীজেশ সাহা, সম্পাদিত, কৃত্তিবাস, একটা গোল অথবা চৌকো টেবিলের আড্ডা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ২০২২, পৃ-২৫
৫. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কিশোর উপন্যাস সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৯, পৃ-১০৭
৬. তদেব, পৃ-১০৮
৭. তদেব, পৃ-১৮৮
৮. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আত্মকথা, আমার জীবনকথা, অশোকগাথা পাবলিকেশন, কলকাতা বইমেলা, ২০১৯, ভূমিকা অংশ।
৯. বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, পৃ-১২৭-১২৮

গ্রন্থঋণ:

১. আসরফী খাতুন, সম্পাদিত, বাংলা শিশুসাহিত্য: সেকাল ও একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জুন ২০১৯
২. প্রবীর প্রামাণিক, সম্পাদিত বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য আধুনিক বিচার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, বইমেলা, ২০১০
৩. মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদিত, সবুজপাতা-২, শিশুকিশোর অকাদেমি, দ্বিতীয় শিশুকিশোর উৎসব, ২০১০
৪. ড. মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী, বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তন (১৯৫০-২০০০) পত্রলেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১১

পত্র-পত্রিকা:

১. অশোকনগর পত্রিকা, অভিষেক চক্রবর্তী, সম্পাদিত, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, দশম বর্ষ, নবম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৫।
২. লালপরি নীলপরি, আসরফী খাতুন, সম্পাদিত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শিশুসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, ২০২০।

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 382-399
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.027

ঔপনিবেশিক আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক একটি পর্যালোচনা

মেহেবুব হোসেন, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.11.2024; Accepted: 29.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Social and economic growth largely depends on people's health. Through this paper an attempt has been made to give an idea about the public health condition of Murshidabad district during the colonial era. Many changes were seen in the field of public health and medical care system in India during the period of study. This time the people's health condition of India deteriorated because various contagious and infectious diseases were seen again and again as epidemic form. The situation of Bengal was immensely pathetic. The people of Murshidabad district also experienced with various types of diseases during the period of study. According to various sources the people's health condition of Murshidabad had deteriorated drastically since the beginning of the nineteenth century. The trade city of Cossimbazar and its neighboring urban areas were depopulated by the epidemic cholera, malaria etc. Horrible images of fever, cholera can be seen in the various medical reports, census report, sanitary commission's reports and governmental documents. Western

*medicines such as allopathic and homeopathy were introduced under the government patronage to combat grim diseases like cholera, malaria, smallpox, kala-azar, plague, etc. This period also saw the conflict of interest between indigenous medical science and western medicine. Government's health policies were conducted in the con*text of imperialist attitude and were basically city centric.

Keywords: Health, Diseases, Colonial, Bengal, Murshidabad.

স্বাস্থ্য এমনই একটা বিষয় যার উপরে মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ নির্ভর করে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়লে শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হয়। শরীর বিনাশকারী নানান রোগ ব্যাধি বিভিন্ন সময়ে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকেই মানুষ বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির সম্মুখীন হয়েছে এবং সেগুলো থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে নানান কৌশলও অবলম্বন করেছে। এটা মনে করা হয় যে মানুষ শুরুতে এই বিষয়ে পশুদের অনুকরণ করেছিল।[১] ক্রমে মানুষের মধ্যে বৈঙ্গানিক চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটলে আবিষ্কৃত হয় নানান ধরনের প্রতিষেধক ঔষধ। প্রথম প্রথম মানুষ বিভিন্ন গাছ, লতা পাতার মত ভেষজ এবং আধ্যাত্মিক উপায় অবলম্বন করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করত। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা গুলোতে প্রাচীন কাল থেকেই বিকশিত হয়েছিল ভিন্ন চিকিৎসা ধারা। বৈদিক যুগে ভারতে ভেষজ চিকিৎসা আয়ুর্বেদের বিকাশ ঘটেছিল যেটি ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতি গুলোর মধ্যে অন্যতম। আয়ুর্বেদ কথার অর্থ হল আয়ু সম্মন্ধীয় বিজ্ঞান।[২] বেদে এই চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়ে বর্ণনা আছে। একটা সময় রোগ ব্যাধি ও তার চিকিৎসা ছিল একান্তই ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানান পটপরিবর্তন ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উত্থানের

[১] P.K.. Sanyal, *A Story of Medicine & Pharmacy in India,* Navana Printing Woks Pvt. Ltd., Calcutta, 1964, p. 31-32.

[২] সুব্রত পাহাড়ি, *উনিশ শতকের বাংলায় সনাতনী চিকিৎসা বাবস্থার স্বরূপ,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, p. 2.

মাধ্যমে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে রুপান্তরিত হয় এবং জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে রাষ্ট্রের মাথা ব্যাথা শুরু হয়।

ভারতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাস আলোচনা বিভিন্ন দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন বহুমুখী পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল তেমনই জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল আমুল পরিবর্তন। এই সময়ে কলেরা, ম্যালেরিয়া, গুটিবসন্ত ও কালাজ্বরের মত রোগগুলো বারংবার মহামারী হিসেবে দেখা গিয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল।[৩] অতীতে এই সমস্ত রোগ গুলো এতটা ভয়াবহ আকারে কখনও দেখা যায়নি। এই সময়ে বাংলার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। কলেরা ও ম্যালেরিয়ার মত রোগ গুলো ছিল বাঙালির নিত্য সঙ্গী। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সমস্ত রোগ ব্যাধি গুলোর বাড়বাড়ন্ত এই সময়ে কেন এত বেশি ছি?- বাংলার পরিবেশ কি এর জন্য দায়ী ছিল, নাকি ঔপনিবেশিক সরকারের নীতি? - ঔপনিবেশিক সরকার সব সময়ই রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য ভারতীয়দের এবং এখানকার পরিবেশকে দায়ী করে গেছেন। এটা ঠিক যে এই সময়ে বাংলার পরিবেশ খারাপ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এই সময়ে কেন এখানকার পরিবেশ খারাপ হয়ে পড়লো সেই বিষয়টাকে তাঁরা নানান কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৪] ঔপনিবেশিক সরকার এই সমস্ত রোগ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিমি চিকিৎসা পদ্ধতি এলোপ্যাথির প্রচলন করেছিল, প্রচলন ঘটেছিল হোমিওপ্যাথিরও। কিন্তু এলোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি যথেষ্ট ব্যায় বহুল হবার দরুণ তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে ছিল। সর্বপরি দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি গুলোকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পুনম বালা, ডেভিড আর্নল্ড ও অনিল কুমারের মত ঐতিহাসিকরা ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা

---

[৩] Arabinda Samanta, *Living With Epidemics in Colonial Bengal,* Routledge, New York, 2018.

[৪] Mehebub Hossain, 'Health and Environment in the Nineteenth Century Murshidabad', *Proceeding of the Bihar History Congress (2022),* Bhagalpur, p. 224.

পদ্ধতির প্রচলনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী মানষিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করেছেন।[৫] ভারতীয় প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি গুলোর প্রতি ব্রিটিশদের মানসিকতা শুভ ছিলনা। যদিও কোম্পানি শাসনের শুরুর দিকে উইলিয়াম জোন্স প্রমুখদের উদ্যোগের কারণে প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদি সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ও ভারতীয় ভেসজ দ্রব্যাদির গুনাগুন বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। উইলিয়াম জোন্স নিজে 'Botanical Observation of Select Indian Plants' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[৬] এই বিষয়ে কিছুটা গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে কোম্পানি সরকার ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইন প্রবর্তনের সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকার কিছু অংশ এদেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ব্যায় করার কথা ভেবেছিল। যাইহোক এই প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিবাদের কারণে।

ঔপনিবেশিক আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার জনস্বাস্থ্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে প্রেসিডেন্সি বিভাগ তথা বাংলার অন্যান্য জেলা গুলোর মত এই জেলাতেও কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও গুটিবসন্তের মত রোগ গুলো ছিল জনস্বাস্থ্যের মূল সমস্যা। তথাপি জনগনের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে সরকারি উদাসীনতাও লক্ষ্য করা গেছে। কখনও কখনও পরিবেশ গত কারণ যেমন নদীর গতিপথের পরিবর্তন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মত বিষয় গুলো জেলার জনস্বাস্থ্যকে সমস্যার সম্মুখীন করেছিল।[৭] ভাগীরথী নদীর পূর্ব প্রান্তের বাগড়ি অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হত ফলে জল জমে থাকার কারণে জ্বর ব্যাধি ও বিভিন্ন চর্ম রোগ দেখা যেত। এই অঞ্চলটিতে যেমন বেশ কিছু নদী রয়েছে তেমনই রয়েছে অসংখ্য বিল যেগুলোর

---

[৫] See- David Arnold, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth Century India*, Oxford University Press, Delhi, 1993; Poonam Bala, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio- Historical Perspective*, Sage Publications, New Delhi, 1991.

[৬] সুব্রত পাহাড়ি, *op. cit.*, p. 28.

[৭] L.S.S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1914, p.81.

বেশিরভাগই নদীর পরিত্যক্ত খাত, তাই বর্ষার সময় এই এলাকাটিতে জল জমে থাকতো। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই জেলার মানুষ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।[৮] যদিও ইংরেজ শাসনের শুরুতে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় জেলার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ উজাড় হয়ে গিয়েছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছিল বলে কবিতা রায় উল্লেখ করেছেন[৯] এবং এই সময়ের বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র গুলোতে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অসংখ্য ব্রিটিশ সৈন্যের মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায়। যদি আমরা এই দুর্ভিক্ষের সময়কালটার কথা না বলি তাহলে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত জেলার পরিবেশ মোটামুটি ভাবে স্বাস্থ্যকর ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

একটু পিছনের দিকে দৃষ্টি রাখলে দেখা যাবে যে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই কাশিমবাজারে একে একে ইংরেজ, ডাচ, ফরাসি ও আর্মেনিয়ানরা বানিজ্য কুঠি নির্মাণ করেছিল। পলাশির যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ১৭৬৫ সালে বহরমপুরে ব্রিটিশদের সেনানিবাস নির্মাণ এটা প্রমাণ করে যে ওই সময়কালে জেলাঞ্চলের পরিবেশ বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল।[১০] LSS O' Malley এর মতে ১৮১৪ সালে ভাগীরথী নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হলে বানিজ্য কেন্দ্র কাশিমবাজার ও তার আশেপাশের এলাকার মানুষ গুলো ব্যপক ভাবে ম্যালেরিয়া ও কলেরার মত রোগের স্বীকার হয়েছিল। যার ফলে এই সময়ে এই এলাকাটা প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। মির্জাপুর, বরানগর এই সমস্ত

---

[৮] Mehebub Hossain, 'Health and Environment in the Nineteenth Century Murshidabad', *Proceeding of the Bihar History Congress (2022),* Bhagalpur, p. 225.

[৯] Kabita Ray, *History of Public Health in Colonial Bengal 1921-47,* Calcutta, K.P. Bagchi & Co., 1998. p. 96.

[১০] B.B. Mukherjee, *Final Report on the Survey and Settlementy Operations in the district of Murshidabad: 1924-32,* Alipur,1938, p.3 ; বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শঙ্কর ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস মুর্শিদাবাদ জেলা গেজিটিয়ার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,মুর্শিদাবাদ , ২০০৩. p. ৫০৭.

এলাকা গুলোও আক্রান্ত হয়েছিল।[১১] যদিও ১৮০৩ সালেই একবার কাশিমবাজারে ভয়াবহ আকারে জ্বর ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু এতে কত সংখ্যক মানুষ মারা গিয়েছিল সে বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় না। ১৮৩৯ সালে ভাগীরথী নদী যখন পুনরায় গতিপথ পরিবর্তন করে তখন কাসিমবাজার ও তার আশেপাশের এলাকা গুলো পুনরায় অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। ইংরেজদের বানিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাঁরা এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য বহরমপুর সেনানিবাস থেকে সাধারণ ব্রিটিশ সেনাদের সরিয়ে নিয়েছিল এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত সেখানে কেবলমাত্র কয়েকজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ সেনা অফিসারই ছিল।[১২]

১৮৫১ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে প্রচুর সংখ্যক মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ ডিসপেনসারিতে আসছিল বলে সিভিল সার্জেন A. Kean উল্লেখ করেছেন।[১৩] অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে গ্যাস্ট্রেলের *Geographical and Statistical Accounts of Murshidabad (1860)* গ্রন্থেও। তিনি ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং মুর্শিদাবাদ শহর ও তার আশেপাশের এলাকা গুলো কলেরা ও ম্যালেরিয়া প্রবন ছিল বলে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় যখন ভাগীরথী নদীর জল প্রায় শুকিয়ে যেত তখন ভাগীরথী কাশিমবাজারের কাছে অবস্থিত ঝিলের জলকে নিজ দেহে টেনে নিত, শুখার সময়ে নদী প্রায় বদ্ধ জলাশয়ে পরিনত হত তখন নদীর তীরবর্তী এলাকা গুলোতে রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যেত।[১৪] স্থানীয় বাসিন্দারা ঝিলের জলকেই দুর্দশার কারণ বলে মনে করত। আধ-পোড়া মৃত দেহ গুলোকে যখন তাতে ফেলা হত তখন জায়গাটা আরো অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ত। স্যানিটারি কমিশনের প্রথম রিপোর্টে বহরমপুর শহরের স্বাস্থ্য অবস্থার

---

[১১] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, 'Malaria in Colonial Murshidabad', *Kanpur Philosophers, Vol. IX, Issue II*, 2022, p. 658.

[১২] Ibid. p., 659.

[১৩] A. Kean, *Half Yearly Reports of the Government Charitable Dispensaries (Oct- 1851-March 1852),* Carbery Military Orphan Press, Calcutta, 1853, p. 63.

[১৪] L.S.S. O' Malley, *op. cit.,* pp. 81-82.

যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখানো হয়েছে যেসকল এলাকায় ইউরোপিয়ানরা বসবাস করত সেই এলাকা গুলো বেশ স্বাস্থ্যকর ছিল কেননা ইউরোপীয়ানরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলত। অন্যদিকে স্থানীয় জনগণের বসবাসের এলাকা গুলোতে রোগব্যাধির প্রাচুর্য ছিল। কলেরা রোগটি বহরমপুরে প্রতিবছর দুটি পর্যায়ে নিয়মিত ভাবে দেখা যেত, গ্রীষ্মের শুরুতে যথা- মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে এবং আর একবার শীতের শুরুতে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যখন ভাগীরথী নদী স্রোতবিহীন হয়ে বদ্ধ জলাশয়ে পরিনত হত।[১৫] ১৮৭০ সালের মার্চে কলেরা প্রথমে বহরমপুরে হালকা ভাবে দেখা যায় এর পর কিছুদিনের মধ্যেই রোগটি গোকর্ণ, দেওয়ানসেরায়, আসানপুর, সুতি, জলঙ্গী, রঘুনাথগঞ্জ, সুজাগঞ্জ ও মানুল্লাবাজারে দেখা যায়। ১৮৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেও জেলায় কলেরা রোগ ৫২৫ জনের প্রাণ কেড়েছিল, এই সময়ে আজিমগঞ্জে কলেরা দেখা দেওয়ার কারণ হিসেবে পচা ইলিশ মাছ ভক্ষণ করাকে দায়ী করা হয়েছিল।[১৬] ১৮৭৩ সালে বাংলায় কলেরা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তার প্রভাব পড়েছিল বিশেষ করে ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের রাঢ় অঞ্চলে। ওই বছরে জেলায় প্রত্যেক মাসেই কলেরা রোগে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং মোট ১৩৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই একই বছরে জেলায় গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৯৪ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।[১৭]
উনিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলায় 'বর্ধমান জ্বর' নামক যে মহামারী দেখা গিয়েছিল সেই জ্বরের প্রভাব মুর্শিদাবাদ জেলাতেও ছিল। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের কিছু অঞ্চল যেমন কান্দি ও ভরতপুরে এর প্রভাব ছিল বেশি। এই সময় অজয় নদের উত্তরে রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছিল, রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণের সময় যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল তা প্রাকৃতিক নিকাশি ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করেছিল কেননা পর্যাপ্ত পরিমাণে কালভার্ট ব্যবহার

---

[১৫] *First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for 1868,* Alipore Jail Press, Calcutta, 1869, pp. 56-57.

[১৬] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal Vol. IX. District of Murshidabad and Pabna,*Trubner & Co., London, 1876. p. 242.

[১৭] বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শঙ্কর ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, *মুর্শিদাবাদ জেলা গেজিটিয়ার,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মুর্শিদাবাদ, ২০০৩, p. 168.

করা হয়নি, ফলস্বরূপ জমা জলে মশার প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল।[১৮] যদিও এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল অনেক আগেই পূর্ব বঙ্গের যশোরে ১৮৩৬ সালে। ওই সময়ে যশোর থেকে মামুদপুর পর্যন্ত একটা রাস্তা নির্মাণের সময় এক অজানা জ্বরের কবলে পড়ে ১৫০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ক্রমে এই জ্বর নদীয়া, হুগলি, বর্ধমান, বিরভূম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং মালদা সহ বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই জ্বরটিকে অনেকে আবার কালাজ্বরের সাথে তুলনা করেছেন।[19] W.W. Hunter ও মুর্শিদাবাদ জেলায় জ্বর ব্যাধি ও কলেরার প্রকোপ লক্ষ্য করেছেন। তার বিবরনী থেকে সেই সময়ের কাশিমবাজারের জনবিরল অবস্থার কথা পাওয়া যায়। তিনি ভাগীরথীর বদ্ধ হয়ে যাওয়া ধারাটিকে এখানকার মহামারীর বড় কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৭১-৭২ সালে জেলায় ১২৯৩০ জন মানুষ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল।[20] এই সময়ের স্যানিটারি কমিশনের তথ্য গুলোতেও মুর্শিদাবাদ জেলায় জ্বর ব্যাধি, কলেরা ও গুটিবসন্তের প্রাদুর্ভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে ৩৩,৮৯৬ জন মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল যার মধ্যে ২১,৭৮৮ জন মৃত্যু বরণ করেছিল।[২১] ১৮৭০-৭২ এবং ১৮৮৫ সালে বহরমপুর শহরের বন্যার কারণে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দেখা গিয়েছিল। ১৮৭৬-৭৭ সালে জেলায় ৬৪৫২ জন মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হলে ৩৮০৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ১৮৭৭-৭৮ সালে কলেরায় মারা যান ১১৪৮ জন। এই সময়ে ‘বর্ধমান জ্বর’ ও কলেরার কারণে জেলায় উচ্চ মৃত্যু জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছিল। 19th Annual Report of Sanitary Commission for Bengal এর দেওয়া তথ্য অনুসারে মুর্শিদাবাদ শহর, বহরমপুরের গোরা বাজার এবং আসানপুরে ম্যালেরিয়া রোগের মৃত্যুর যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে সেটা হল প্রতি ১০০০ জনে যথাক্রমে ৩৩.১৩, ২৯.২০ এবং ৩৬.৭৭ জন।

---

[১৮] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, ‘Malaria in Colonial Murshidabad’, *Kanpur Philosophers, Vol. IX, Issue II*, 2022, p. 659.

[১৯] Ibid.

[২০] W.W. Hunter, *op. cit.*, p. 241.

[২১] বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শঙ্কর ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, *op. cit.*, p. 168.

এই সময়ের আদমশুমারি রিপোর্ট গুলোর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখলে জেলার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত জেলার জনসংখ্যা ১০.৩৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত সময়কালে জেলার জনসংখ্যা মাত্র ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে ১৮৭২ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রতি বছরে জেলায় ০.৩ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জন্মহারের থেকে মৃত্যুহার সামান্য কম হলেও শিশুমৃত্যু ও ম্যালেরিয়া জনিত কারণে মৃত্যুহার ছিল অত্যন্ত বেশি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৭১ শতাংশ, যেখানে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬ শতাংশ হারে। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জেলার জনসংখ্যা ৮.৯৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। একই রকম ভাবে রাজ্যের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ২.৯১ শতাংশ হারে।[২২] জেলার গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা কমলেও শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা এই দশকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ম্যালেরিয়া ও সমজাতীয় জ্বরের কারণে মৃত্যুর বার্ষিক গড় হার ছিল ২.৯ শতাংশ। ১৯০৪ সালে বাগড়ী অঞ্চলে বড় আকারে বন্যা হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়। ফসলের যেমন ক্ষতি হয়েছিল তেমনই জল জমে থাকার কারণে রোগের প্রকোপ বেড়েছিল। ১৯০৫ সালে জেলাতে কলেরা রোগ মহামারীর কারণে ৮০০০ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ঠিক তার দুই বছর পরে ১৯০৭ সালে গুটিবসন্ত রোগ মহামারী হিসেবে দেখা গিয়েছিল।[২৩]

'বেঙ্গল ড্রেনেজ কমিটি' ১৯০৬-০৭ সালে জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা তদন্ত করেছিল, জি.ই. স্টুয়ার্ট ও শ্রী এ. এইচ প্রোক্টর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের

---

[২২] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, *op. cit.,* p. 660; Mehebub Hossain, 'Health and Environment in the Nineteenth Century Murshidabad', *Proceeding of the Bihar History Congress (2022),* Bhagalpur, p. 228.

[২৩] F.C. Clarkson, *Seventh Triennial Report of Vaccination in Bengal,* The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1908, p. 7 ; Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, ' Smallpox and Vaccination in Colonial Bengal with Special Reference to Murshidabad (1901-1944)', *Juni Khyat,* January-June 2024. p. 454.

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে জেলায় ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ও প্রাদুর্ভাব বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁরা দক্ষিণে গোরাবাজার থেকে উত্তরে ভাগীরথী বাঁধের রিটায়ার্ড লাইন পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর দুই প্রান্তের ফালি এলাকা, লালগোলা থানা এলাকা, হরিহরপাড়া থানা এলাকা ও ভগবান গোলা থানার কিছু এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁরা ৭০ টি গ্রাম ঘুরে ১২ বছরের কম বয়সী ৪৭৪৪ জন শিশুকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তারমধ্যে ১৯৫২ জনেরই ছিল বর্ধিত প্লীহা (৪১ শতাংশ)। যদিও এই হার ছিল নদীয়া ও যশোহর জেলার তুলনায় কম।[২৪] একই রকম ভাবে লাহোর মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজির অধ্যাপক ডব্লিউ. এইচ. সি. ফরস্টার ১৯০৮-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচটি থানা এলাকা যথা- সুজাগঞ্জ, দৌলতাবাজার, শাহনূর, ভগবানগোলা ও সামসেরগঞ্জে তদন্ত করেছিলেন। তিনিও ১২ বছর পর্যন্ত বয়সী শিশুদের পরিক্ষা করে তিনি বর্ধিত প্লীহার হার নিরূপন করেন। তিনি সর্বাধিক প্লীহা বৃদ্ধির হার খুঁজে পেয়েছিলেন শাহনগরে (৫৫ শতাংশ), আর সর্বনিম্ন ছিল সামসেরগঞ্জে (১ শতাংশ)।[২৫] বিল বা ডোবা সংলগ্ন এলাকায় এই হার ছিল অত্যন্ত বেশি (৮২.৬ শতাংশ)। যদিও ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর উভয় ক্ষেত্রেই প্লীহা বৃদ্ধি ঘটে। ফরস্টার এর তথ্য অনুসারে কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল ভাগীরথী ও ভৈরব নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং ভাগীরথী ও গোবরানালার মধ্যের অংশে। যদিও তিনি কোনো গ্রামেই চারটির বেশি সংক্রমনের ঘটনা দেখতে পাননি এবং এই সময়ে রোগটি ক্রমশ কমে আসছিল। যদিও মেজর এ. বি. ফ্রাই ফরস্টারের দেওয়া তথ্যের সাথে অনেকক্ষেত্রে একমত হননি। আসলে এখানে একটা কথা মনে রাখাও জরুরী ফরস্টার যে সময়ে তদন্ত করছিলেন সেই সময়ে সমগ্র প্রেসিডেন্সি বিভাগ সহ মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য কমে গিয়েছিল। এ. বি. ফ্রাই এই সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য অনুসারে জেলার থানা গুলোকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। তাঁর মতে নওদা, আসানপুর, ভগবানগোলা, লালগোলা,

[২৪] L.S.S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad,* Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1914, p.82.

[২৫] Ibid. p. 85.

মানুল্লাবাজার, হরিহরপাড়া এলাকা গুলো ছিল সর্বাধিক ম্যালেরিয়া প্রবন। এই সকল এলাকা গুলোতে ম্যালেরিয়া ছিল হাইপার-এনডেমিক। তিনি রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণের সাথে ম্যালেরিয়ার যোগসূত্র লক্ষ্য করেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। তবে জেলায় ম্যালেরিয়া ছাড়াও ছিল লাইশম্যান-ডোনোভান জ্বর যেটা অনেকটাই আসামের কালাজ্বরের মতই, যক্ষ্মা জ্বর, ফুসফুস- প্রদাহ বা নিউমোনিয়া, হাম, আন্ত্রিক, ফাইলেরিয়া ইত্যাদি।[২৬]

সি. এ. বেন্টলি তাঁর "Malaria and Agriculture in Bengal" নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক মানুষ ম্যালেরিয়ার কারণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মাইগ্রেট করেছিল। এই রোগটি কিভাবে বাংলার কৃষক ও কৃষিকাজকে প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তার লেখায় মুর্শিদাবাদ জেলায় 'ম্যালেরিয়া-কৃষক ও কৃষি সংকট' এর চিতর্ও ফুটে উঠেছে। যাইহোক শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা বিরাজমান ছিল কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে জেলার জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কিছুটা আশার আলো দেখতে পাওয়া যায় এবং সেইসাথে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল, যদিও কলেরা ও গুটিবসন্ত রোগ গুলোর উচ্চ প্রাদুর্ভাব ছিল এই সময়ে। এই দশকে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি (১১.৯৭) রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে (৮.১৪) ছাপিয়ে গিয়েছিল।[২৭] জন্মহার বা অভিবাসনের হার খুব একটা না বাড়লেও মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছিল। এই সময়ে বাগড়ী অঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। জল জমে থাকার সমস্যা কিছুটা দুর করা গেলে ম্যালেরিয়ার মত জ্বর ব্যাধির প্রকোপ কমে যায়, ফলে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন হয়। ম্যালেরিয়া প্রবন লালগোলা, ভগবানগোলা ও রানীনগর থানা এলাকার অনেকগুলো জলাভূমি-সংলগ্ন গতিহারা জলপ্রবাহ বর্ষার সময় সচল হয়। ডোমকল, জলঙ্গী থানা এই ঘটনা ঘটে এবং পরিবেশ স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়ে ওঠে। যদিও এই সময়ে ম্যালেরিয়ার কারণে হরিহরপাড়ার জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। জিয়াগঞ্জ অঞ্চলের জনসংখ্যাও ৩.৫

[২৬] Ibid. p. 89.

[২৭] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, *op. cit.,* p. 663.

শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। রেশম শিল্পের অবনতির জন্য এই শিল্পের সাথেই জড়িত বহু মানুষ এই সময় অন্যত্র চলে যায়।[২৮]

বিংশ শতকের শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সম্প্রসারণ ও বিশ্ব যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করলে বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ বেড়েছিল। গুটি বসন্ত, কলেরা এবং স্প্যানিশ ফ্লু এর ক্ষেত্রে যার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। গুটি বসন্ত রোগটি এই শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলায় কয়েক বছর পর পরই মহামারী হিসেবে দেখা গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্প্যানিশ ফ্লু ১৯১৮-২০ সালে ভারত তথা বাংলায় ধ্বংস লীলা চালিয়েছে। ১৯১৯-২০ সালে গুটিবসন্ত মহামারী বাংলায় যথাক্রমে ৩৭০১০ এবং ৩৬১৯০ জনের জনের প্রাণ কেড়েছিল যার হাত থেকে রেহাই পাইনি মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষও।[২৯] ১৯২০ সালের পরে গুটি বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কয়েক বছর কম থাকলেও ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর থেকেই তা আবারও মহামারীর আকার ধারণ করে এবং ১৯২৮ সাল পর্যন্ত যা বাঙালি জাতিকে ভুগিয়েছিল। সি. এ. বেন্টলির Annual Report on the Vaccination in Bengal for the year 1926-27, তথ্যে এটা দেখা যায় যে বাংলার প্রায় সমস্ত জেলা গুলোই এই সময়ে গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সব চেয়ে বেশি সংক্রমনের স্বীকার হয়েছিল পাবনা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা ও কলকাতা। মুর্শিদাবাদ জেলায় ওই বছর এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩১০১ জনের মৃত্যু হয়েছিল।[৩০] ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালে বাংলায় গুটিবসন্ত মহামারীর কারণে যথাক্রমে ৪২৫১৪ এবং ৪৩৫৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। বেঙ্গল পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেন্ট এর তথ্য অনুসারে এই সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সব ঋতুতেই বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্ষার সময় বাদে বছরের সব সময়েই জেলায় ভ্যাকসিন দেবার ব্যবস্থা চালু ছিল। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এই সময়ে জেলায় অতিরিক্ত ভ্যাকসিনেটর

---

[২৮] বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শঙ্কর ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, *op. cit.*, p. ১৫৩.

[২৯] Kabita Ray, *History of Public Health in Colonial Bengal 1921-1947*, K P Bagchi & Co, Kolkata, 1998, p. 59.

[৩০] Dr. C.A. Bentley, *Annual Report on Vaccination in Bengal for the Year 1926-27*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1927, p. 7.

নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯২৮-২৯ বর্ষে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৩৬৮৩১৫ জনকে ভ্যাকসিন করা হয়েছিল।[৩১] বেঙ্গল পাবলিক হেল্থ রিপোর্টের তথ্য বলছে ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত দশ বছর সময়কালে গুটিবসন্ত রোগে মৃত্যু পরিসংখ্যানের দিক থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থান ছিল কলকাতা ও হাওড়ার পরেই।[৩২] ১৯২৯ সালের পরবর্তী বছর গুলোতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমে গেলেও ১৯৩৬ সালে আবার ভয়াবহ আকারে ফিরে আসে এবং সমগ্র বাংলায় ৪৬২৬৭ জনের মৃত্যু হয়। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে এই রোগে মৃত্যুহার বেশি ছিল।[৩৩]

গুটিবসন্তের পাশাপাশি ওই একই সময়ে অর্থাৎ ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালে বাংলায় কলেরা মহামারী আকারে দেখা গেলে মুর্শিদাবাদ জেলায় যথাক্রমে ৩৮৪৪ এবং ৪১০৩ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।[৩৪] এই দুই বছরে জেলায় ১৩৬৪৫১ জনকে কলেরার ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল এবং ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাইল বিতরণ করা হয়েছিল। রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি ছিল জঙ্গিপুর, হরিহরপাড়া, নওদা ও বেলডাঙ্গা থানা এলাকায়।[৩৫] পরবর্তী কয়েক বছরে এই রোগটির প্রকোপ কমে গেলেও ১৯৩৪ এবং ১৯৪৩ সালে আবার এই রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যু সংখ্যা বেড়েছিল। তবে লক্ষনীয় বিষয় হল শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জেলার জনসংখ্যা ১৯.৬৯ শতাংশ বেড়েছিল, যদিও তা রাজ্যের হারের তুলনায় কম ছিল। জেলার প্রতিটি মহকুমাতেই জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই দশকে স্বাস্থ্য-অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। পরের

---

[৩১] Dr. C. A. Bentley, *Fourteenth Triennial Report on Vaccination in Bengal*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1930, p.6.

[৩২] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, 'Smallpox and Vaccination in Colonial Bengal with Special Reference to Murshidabad (1901-1944)', *Juni Khyat*, January-June 2024. p. 456.

[৩৩] Ibid., pp. 456-457.

[৩৪] Dr. C. A. Bentley, *Bengal Public Health Report for the Year 1927*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1929, pp. 25-33.

[৩৫]See- Dr. C.A. Bentley, *Bengal Public Health Report for the Year 1928*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1930. P. 30.

দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বৃদ্ধির হার অনেকটাই কমে গিয়েছিল (বেড়েছিল ৪.৫৯ শতাংশ হারে)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কান্দী মহকুমার মোট জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ৫.৬ শতাংশ। জনসংখ্যার এই নিম্ন বৃদ্ধির সব চেয়ে বড় কারণ ছিল ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর। এছাড়া এই সময়ে জেলায় ম্যালেরিয়া, কলেরা ও ডাইরিয়া জনিত কারণে উচ্চ মৃত্যু, ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দেশভাগ এবং ১৯৫০ এর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ফলে মুসলিম জনসংখ্যার বহির্গমন এই দশকের জনহ্রাসের মূল কারণ ছিল।[৩৬] ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের রাঢ় এলাকা পূর্ব দিকের বাগড়ী এলাকার তুলনায় চিরাচরিত ভাবে কৃষিতে পশ্চাদপদ হওয়ায় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের আঘাত বিশেষত কান্দি মহকুমা ও জঙ্গীপুরে প্রবল ছিল।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের বছরে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলায় ৬৮৮,৪০৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যেখানে ১৯৪২ সালে ৪২৬৫৭৩ জন প্রাণ হারান এই রোগে। এই সময়ে বাংলায় মোট মৃত্যু সংখ্যার ৩৬.১ শতাংশই ম্যালেরিয়ার কারণে হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়া ৩৯৭১৯ জনের প্রাণ কেড়েছিল।[৩৭] পরের বছরে ১৯৪৪ সালে এই রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে সমগ্র বাংলায় ৭৬৩২২০ জন প্রাণ হারান, যার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় মৃত্যু হয়েছিল ৪১১০৭ জনের।[৩৮] দুর্ভিক্ষের সময়ের আরো একটি ঘাতক রোগ ছিল কলেরা, এই রোগে ১৯৪৩ সালে বাংলায় ২১৬৪২৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সরকারি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির দেওয়া তথ্য অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলায় কলেরার কারণে এই বছর ৫০৫১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। জেলার ১৯০৮ টি গ্রামের মধ্যে ৯৭৬ টি গ্রামে কলেরা রোগী পাওয়া গিয়েছিল। আমাশয় ও ডাইরিয়ার কারণে জেলায় ৭৫৯ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন, যদিও এই রোগের উপসর্গ অনেকটাই কলেরার উপসর্গের

---

[৩৬] বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র শঙ্কর ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, *op. cit.*, p. 153.

[৩৭] M. Jafar, *Bengal Public Health Report for the Year- 1943,* Bengal Government Press, Calcutta, 1947, p. 8.

[৩৮] M. Jafar, *Bengal Public Health Report For the Year 1944,* Bengal Government Press, Alipore, pp. 8-9.

মতই। গুটি বসন্ত রোগ এই সময়ে জেলায় তেমন ভয়াবহ ছিল না, এই রোগে ১৯৪৩ সালে জেলায় ৩৫ জন এবং ১৯৪৪ সালে ২০৫ জনের মৃত্যুর খবর Bengal Public Health Report এ উল্লেখ আছে।[৩৯] কিন্তু পার্শ্ববর্তী জেলা নদীয়া, ২৪ পরগনা ও কোলকাতায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকটাই বেশী ছিল।

চিকিৎসালয়: উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জেলায় ৬ টি চিকিৎসালয় এর উল্লেখ পাওয়া গেছে। এগুলো হল- বহরমপুর হাসপাতাল যেটি সেই সময়ে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসালয় হিসেবে পরিচিত ছিল, মুর্শিদাবাদ নগর চিকিৎসালয়, আজিমগঞ্জ চিকিৎসালয়, কান্দি শাখা চিকিৎসালয়, জঙ্গীপুর শাখা চিকিৎসালয় ও লালগোলা চিকিৎসালয়।[৪০] এগুলো ছাড়াও ক্ষুদ্রতর চিকিৎসালয় হিসেবে উনিশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে জেলায় আরো বেশ কয়েকটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; সেগুলো হল বেলডাঙ্গা, দৌলতাবাদ, মরিচা, হরিহরপাড়া ও পাচথুপি। এগুলোতে মূলত এলোপ্যাথি পদ্ধতিতে চিকিৎসা হত, যদিও আধুনিক পরিকাঠামোর অভাব ছিল। স্ত্রী ও প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসার জন্য আলাদা করে তেমন ব্যবস্থা ছিল না এই হাসপাতাল গুলোতে। আর এই সকল চিকিৎসালয় গুলো চলত স্থানীয় রাজা ও জমিদারদের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করে কেননা সরকারি বরাদ্দ ছিল খুবই সীমিত। এ প্রসঙ্গে আমরা লালগোলার রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর, আজিমগঞ্জের রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর, কান্দির পাইকপাড়া এস্টেটের মহারাণী ও কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহের পর্যাপ্ত অনুদান। এছাড়াও এই সময়ে জেলায় লন্ডন মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'লন্ডন মিশন হাসপাতাল' নামে একটি চিকিৎসালয় জনগণের সেবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

---

[৩৯] Mehebub Hossain & Enayatullah Khan, ' Smallpox and Vaccination in Colonial Bengal with Special Reference to Murshidabad (1901-1944)', *Juni Khyat,* January-June 2024. p. 458; Major M. Jafar, *Bengal Public Health Report for the Year 1944,* Bengal Secretariat Book Depot, Alipore, p.7.

[৪০] W.W. Hunter, *op. cit.,* pp. 246-249.

পালন করেছিল।[৪১] বিশেষ করে স্ত্রী ও মায়েদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই হাসপাতালের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ডাক্তার মিশ লুসি নিকলসন ও এলিস হকারের উপস্থিতি এই হাসপাতালকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার জন্য জিয়াগঞ্জের জমিদার রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ন সিংহ ৪২ বিঘা জমি দান করেছিলেন।[৪২]

যদিও জেলার বেশিরভাগ মানুষ সেই সময়ে দেশজ ও লোক-চিকিৎসার উপরেই বেশি নির্ভরশীল ছিল। অসুখ বিসুখ হলে মানুষ সেই সময়ে বিভিন্ন ভেসজ দ্রব্য সেবন, ঝাড়ফুঁক ও টোটকা তাবিজের ব্যবহার করত। জেলায় বেশ কয়েকজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ভেসজ মতে চিকিৎসা করে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উনিশ শতকের বাংলার বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধর রায় মুর্শিদাবাদ জেলার সৈদাবাদে চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সুখ্যাতি মুর্শিদাবাদ ও বাংলার সীমানা পেরিয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর কাছে থেকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যরা ভারতের নানা প্রান্তে চিকিৎসা ব্যবসার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল। কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ গুপ্ত, ইন্দুভূষন ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীচরণ ও জতিশচন্দ্রের সুখ্যাতিও কম ছিল না। ১৮৭২ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় কবিরাজের সংখ্যা ছিল ২২৫৮ জন।[৪৩] এই সময়ে কবিরাজরাই জেলার চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন।

উপসংহার: মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়া, কলেরা, গুটিবসন্ত ও কালাজ্বরের মত অসুখ গুলোই ছিল প্রধান এবং এগুলো প্রায় প্রতি বছরই দেখা যেত। কখনও কখনও এই অসুখ গুলো হাইপার-এনডেমিক আবার কখনও মহামারী হিসেবে এসে জেলার জনস্বাস্থ্যকে সমস্যার সম্মুখীন করেছিল। এই সকল ব্যাধি ছাড়াও আমাশয়, বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ, কনজাংটিভাইটিস, ফুসফুসের

---

[৪১] Ashis Kumar Mondal, *Murshidabad Jelai Christian Missionarider Karjokolap o Abodan*, Silponagori Prakasani, Berhampore, 2014, p.56.

[৪২] Ibid. p. 57.

[৪৩] H.H Risley, *The People of India, 1915*, New Delhi, Reprint 1991, pp. 362-364; Census of India 1872.

রোগ ও হাঁপানির মত অসুখগুলো বিভিন্ন বছরের হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি রিপোর্ট গুলোতে উঠে এসেছে এবং এই রোগগুলো সবসময়ই দেখা যেত। কালাজ্বরের প্রাবল্য জেলায় অন্যান্য অসুখ গুলোর তুলনায় কম থাকলেও ১৯২০ সালের পর থেকে জেলার বিভিন্ন চিকিৎসালয় গুলোতে এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতি বছরই বেড়েছিল এবং সাথে বেড়েছিল মৃত্যু সংখ্যাও। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ম্যালেরিয়া জ্বরটি বাংলায় ক্রমশ মহামারীর পর্যায় থেকে এনডেমিক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, যদিও কোনো কোনো বছরে এই জ্বরে উচ্চ মৃত্যু লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন মেডিক্যাল রিপোর্ট গুলোতে। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে আবারও ম্যালেরিয়া বাঙালি জাতিকে পঙ্গু করেছিল। এই সমস্ত রোগ ব্যাধি গুলোর বাড়বাড়ন্তের জন্য বাংলার পরিবেশ যেমন দায়ী ছিল তেমনই দায়ী ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের জনস্বাস্থ্য নীতি, ভারতীয়দের স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব ও নানান কুসংস্কার। ঔপনিবেশিক সরকারের জনস্বাস্থ্য নীতি সেই সময়ের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রত্যহ সমালোচিত হয়েছিল, রোগ ব্যাধি দমনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। জেলায় যে সব চিকিৎসালয় গুলো ছিল সেগুলো মূলত ছিল শহরকেন্দ্রিক এবং সেগুলোতে পরিষেবা প্রদান করার মত যথেষ্ট পরিকাঠামোও ছিল না। মানুষ তাই নির্ভর করত বিভিন্ন ধরনের লোক-চিকিৎসা যেমন কবিরাজি, ফকিরি, টোটকা ও ঝাড়ফুঁক এর মত চিকিৎসার উপরে। এলোপ্যাথি চিকিৎসা ছিল যথেষ্ট ব্যায়বহুল এবং সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। কখনও কখনও এক ডোজ কুইনাইন কিনতে গিয়ে বাংলার ক্ষেত মজুরদের পাঁচ দিনের আয় চলে যেত।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) Andrew Cuningham and Bride Andrews (ed.), *Western Medicine as Contested Knowledge, Manchester University Press,* Manchester, 1997.
2) Anil Kumar, *Medicine and the Raj: British Medical Policy In India 1835-1911,* Sage, New Delhi, 1998.
3) Amiya Kumar Bagchi & Soman Krishna (ed.) *Maladies, Preventives and Curative Debates in Public Health in India,* Tulika Books, New Delhi, 2005.

4) Arabinda Samanta, *Living with Epidemics in Colonial Bengal*, Routledge, 2018.
5) Biswamoy Pati, Mark Harrison (ed.), *Health Medicine and Empire: Perspectives on Colonial India*, Orient Longman, Hyderabad, 2001.
6) David Arnold, *Imperial Medicine and Indigenous Societies*, Oxford University Press, New Delhi, 1989.
7) Deepak Kumar & Raj Sekhar Basu, *Medical Encounters In British India*, Oxford University Press, New Delhi, 2013.
8) D.P Chattopadhyaya & O.P. JAGGI ed. *Medicine in India: Modern Period* Vol. IX, of *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization* Part 1, Oxford University Press, New Delhi, 2011.
9) Gopaul Chandra Roy, *The Causes, Symtoms and Treatment of Burdwan Fever or The Epidemic Fever of Lower Bengal*, London, 1876.
10) Gautam Bhadra, *Some Socio- Economic Aspects of the Town of Murshidabad, 1765-1973* (an unpublished thesis, J.N.U, 1973).
11) Srilata Chatterjee, *Western Medicine and Colonial Society*, Primus Books, Delhi, 2017.
12) Kabit Ray, *History of Public Health in Colonial Bengal 1921-47*, Calcutta, K.P. Bagchi & Co., 1998.
13) Mark Harrison, *Public health in British India: Anglo- Indian Preventive Medicine 1859-1914*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
14) W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal Vol. IX*, District of Murshidabad and Pabna, Trubner & Co., London, 1876.
15) L.S.S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad*, Government of Bengal, Calcutta, 1914.

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 400-412
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.028

বেলা বসুর 'স্মৃতিপট' : নারীশিক্ষা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং সমকাল

পর্ণা মণ্ডল, *পর্ণা মণ্ডল, গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন, কলকাতা, ভারত*

Received: 12.11.2024; Accepted: 28.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bela Basu's memoir Smritipot (2000) is a testament to the practical inspiration behind realizing the latent desires of the mind. Bela Basu is not a famous personality; she is simply one among the many ordinary housewives. She took up the pen with effortless spontaneity and simplicity. Society did not readily accept the positive aspects of women's education. Denying women the right to education and the patriarchal efforts to suppress them repeatedly hindered the progress of women. Yet, among all this, conscious families and individuals have helped in supporting women's traditional education. Bela Basu had an unyielding desire for education. In the early 19th century, her grandmother was a well-educated woman who had earned a scholarship. Growing up in such a family, Bela Basu aspired to higher education. However, in the 1940s, after studying until the eighth grade, her school was closed due to the onset of World War II. Despite this, she did not let go of her dream of higher education. Eighteen years after her marriage, she decided to take the school

finals again with her son and succeeded with extraordinary brilliance. Afterward, despite domestic obstacles, she continued her education, progressing through intermediate, undergraduate, and special honors studies in succession. At a time when the rate of women's education was on the decline in India, Bela Basu's determination and her ability to reach the graduate level, even beyond the typical age for education, serve as an inspiring example of self-awareness and persistence. In her memoir, she describes her journey of education, setting an example for future generations of the realization of unstoppable willpower.

Keywords: Women's education, Indomitable willpower, Contemporary relevance, Traditional education.

বেলা বসুর স্মৃতিলিখন 'স্মৃতিপট' (২০০০) প্রবাদবাক্য **'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'—**এর সমার্থক। সেই অদম্য ইচ্ছা নারীর পরিচয়ের সংকট থেকে বেরিয়ে এসে আত্মঅন্বেষণের, আত্মবিশ্লেষণের ও সর্বোপরি আত্মপ্রতিষ্ঠার। তবে, 'ইচ্ছা' এবং 'উপায়ে'র মধ্যবর্তী দূরত্ব স্থাপনের মূলচক্রী সময়-সমাজ। এই দূরত্ব দূরীকরণের হাতিয়ার শিক্ষা-বোধ-বিচক্ষণতা ও সচেতনতা। এই প্রক্রিয়ায় কোনো তত্ত্বগত একরৈখিকতা নেই, বরং ব্যক্তিবিশেষে বিচিত্র। তবুও মানুষ অন্যের জীবনকথার বাঁক থেকে অনুপ্রেরণা সঞ্চয়ে মগ্ন। তাইতো ব্যক্তির স্মৃতিকথা একক ব্যক্তি অতিক্রমী, সর্বজনীন। বেলা বসুর 'স্মৃতিপট' এমন এক 'স্মৃতিলিখন, যা মনের সুপ্ত বাসনা সত্যি করার বাস্তব অনুপ্রেরণা। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নন বেলা বসু। আর পাঁচজন সাধারণ গৃহবধূর একজন তিনি। কলম ধরেছেন নিরাভরণ অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ততায়।

'নারী' ও 'প্রথাগত শিক্ষা' একসময় ছিল সামাজিক রক্ষণশীলতার চোখে পরস্পর প্রতিস্পর্ধী। এই সংক্রান্ত সমাজ নির্দেশিত কিছু অযৌক্তিক ট্যাবু নির্মাণ করে তা নারীমননে এমনভাবে নিষিক্ত করা হত, নারী বাধ্য হত আতঙ্কিত হয়ে প্রথাশিক্ষা থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে রক্ষণশীল বঙ্গসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপত্তির কারণগুলির চমৎকার তালিকা রয়েছে *সর্বশুভকরী* পত্রিকায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধে। সেগুলি হল—

(ক) 'শিক্ষা কর্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রী জাতির তাহা নাই।'

(খ) 'স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখনও নাই... অতএব লোকাচার বিরুদ্ধ...।'

(গ) 'স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখে চিরকাল... জীবনযাপন করিবে।'

(ঘ) 'স্ত্রী জাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেন।'

(ঙ) 'বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক।'

(চ) 'পরিশেষে স্বয়ং পতিত হইবেক।'

'অতএব স্ত্রী জাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত।'[১]

উপরোক্ত কারণগুলি মনস্তাত্ত্বিক দৌর্বল্য বৃদ্ধির সহায়ক। প্রত্যেকটি প্রদর্শিত যুক্তির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা প্রকৃত অন্ধকার সরিয়ে, আলোর দিশা দিতে পারে একমাত্র সুশিক্ষালব্ধ অকাট্য যুক্তি। নারীর সেই একদিনের না পারা দীর্ঘপথ অতিক্রমে প্রত্যয় অর্জন করেছে। ভয় দেখানো অযৌক্তিকতাকে অবিশ্বাস করে জীবনের পথে জয়ী হয়েছে। নারীর সেই জয়যাত্রার ইতিহাস সুদীর্ঘ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর এই মন্তব্য উত্থাপন করেছেন। এই উনিশ শতকেরই প্রথম দশকে (১৮১৩ সালে) চার্টার আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রবেশ অবাধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের সচেতনতাবোধের তাগিদে প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার শুভারম্ভ। তবে, এই সময় অনেক পরিবার তাঁদের মেয়েদের বহির্জগতে পা রাখা নিয়ে কুণ্ঠাবোধ করতেন, অথচ নারীশিক্ষার আবশ্যিকতা অস্বীকার করাও ছিল তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁরা অন্তঃপুরেই শিক্ষিকা নিয়োগ করে নারীর পাঠদানের ব্যবস্থা করলেন। তবুও এই উভয় সংখ্যা জনসংখ্যা অনুপাতে ছিল অনেক কম। কারণ তখনও অধিকাংশ পরিবার মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন নারীশিক্ষার অযৌক্তিক নেতিবাচক ধারণা। নারীকে অবদমনের পিতৃতান্ত্রিক প্রচেষ্টা যাঁদের চোখে ধরা পড়ল, তাঁরা এগিয়ে গেলেন নারীপ্রগতির পথে। বেলা বসুর পূর্বপ্রজন্মে তাঁর ঠাকুমা ছিলেন উনিশ শতকীয় এমন পরিবেশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে সুশিক্ষিতা পাত্রী ছিল দুর্লভ। কিন্তু অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলার মিকশিমীল গ্রামের প্রগতিশীল মিত্রবাড়িতে

জয়চন্দ্র মিত্রের ছোট ছেলে হীরালালের পাত্রী অনুসন্ধানের সময় রূপের চেয়েও শিক্ষিতা পাত্রী ছিল কাম্য। বহু অনুসন্ধানে শ্বশুরমশাই নিয়ে এলেন তৎকালীন ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পাঠগ্রহণ করা বউমা। নাম জ্ঞানদানন্দিনী। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা ঠাকুরপরিবারের জ্ঞানদানন্দিনীর নাম। আলোচ্য জ্ঞানদানন্দিনীও যশোরনিবাসী ছিলেন। তবে, ইতিহাসের পাতায় তাঁর নামোল্লেখ নেই। আসেননি কোনো প্রচারের আলোয়। তাঁর যুগীয় অনুপ্রেরণা লেখা রইল বেলা বসুর স্মৃতিলিখনে। গ্রামে প্রতিবেশীরা যাঁরা জ্ঞানদানন্দিনীকে আবিষ্কার করতে পারলেন না, তাদের সংজ্ঞায় তিনি শুধুমাত্র একজন 'কালো মেয়ে' ও বরের পাশে বেমানান বউ। কিন্তু জয়চন্দ্র মিত্র রত্ন চিনেছিলেন। পারিপার্শ্বিক বিরূপতা থেকে বউমাকে আগলে আশ্বস্তও করতেন বারংবার। একদিন মানুষ রূপের অসাড়তা বুঝে গুণের কদর করবেই, এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন জয়চন্দ্র মিত্র। এক্ষেত্রে, জ্ঞানদানন্দিনীর স্বামী হীরালালের কোনো মন্তব্য ছিল না। তবে তিনি তাঁর পিতার মতামতকেই শিরোধার্য মনে করতেন এবং স্ত্রীয়ের প্রতি ছিল তাঁর যথার্থ সম্মান। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নববধূ জ্ঞানদানন্দিনীর সুশিক্ষার প্রকাশ পরবর্তীতে বেলা বসুও প্রমাণ পেয়েছেন। ঠাকুমা জ্ঞানদানন্দিনীর শিক্ষাগত প্রতিভার কথা নাতনি বেলা বসু উল্লেখ করলেন স্মৃতিপটের কথামুখ অংশে—

> সত্যিই জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি, কঠোর শ্রম ও মানবিক গুণে বৃহৎ যৌথ পরিবারের শ্রী ফিরিয়ে এনেছিলেন। সারা দিন খাটুনির পর রাত জেগে প্রদীপের আলোয় বই পড়তেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র, দামোদর, ক্ষীরোদপ্রসাদ, ত্রৈলোক্যমোহনের গ্রন্থাবলী তাঁর আদ্যোপান্ত পড়া ছিল। রামায়ণ-মহাভারত টানা মুখস্থ বলে যেতেন তিনি। শুভংকরীর আর্যা ছিল তাঁর নখদর্পণে। মুখে মুখে এমন অংক করতেন যে সকলের তাক লেগে যেত। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবার ভার ছিল তাঁর ওপর। তাঁর স্মৃতিশক্তি শেষ বয়স পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সব কবিতা বই না দেখেই অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন।[২]

বেলা বসু জ্ঞানদানন্দিনীর মতো নারীব্যক্তিত্বের বইপড়া, স্মৃতিশক্তির প্রতিভাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন আশৈশব। বেলা বসুর কালে যুগের

বেলাও এগিয়েছে অনেক। উনিশ শতকের অপরার্ধে তখন নারীশিক্ষার সচেতনতাবোধও তুলনামূলক প্রসার পেয়েছে। তবুও পরিবারের পক্ষ থেকে মেয়েদের সত্বর পাত্রস্থ করাই মুখ্য পরিণতি ধার্য করা হত। তারই মধ্যে থেকে বিবাহোত্তর জীবনে সন্তানের মা হওয়ার পরও সন্তানের সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা বিসর্জন দেননি বেলা বসু। মনের সুপ্ত সেই বাসনাকে রূপ দেওয়া সহজ ছিল না। সেই ওঠা-পড়া, ভাঙা-গড়ার রোজনামচা লিপিবদ্ধ করেছেন স্মৃতিপটে।

বেলা বসুর পিতা রঙ্গলাল মিত্র। গর্ভধারিণী মাতা সুধারাণী। তবে, সুধারাণীর অকালমৃত্যুতে রঙ্গলাল দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রী ঊর্মিলা। সমাজ 'সৎমা' নির্দেশিত যে নেতির প্রচার করে, তা যে সর্বৈব সত্য নয়, তার প্রমাণ বেলা বসু ও ঊর্মিলা বসুর আত্মিক সম্পর্ক। ঊর্মিলা প্রথম থেকেই বেলাকে নিজের বড় মেয়ের স্থান দিয়েছেন। আজীবন আগলে রেখেছেন স্নেহ আর মমতা দিয়ে। কোনো অংশে বুঝতে দেননি তিনি তাঁর গর্ভধারিণী নন। এমনকি বেলার পড়াশুনা করার ইচ্ছাকে তিনি সর্বদা সমর্থন করতেন। পিতা রঙ্গলাল মিত্র ছিলেন পেশায় পুলিশ। এই চাকরিতে ক্রমাগত ছিল স্থানান্তর। তাই বিদ্যালয়ে ভর্তির পর থেকে বেলাকেও নানান বিদ্যালয় বদল করতে হয়েছে। বেলা বসু উল্লেখ করেছেন যে, সেই আমলে অনেক পরিবারে বাড়ির বাইরে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণে ছিল নিষেধাজ্ঞা। তাই নিজেকে তিনি সৌভাগ্যবতী মনে করেছেন। নড়াল স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ গ্রহণ করলেন বেলা বসু। তবে, সমস্যা হল সেখানে বালিকা বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণির পর পড়ার সুযোগ ছিল না। অথচ ছেলেদের বিদ্যালয়ে ছিল না এমন কোনো গণ্ডি। সেখানে উঁচু শ্রেণি অবধি পড়ার ব্যবস্থা ছিল। ছেলে ও মেয়ের পড়ার ক্ষেত্রে এমন বৈষম্য বেলা বসুকে যন্ত্রণা দিয়েছিল। অথচ মনে তাঁর অদম্য ইচ্ছা, আরও উঁচু শ্রেণিতে পড়বেন। অগত্যা বাড়িতে বসে দীনেন্দ্রনাথ গুপ্তের ডিকেটটিভ গল্পের বই, মিঃ ব্লেকের রোমহর্ষক সিরিজ ইত্যাদি পড়তে থাকেন নিজস্ব পড়ার তাগিদে। পাশাপাশি সাংসারিক কাজও করতেন। তবে, প্রথাগত পড়ার আশা তিনি ছাড়েননি। একদিন আকস্মিকভাবে আবারও পড়ার সুযোগের হাতছানি পেয়ে কোনোভাবে তা ব্যর্থ হতে দেননি। ঠাকুমার সঙ্গে কলকাতায় পিসির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেখলেন, সেখানে পিসির মেয়েরা উঁচু ক্লাসে

পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তাই ঠাকুমাকে জানালেন একান্ত মনোবাসনা। ঠাকুমা জ্ঞানদানন্দিনী, যিনি নিজে আজীবন পড়াশুনার কদর করেছেন, তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রাণিত করে তাঁর বাবাকে চিঠি লিখতে বলেন। বেলা বসুর বাবাও সম্মতি জানালেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই পারিবারিক এই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন বিশেষ সাধুবাদযোগ্য। বিশেষভাবে সমকালীন প্রেক্ষিত যেহেতু সিংহভাগ মেয়েদের পড়া সমর্থন করে না। শেষপর্যন্ত কলকাতার স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তির পরীক্ষা দেন। সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে পিসির মেয়েদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পড়াশুনা দুই মাস নির্বিঘ্নে চলার পর গরমের ছুটি পড়ে যাওয়ায় বাবার নতুন চাকরিস্থল বসিরহাটে চলে আসেন বেলা ও তাঁর পিসতুতো বোনেরা। ছুটি শেষে কলকাতা ফিরে আবারও দৈনন্দিন বিদ্যালয় যাবেন, সেই ভেবে আশ্বস্ত ছিলেন বেলা বসু। কিন্তু সমকাল এসে কড়া নাড়ল নিশ্চিন্তজীবনে। বিশ শতকের চল্লিশের দশক। ইউরোপের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ কলকাতায় এসে পড়েছে। কলকাতায় তখন জাপানি বিমান আক্রমণের আশঙ্কা। গভীর রাতের কলকাতার আকাশে বহু এরোপ্লেন উড়তে দেখা যাচ্ছে। বিমান বিধ্বংসী কামানের গর্জন।

এমন ভয়াবহ আবহে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। বেলা বসু অন্য মেয়েদের মতো স্কুল বন্ধের খবরে মনে মনে খুশি হলেন না। কারণ, তিনি মনের একান্ত তাগিদে কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন। তাই মাত্র দুই মাসের মধ্যে এই উদ্যোগ এভাবে নস্যাৎ করে দিল যখন সমকালীন উত্তাল আবহাওয়া, তখন তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন প্রবল—

> এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কলকাতার রাস্তায় এবং বাড়িতে আলো জ্বালা নিষিদ্ধ ছিল। মাঝে মধ্যেই সাইরেন বাজত আর ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেত। বিমান আক্রমণের ভয়ে রাস্তার আলোগুলোতে কালো রঙের ঠুলি পরানো হয়েছিল। ...পিসেমশাই চিঠি লিখে জানালেন—'স্কুল বন্ধ—মেয়েদের এখন কলকাতায় পাঠাবার দরকার নেই।' ঝুনি-ফুনিরা খুশি হলেও আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মনের কোণে একটা আশংকা দেখা দিল—আমার হয়তো আর লেখাপড়া করা হবে না। মনের ভয় একদিন সত্যি হয়ে দাঁড়ালো।[৩]

স্মৃতিলেখিকার শিক্ষাগ্রহণের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে শব্দবিন্যাসে। সমকাল মানুষকে হাতের পুতুলের মতো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। সমকালীন নেতিবাচকতা উত্তীর্ণ করে নিজের লক্ষে এগিয়ে চলাই লড়াকু মনের ধর্ম। বেলা বসুও তেমনটাই চেয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎই বিয়ের ভালো সম্বন্ধ পাওয়ায় পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বেলা বসু কিন্তু সম্বন্ধ আসার প্রথম থেকে চেয়েছিলেন পাত্রপক্ষের তাঁকে পছন্দ না হোক, যাতে তাঁর বিয়ের কারণে পড়াশুনার ব্যাঘাত না ঘটে। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপে সেই সময় বিয়ে করতে বাধ্য হন তিনি। এক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল পরিবারে মেয়েকে আরও পড়ার সুযোগ করে না দিয়ে এমনভাবে সত্বর বিয়ে দেওয়ার বিষয়টি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যে পরিবারে আরও দুই প্রজন্ম পিছিয়ে সুশিক্ষিতা পাত্রী আনার রেওয়াজ ছিল, সেখানে বাড়ির মেয়ের ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণি পড়তে পড়তে বিশ্বযুদ্ধের আবহে বিয়ে দেওয়া কাম্য নয়। যদিও কথায় আছে, মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে আটকায় পৃথিবীর কোনো শক্তির সাধ্য নেই। বেলা বসুও তাঁর সেই ইচ্ছাশক্তির জোরে মনের মধ্যে পড়াশুনা করার ইচ্ছা যাপন করে গেছেন। বইপ্রেমী সত্তাকে বিসর্জন দেননি বিবাহোত্তর জীবনে। পিসতুতো ননদের ছেলে কানু গল্পের বই ভালোবাসত। লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়ত। একথা জানতে পেরে, বেলাও কানুর পড়া হয়ে গেলে বইগুলো পড়তেন। বিয়ের সময় শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' এবং রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' ছাড়া আর কোনো বই উপহার পাননি বলে আক্ষেপ করেছেন স্মৃতিলিখনে। তখনও কলকাতায় জাপানি বোমার আতঙ্ক। সাইরেন বাজলেই শেল্টারে ঢুকতে হয়। তাই প্রথাগত পড়াশুনার ইচ্ছা থাকলেও উপায় হয়ে ওঠেনি। কালক্রমে তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। এরপর বেলার দাদার হবু ডাক্তার বৌদিকে দেখে মনের সুপ্তিতে থাকা পড়াশুনার ইচ্ছা জেগে ওঠে আবার। এক্ষেত্রে সমকালে মেয়েদের ডাক্তার হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত অবশ্যই নারীশিক্ষা প্রগতির সম্ভাবনা নির্দেশ করে। যদিও ১৮৮৬ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার হয়ে সমাজের একাংশের অন্ধ ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, তবুও সেই পথ অনুসরণকারিণীর সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। তাই পরিবারে এমন সুশিক্ষিত মেয়ের আগমন বেলা বসুর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরই মধ্যে এসেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের হাহাকার, দেশভাগ ও স্বাধীনতা। পারিপার্শ্বিক

উত্তাল সময়ে স্বামী-সন্তান-সংসার রেখে বহির্জগতে পড়া আবার নতুন উদ্যমে শুরু করে ওঠা হয়নি তখন বেলা বসুর। পাশাপাশি তাঁর স্বামীর চাকরিসূত্রে ছিল নানান স্থানে বদলির প্রবণতা। সব মিলিয়ে বেলা বসুকে তাঁর পড়ার ইচ্ছাকে সুপ্ত রাখতে হয়েছে। অথচ চোখের সামনে তাঁর এক বোন তখন লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজে পড়ছে, এমনকি তাঁর মাসিও নবম শ্রেণিতে পড়ছে। কিন্তু যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল পাঠগ্রহণে, তাঁকেই সত্বর বিয়ে দেওয়া হল। তবুও হাল ছাড়েননি বেলা বসু।

> একদিন খবরের কাগজে পড়লাম তিন-চারটি সন্তানের মা একজন গৃহবধূ এই বয়সে লেখাপড়া করে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। খবরটা পড়ে মনে হলো আমিও তো চেষ্টা করে দেখতে পারি। বিজুর বই নিয়ে পড়া শুরু করলাম। কাউকে কিছু বলিনি। শুধুমাত্র আমার স্বামীকে জানিয়েছিলাম। উনি খুবই উৎসাহ দিলেন।[৪]

খবরের কাগজের এই সংবাদ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল গৃহবধূ বেলা বসুকে। বিজু তাঁর সন্তান। সন্তানের পাঠ্যপুস্তক পড়ে পুরানো পড়ার অভ্যাসে ফিরে আসতে চাইলেন। বিশ শতকের অপারার্ধে স্ত্রীয়ের নতুন ভাবে পড়াশুনা শুরুর ক্ষেত্রে স্বামীর মতামতের গুরুত্ব ছিল। একুশ শতকে সমাজের সর্বত্র নারী স্বাধীনচেতা হতে না পারলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে কারোর অনুমতি ব্যতীত স্বসিদ্ধান্তে শিলমোহর দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু পূর্বে তা সম্ভবপর ছিল না। তাই স্বামীর অনুমতি ও অনুপ্রেরণা বিষয়টি বেলা বসুর স্বপ্নপূরণের পথে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজ নির্দেশিত ছকে বাঁধা বয়সের সীমা অতিক্রম করে প্রথাগত পাঠগ্রহণের পথে ফিরছেন বেলা বসু। ছেলের সঙ্গে তৎকালীন স্কুল ফাইনাল দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। মা ও ছেলের চলল একই সঙ্গে পরীক্ষাপ্রস্তুতি। বেলা বসুর জন্য ব্যবস্থা করা হল একজন গৃহশিক্ষকের। শিক্ষক শ্রী মনোজ বক্সী প্রথমে ভেবেছিলেন বেলার ছেলেকে পড়াতে হবে। কিন্তু ছেলের মায়ের পড়াশুনায় উদ্যম দেখে তিনিও অবাক হন এবং অনুপ্রেরণা দেন।

> আমিই ছাত্রী শুনে উনি তো অবাক। বললেন—'আগে কত দূর পড়েছিলে?' আমি বললাম—'ক্লাস এইট পর্যন্ত'। মাস্টারমশাই শুনে বললেন, 'এভাবে হবে না। তোমাকে টেস্ট পেপার অনুযায়ী সব বিষয়

> পড়তে হবে। খুব পরিশ্রম করতে হবে মা।' আমি জোর দিয়ে বললাম—'আপনি যেভাবে পড়তে বলবেন তেমনি করেই পড়ব।'[৫]

এরপর এল বেলা বসুর ছোট থেকে মনের কোণে জমিয়ে রাখা উঁচু শ্রেণিতে পড়াশুনার ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণের জন্য পরিশ্রমের পালা। তাঁর যে বোন ইতিহাসে এম. এ পড়ছিল, সে ইংরাজি পড়ায় সাহায্য করে। ছেলে বিজুর হাতে লেখা ইংরাজি গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণের নোটপত্র মায়ের পাঠগ্রহণে সাহায্য করে। এছাড়াও ছিল গৃহশিক্ষকের কাছে ইংরাজি ও অন্যান্য বিষয়ে যথাযথ অনুশীলন। পাশাপাশি স্বামীর থেকে পেয়েছেন প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় উৎসাহ। এইভাবে ছেলের সঙ্গে মা প্রস্তুতি নিলেন স্কুল ফাইনালের। কাটোয়া স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা চলাকালীন স্বামী প্রত্যেকদিন পৌঁছে দিতেন স্কুলে। টিফিনের সময় ডাব, মিষ্টি কিনে দিতেন। সন্তানতুল্য সহপাঠিনীরাও পেতেন বিশেষ অনুপ্রেরণা। সেইসব কথার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আছে 'স্মৃতিপট' স্মৃতিলিখনে।

বেলা বসু বিয়ের আঠার বছর পর পরীক্ষা দিতে বসেন। স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষার হলের নিয়মকানুনের থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থেকে তিনি জোরে জোরে প্রশ্নপত্র পড়েন। সেই সময় শিক্ষিকা বিপ্লবী বীণা দাসের সান্নিধ্যে কেমনভাবে আসেন, সেকথা লিপিবদ্ধ করেছেন স্মৃতিলিখনে—

> আমি তো বহুদিন লেখাপড়ার জগত থেকে দূরে ছিলাম। তাই প্রশ্নগুলো জোরে জোরে পড়ছিলাম, উনি মিষ্টি করে বললেন—'মনে মনে পড়ো।' আমি কুণ্ঠিত স্বরে বললাম—'দিদি, আমি বিয়ের আঠারো বছর পরে পরীক্ষা দিতে বসেছি। তাই সব নিয়মকানুন ভুলে গেছি।' উনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'ঠিক আছে—তোমার লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। বরং সকলকে ডেকে দেখানো উচিত।' ওঁর কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পৃথিবীতে কত যে এমন মহানুভব চরিত্রের নারী ও পুরুষ আছেন তাঁদের খবর কেই বা রাখে।[৬]

উল্লেখ্য, বিপ্লবী নারীদের কথা। বীণা দাস ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিকন্যা। কিশোরী বয়স থেকে তিনি রাজনীতিমনস্কা। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র

বিপ্লবের নেত্রী বীণা দাস ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তৎকালীন বাংলার ব্রিটিশ গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর গুলি চালিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন। সেই কারণে তাঁকে গ্রেফতার করে আন্দামান সেলুলার জেলে কারারুদ্ধ করা হয় নয় বছর। তারপর ফিরে এসে তাঁর পুনরায় রাজনীতিজীবনে যোগদান, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্যপদ গ্রহণ, নোয়াখালি দাঙ্গা পরবর্তী রিলিফের কাজ, মরিচঝাঁপি গণহত্যায় প্রতিবাদী মুখ— এসব তথ্য পাওয়া যায় ধারাবাহিক ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু এই বীণা দাস যে আন্দামান থেকে ফিরে কাটোয়া স্কুলে 'অনারারি মিসট্রেস' পদে নিযুক্ত হয়ে ইংরাজি পড়াতেন, সেই তথ্য পাওয়া গেল বেলা বসুর এই স্মৃতিলিখনে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে বেলা বসু টেস্ট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। স্বামী সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেইসময় তাঁর স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামীসেবা অস্বীকার না করেও স্কুল ফাইনালের প্রস্তুতি নিতে থাকেন বেলা। স্বামীর চিকিৎসার জন্য বনগাঁ এসে সেখানের স্কুল থেকেই পরীক্ষা দেবেন ঠিক করেন। ছেলে কাটোয়া স্কুলের কৃতি ছাত্র ছিল। তাই শিক্ষকেরা তাকে স্কুল পরিবর্তন করতে দেননি। তাই ছেলেকে কাটোয়ায় ব্যবস্থা করে পাঠালেন। বনগাঁয় থাকতেন বেলার বাবা-মা। তাঁরাও তখন তাঁর পড়া বুঝতে সাহায্য করেছেন। ভাই মিন্টুও দিদির সঙ্গে পরীক্ষা দেবে। এরপর যথাসময়ে হল স্কুল ফাইনাল। দুর্দান্ত ফলাফল করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন বেলা বসু। ফার্স্ট ডিভিশনে দুটি বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়ে পাশ করল বেলা। তাঁর ছেলে ফার্স্ট ডিভিশনে বেশ কয়েকটি বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়ে, ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করল। মা ও ছেলের সাফল্যে গর্বিত হল পরিবার। বিশেষ করে, বয়স যে কেবল সংখ্যার হিসাব, যোগ্যতা যে কোনো কিছু করতে পারার ইচ্ছা ও তাগিদ থেকে আসে, তা প্রমাণ করে দিলেন বেলা বসু।

স্কুল ফাইনাল দিয়েই থেমে থাকলেন না বেলা বসু। এরপর মনে আরও পড়ার ইচ্ছার খোঁজ পেয়ে স্বামী নিজেই বললেন পরবর্তী ধাপে পড়ার জন্য। সেই উজ্জ্বল স্মৃতি লিখে রাখলেন বেলা তাঁর 'স্মৃতিপটে'। তৎকালীন মেয়েরা প্রত্যেকে এমন অনুপ্রেরণাকারী স্বামী পেতেন না। তাই সেই যুগের অনেকের কাছেই এই বর্ণনা অলীক স্বপ্ন—

> বাড়ির কর্তা আহ্লাদে ডগমগ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন— 'ইন্টারমিডিয়েট পড়বে তো?' আমি হাসিমুখে ওঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিলাম— 'এইরকম সংসারে এসে পড়েছিলাম তাই। তুমি সাহায্য না করলে আমার পক্ষে এত ভালো ফল করা সম্ভব হতো না। ইন্টারমিডিয়েট তো পড়বই।'[৭]

এছাড়াও বেলা বসু স্বীকার করেছেন, স্বামীর অসুস্থতার সূত্রে সেইসময় ঘটনাচক্রে বনগাঁয় বাপের বাড়ি এসে থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন বলে পড়াশুনায় সময় দিতে পেরেছিলেন বেশি। সর্বকালীন সত্য যে, শ্বশুরবাড়িতে সাংসারিক দায়বদ্ধতায় পড়াশুনা আর সংসারের সময়ের ভারসাম্যে সংসারের পাল্লা হয় ভারী। তাই বাপেরবাড়িতে মা-বাবার উপস্থিতিতে পাল্লা ভারী হওয়ার সুযোগ থাকে পড়াশুনার দিকে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন বেলা বসু। তবে, নিজের সংসারে ফিরতেই হল অবশেষে। স্বামী আবারও বদলি হলেন মাহেশের রামপুরিয়া কটন মিলে। ভ্রাম্যমান সংসার তাঁদের। সেখানেই রিষড়া কলেজে ভর্তি হলেন বেলা এবং প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হল তাঁর ছেলে। মা ও ছেলে দুইজনেরই অভীষ্ট তখন ইন্টারমিডিয়েট। সংসার থেকে একপ্রকার সময় চুরি করে পাঠপ্রস্তুতি নিতে থাকেন বেলা। সেইসময় রান্নায় অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় রাঁধুনী নিয়োগ করেন, যাতে পরীক্ষার জন্য অনুশীলন যথাযথ হয়। এমন সময় এই রাঁধুনীকে ঘিরে শুরু হয় বিপত্তি। বেলা বসুর বিয়ের গয়না, পরবর্তী আরও গয়না সহ মেয়েদের গয়না বাড়ি থেকে চুরি যাওয়ায় সন্দেহভাজনের তালিকায় এই রাঁধুনীকে পুলিশ রাখলেন প্রথমে। সামনেই বেলার ফাইনাল পরীক্ষা। এতো ঝড়-জল পেরিয়ে এতটা দূর পৌঁছে তীরে এসে তরী যাতে না ডোবে, তাই পরীক্ষা পর্যন্ত সেই রাঁধুনীকে গ্রেফতার না করার জন্য বিশেষ আকুতি জানান বেলা পুলিশের কাছে। পড়াশুনার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য মরিয়া বেলা পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

> কাকাবাবু আমার গয়না যা গেছে তা তো আর পাব না। কিন্তু ঐ কাজের লোকটি না থাকলে আমি যে আই এ পরীক্ষাটা দিতে পারব না। আপনি যদি দয়া করে ওকে এখুনি না ধরেন তাহলে ভালো হয়। আমার পরীক্ষা সামনেই।[৮]

এভাবে মনের জোরে আর পরিস্থিতি সামলে ইন্টারমিডিয়েটে উত্তীর্ণ হলেন বেলা। তবে তিনি লিখেছেন ফল তাঁর আশানুরূপ হয়নি। ছেলে দুর্দান্ত ফল করে। বেলা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। কলেজে পড়ার সুপ্ত বাসনা জানালেন স্বামীকে। সাংসারিক দায়বদ্ধতায় সময়ের অভাবে তখন অনার্স পড়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু যথাসময়ে স্নাতক হন। কিন্তু মনের মধ্যে অনার্স পড়ার জন্য যে খেদ রয়ে গিয়েছিল, তা দূর হল এরপর প্রাইভেটে ইকনমিক্স অনার্স পড়ার সময়। ইচ্ছা থাকলে যে উপায় ঠিক হয়, এই সাধারণ গৃহবধূ তার অকাট্য প্রমাণ। চাকরির ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ হয়ে ওঠেনি তেমন। তবে শ্রীরামপুর গার্লস স্কুলে দুই-তিনবার লিভ ভ্যাকান্সিতে চাকরির সুযোগ পেয়ে, সেই স্বপ্নের আস্বাদ পেয়েছিলেন। মানুষের জীবনে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মন-মানসিকতা-অগ্রাধিকার বদলায়। বেলার জীবনে তার স্বপ্ন ছেলে-মেয়ের প্রতিষ্ঠা। ছেলে বায়োকেমিস্ট্রিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করে আমেরিকায় পাড়ি দিল। মেয়ে বায়োকেমিস্ট্রিতে পি এইচ. ডি করছে। মায়ের কাছে সন্তানদের সাফল্য তখন নিজেরই সাফল্য। আজীবন কদর করেছেন পড়াশুনার। নিজের জীবনে পড়ার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার অবকাশ দেননি। নিজস্ব তাগিদে ও স্বামীর উৎসাহে নতুন উদ্যমে বয়সকে তোয়াক্কা না করে এগিয়ে গেছেন প্রথাভিত্তিক পাঠগ্রহণের ধারাবাহিকতায়। জাতীয় তথ্য বলছে—

> ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নারীশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আনুপাতিক হারে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ঘটেনি।.... নারীশিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের স্বার্থে সহায়ক বাড়তি বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অভিপ্রেত সাফল্য পাওয়া যায়নি; ছাত্র ও ছাত্রীর মধ্যে পরিসংখ্যানগত পার্থক্য থেকে গেছে। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীর অধিককাল পরেও নারীশিক্ষার অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। ১৯৭৮-'৭৯ শিক্ষাবর্ষে এ বিষয়ে একটি জাতীয় সমীক্ষা সম্পাদিত হয়। তদনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মোট বিদ্যার্থীর মধ্যে ছাত্রীরা ছিল চল্লিশ শতাংশ। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়ে হয় তেত্রিশ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের আনুপাতিক হার আরও হ্রাস পেয়ে হয় মাত্র আঠাশ শতাংশ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এই পরিসংখ্যান অধিকতর হতাশাজনক।[৯]

এই তথ্যের প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশে যখন নারীশিক্ষার অনুপাত নিম্নগামী, তখন আত্মসচেতনতায় নিজেকে স্নাত করে নিজস্ব মানসিক তাগিদে বয়স উত্তীর্ণ হয়েও স্নাতক স্তর অবধি পৌঁছানো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। স্মৃতিলিখনে সেই যাত্রাপথের বর্ণনা দিয়ে আগামী প্রজন্মের মনে স্থাপন করলেন অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তির বাস্তবায়নের আদর্শ। যুগ এগিয়েছে, নারীশিক্ষার হার একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আশানুরূপ। তবুও ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা যুগ নিরপেক্ষ। তাই সেইসব ক্ষেত্রে এই 'স্মৃতিপট' অবশ্যই অনুপ্রেরণা সঞ্চারকারী। এই সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতাই একজন সাধারণ অপরিচিতার লেখনীকে করে তুলেছে সাহিত্যপদবাচ্য। শৈলীবিচারে স্বতঃস্ফূর্ত উত্তম পুরুষে সহজ অভিব্যক্তি। সর্বোপরি স্মৃতিলিখনের আধারে বেলা বসুর 'স্মৃতিপট' নারীশিক্ষার অনন্য পরিচায়ক।

তথ্যসূত্র :

১. রায় বিনয়ভূষণ, ঊনবিংশ শতকের স্ত্রীশিক্ষার একটি ধারা : অন্তঃপুর শিক্ষা, চন্দ পুলক (সম্পাদিত), নারীবিশ্ব, দ্বিতীয় মুদ্রণ, গাঙচিল, কলকাতা, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৮৯-৯০।
২. বসু বেলা, স্মৃতিপট, প্রথম প্রকাশ, জয়শ্রী চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৫।
৩. তদেব পৃ. ৩২।
৪. তদেব পৃ. ৫১।
৫. তদেব পৃ. ৫৫।
৬. তদেব, পৃ. ৫৬।
৭. তদেব পৃ. ৬৩।
৮. তদেব পৃ. ৬৭।
৯. মহাপাত্র ড. অনাদিকুমার, ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, পুনর্মুদ্রণ, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৭৯৬।

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 413-424
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.029

দিনাজপুরের গ্রামীণ সমাজে মনোহলী জমিদারির সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

সুরাট সরকার, *স্বাধীন গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশন, গঙ্গারামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

কামানুজ্জামান, *সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গঙ্গারামপুর কলেজ, গঙ্গারামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 31.10.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

History is a living document of the past. Nothing is fixed in the world and nothing stays the same. Everything changes, time changes. The present becomes the past, the future becomes the present. But the past does not change, the past remains the past. It just takes time to rub it again and again. In the collision with time, some go under the dome of time, or endure adversity and sustain their existence. One such ancient dilapidated past is the Manohali Zamindari and zamindar house. This zamindar house is located in Tapan, 30 km from Balurghat, the capital city of Dakshin Dinajpur district. The building was built by Tarachand Bandyopadhyay, the zamindar of Sinni village in Katwar who established his zamindari in the area after the Battle of Plassey. At that time the construction cost of the building was 64000 rupees. Later generations of Zamindars were known to sympathize with the freedom fighters. Zamindar family members also actively

participated in the freedom struggle. This Manohali village existed during a copper plate of Pala Emperor Madan Pala. The Manohali copper plate is found this Manohali village. Here is a lot of history, folklore, and folklore associated with it. This zamindar building has a wonderful and charming architectural display. This easily catches everyone's attention. A lot of ancient and modern Indian history is associated with this Manohali village and Manohali Zamindari.

Keywords: History, Past, Manohali, Zamindari, South Dinajpur, Tarachand Banerjee, Battle of Plassey.

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের এক বিশেষ জেলা হল দক্ষিণ দিনাজপুর। অবস্থানগত দিক থেকে এর তিনদিকেই রয়েছে আন্তর্জাতিক (বাংলাদেশ) সীমানার অবস্থান। এই জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল। এই জেলার গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান গুলি হল- বাণগড়, টাউন ব্যাঙ্ক, মহিপাল নীলকুঠি, ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজির সমাধি, আতাশাহর দরগা বা মাজার, কালদীঘি, ধলদীঘি, তপন দীঘি, মহীপাল দীঘি ইত্যাদি। অভাব নেই প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের। জেলায় বর্তমানে রয়েছে মোট নয়টি থানা- বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর, কুশমন্ডি, হরিরামপুর, কুমারগঞ্জ, হিলি, বংশীহারী ও পতিরাম। এই নয়টি থানার মধ্যে তপন থানার অন্তর্গত একটি বিশেষ গ্রাম হল মনোহলী। এই মনোহলী গ্রামের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আজ থেকে প্রায় নয় শতাব্দী পূর্বের পাল যুগের ইতিহাস। ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে পাল সিংহাসনে আসীন হন মদন পাল। তার শাসনকালের একখানি তাম্র শাসন পাওয়া গেছে এই মনোহলী গ্রামে। তার অষ্টম রাজ্য বর্ষে অর্থাৎ ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে এই তাম্রশাসনটি উৎকীর্ণ হয়। কোটিবর্ষ বিষয়ে ভূমিদানের উল্লেখ আছে এই লেখে। এই তাম্রশাসন থেকে কোটিবর্ষ বিষয়ের অধীন হলবর্ত মন্ডল এর কথা জানা যায়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই মনোহলী গ্রাম থেকেই মদন পালের এই তাম্র শাসন টি আবিষ্কৃত হয়। গুপ্ত যুগের বিষয় ও মন্ডলের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি পাল যুগের পুরোপুরি বজায় থাকেনি এই তাম্রলিপি থেকে সেই চিত্র পরিষ্কার বোঝা যায়। সাধারণত বিষয়ের অধীনে মন্ডল কে রাখা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আবার মন্ডলের অধীনে বিষয়কে রাখা হয়েছিল। এ

পরিবর্তনের অন্তরালে তাহলে কি কোনো কারণ ছিল? সে তো ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কী কারণ ছিল ইতিহাসে তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায়নি। বহু শতাব্দী ধরে কোটিবর্ষ বিষয় ছিল রাজ্যের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। অথচ এই কোটিবর্ষকে প্রথম মহিপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বহুপূরণ প্রসিদ্ধ অমলকী মন্ডলের অধীনে রাখা হয়েছিল।[১] সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা মদনপাল। 'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা প্রখ্যাত কাব্যকার সন্ধ্যাকার নন্দী তার সভাকবি ছিলেন। মদনপালের অগ্র মহিষী ছিলেন চিত্রমতিকা। বটেশ্বর স্বামী নামে জনৈক সামবেদী ব্রাহ্মণ এই ধর্মশীলা নারীকে মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন। যদিও পাল সম্রাটরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম কেউ তারা সম্মান করতেন। এক বৎসরব্যাপী নিত্যদিন অপরাহ্ণে মহাভারত পাঠ করে শোনাবার দক্ষিণা স্বরূপ মদন পাল বটেশ্বর স্বামীকে কোটিবর্ষ বিষয়ের হলাবার্ত মন্ডলে একটি নিষ্কর গ্রাম দান করেছিলেন।[২]

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পর বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হয়। এরপর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের পর বাংলায় 'দ্বৈত শাসনব্যবস্থা' গড়ে ওঠে। দেওয়ানির সনদ অনুযায়ী কোম্পানি বাংলায় মোগল বাদশাহের দেওয়ান হিসেবে কাজ করবে এবং নিজামত ক্ষমতা নবাবের হাতেই ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু বাস্তবে কোম্পানির রাজস্ব আদায় ও নিজামতের দায়িত্ব কোম্পানির মনোনীত মোহাম্মদ রেজা খানের ওপর অর্পিত হয়। এক কথায় কোম্পানি দায়িত্বহীন ক্ষমতা ও নবাব ক্ষমতাহীন যে দায়িত্ব লাভ করে তা ইতিহাসে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এরপর ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পাঁচশালা বন্দোবস্ত, ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দের একশালা বন্দোবস্ত, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের দশশালা বন্দোবস্ত এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা ও জমিদারি ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এরকমই এক জমিদারি হল মনোহলী জমিদারি।

চিত্রঃ ছোট তরফের বাড়ির দুর্গা মণ্ডপের সম্মুখ

এই পর্যায়ে আমরা মনোহলী জমিদারি নিয়ে আলোচনা করব। মনোহলী জমিদারি বাড়িটি যা বর্তমানে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে তা নির্মাণ করেন যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মাণকাল সম্ভবত ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই মনোহলী জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বর্ধমানের কাটোয়ার সিন্নি গ্রামের জমিদার। সেখানেও ছিল তার বিরাট জমিদারি। দিনাজপুরের তৎকালীন মহারাজ টঙ্কনাথের নির্দেশে তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অঞ্চলে আসেন। মহারাজ টঙ্কনাথ তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় কে অনুরোধ করেছিলেন তিনি মহারাজের অনুগত হিসেবে এই অঞ্চলে থাকুন এবং স্থানীয় আঞ্চলিক উন্নয়নের কাজ করুণ। সেই সময় এই মনোহলী অঞ্চল বর্তমানের ন্যায় ছিল না, ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত। জমিদার বাড়ির পাশে একটি তেঁতুল গাছের কোটরে একটি বাঘও থাকতো বলে জানা যায় জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী ও স্থানীয় মানুষজনের লোককথায়। এই বাঘ গ্রামের গবাদি পশু তুলে আনত। একবার একজন কৃষককেও আঘাত করেছিল। পরে কৃষকটি মারা যায়। জমিদারদের দুটি হাতি ছিল। একটি মহিলা হাতি, যার নাম মদনপেয়ারি। সে ছিল খুবই বুদ্ধিমতী এবং শক্তিশালী ও ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন। আরেকটি পুরুষ হাতি ছিল, যার নাম তিনকড়ি। এই মদনপেয়ারি কে সঙ্গে নিয়েই জমিদার যোগেশচন্দ্র ও মহারাজ টঙ্কনাথের উদ্যোগে এই বাঘকে হত্যা করা হয়।

বাঘটিকে গুলি করে হত্যা করেন মহারাজ টঙ্কনাথ, সঙ্গে ছিলেন জমিদার যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এ অঞ্চলে প্রথমে ছিল দুর্ধর্ষ ডাকার দলের উপদ্রব। এই ডাকাত দল স্থানীয় লোকজন ও পথচারীদের সর্বস্ব লুট করে তাদের সর্বস্বান্ত করত। এই ডাকাত দলের সঙ্গে আপোষ করেই প্রথমদিকে জমিদারি প্রতিষ্ঠা, এলাকা উন্নয়ন এবং আবাদি জমি উদ্ধারের কাজ করা হয় বলে জানা যায়। পূর্বের মতো বর্তমানের মনোহলীও রয়েছে শহর থেকে দূরে এক প্রত্যন্ত গ্রামে। যেখানে গ্রামীণ জীবনের সুন্দর সুন্দর চিত্রগুলি চোখে ধরে।

মনোহলী জমিদার পরিবার (সংক্ষিপ্ত)

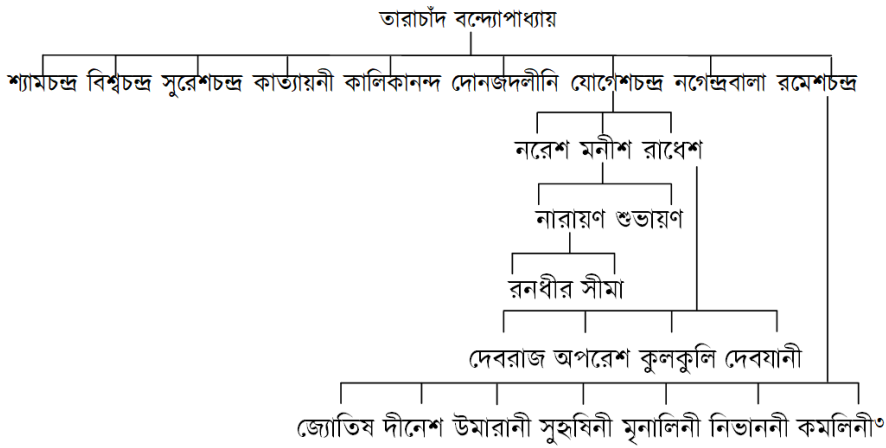

এই জমিদার বংশের একটি সংক্ষিপ্ত বংশ লতিকা তুলে ধরা হলো-

মনোহলী জমিদার বাড়ির সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্যপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান হল শারদীয়া দুর্গোৎসব। ছোট তরফের বাড়ির পাশে নির্মিত দুর্গামন্ডপে মহাসমারোহে এই দূর্গা পূজা হতো। জমিদার বংশের উত্তর পুরুষ রণধীর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গামন্ডপটি নির্মিত হয় এবং সে সময় থেকেই দুর্গাপূজা শুরু হয়। তার আগে তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে ছত্রাহার নামক স্থানে কাছারি বাড়িতেও দুর্গাপুজো হতো। তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই পুজো চালু করেছিলেন। মূলত পুজো শুরু করেছিলেন তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু মন্ডপ করে মহা সমারোহে যে দুর্গোৎসব হয় তা

করেছিলেন তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো উপলক্ষে বিশাল আয়োজন হত জমিদার বাড়িতে। সারা মনোহলী গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষজনেরা আসতেন এই পুজো দেখতে। জমিদারদের তত্ত্বাবধানে হওয়া এই পুজোয় পাঁচ দিন ধরে বিভিন্ন আয়োজন হতো। এই পাঁচ দিন গ্রামের লোকজন এখানে খাওয়া-দাওয়া করত। এই পাঁচ দিন সমগ্র গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে অরন্ধন চলত। বিশাল সমারোহে চলত জমিদার বাড়ির পুজোর অনুষ্ঠান। যাত্রাগান, পালাগান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। পূজা উপলক্ষে মেলা বসত। জমিদার বাড়ি থেকে গ্রামবাসীদের বস্ত্র দান করা হতো। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে প্রচন্ড সমারোহে পুজো হতো। বিভিন্ন মিষ্টান্ন সহযোগে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হতো। এই পুজো হতো তন্ত্র মতে এবং মহা অষ্টমীর দিন বলি হতো। মহিষ বলি দেওয়া হত। বলি দেওয়ার জন্য বিশাল এক কাতলা এবং বিরাট লোহার খড়্গ ছিল। জমিদার বাড়িতে আজও আছে সেই লোহার খড়্গ। একটি পূর্ণবয়স্ক মহিষকে বলি দেওয়া হতো। নিয়ম ছিল বলির মহিষের এককোপে মাথা কাটার। বলির পর কাটা মহিষ মুন্ডু জমিদার একটি থালায় নিয়ে মায়ের কাছে উৎসর্গ করতেন। পরবর্তীতে মণীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে এই বলি বন্ধ হয়। এই বলি বন্ধের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক কাহিনি। জানা যায়, একবার বলির সময় যে মহিষটিকে বলির জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিল না। ২০- ২৫ জন পাইক মিলেও তাকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিল। মণীশচন্দ্র মহিষের সামনে গেলে দেখেন মহিষের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরছে। তিনি অনুভব করেন এটি মহিষটির আকুতি তাকে না মারার। তখন মণীশচন্দ্র বলি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। এই নিয়ে সেই সময় মনীশচন্দ্রের সঙ্গে পিতা যোগেশচন্দ্রের প্রচন্ড বাগবিতন্ডা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিন মণীশচন্দ্র বলি হতে দেননি। মণীশচন্দ্র এই বলি প্রথা একেবারে বন্ধ করে দেন। পরবর্তীকালে মণীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বৈষ্ণব ভক্ত হন। পূর্বে তারা ছিল শাক্ত, শক্তির উপাসক। স্বামী নিত্যগোপাল দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন মণীশচন্দ্র। এই নিত্যগোপাল দেবের আশ্রম ছিল কলকাতায়।

চিত্র: ২০১২ সালে তৈরি নতুন দুর্গা মন্দির। এখানেই বর্তমানে গ্রামবাসীদের দ্বারা পুজা হয়

পুরনো মণ্ডপের পাশে রয়েছে একটি চামুন্ডা মূর্তি। পুজোর সময় ষষ্ঠীর দিন এই চামুণ্ডা মূর্তি টিকে পুজো করা হতো। বিজয়ার দিন বিসর্জন হতো বারোপঙ্খী নামে একটি পুকুরে এবং রীতি মেনে এখনো সেই পুকুরেই বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর মূর্তির কাঠাম তুলে এনে পুরোনো দুর্গা মন্ডপে রাখা হয়। জমিদারি অবসানের পর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পুজোর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় গ্রামের পূজা কমিটির হাতে। জমিদারি বিলোপের পর লোকবল ও অর্থ বলের অভাব দেখা দিলে জমিদার বাড়ির সদস্য মনীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের লোকজন ডেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি গ্রাম কমিটি গঠন করে তাদের হাতে পুজোর দায়িত্ব তুলে দেন। পুরনো মন্ডপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভেঙে পড়ার ভয়ে গ্রাম কমিটি জমিদার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি নতুন মন্দির তৈরি করেছেন। ২০১২ সাল থেকে নতুন মণ্ডপে পূজা হয়। পুজোর দায়িত্ব বর্তমানে গ্রামবাসীরাই পালন করে এবং নিষ্ঠা সহকারে সুন্দরভাবে পুজো করা হয়। একটি গোলা রয়েছে, যার নাম 'ধর্মগোলা'। এই ধর্মগোলায় ধান মজুত করা হয় এবং সেই মজুত করা ধান এবং গ্রামের মানুষের মধ্য থেকে চাঁদা তুলে পুজোর খরচ চালানো হয় ।

মনোহলী জমিদার বাড়িতে হওয়া আরেকটি বৃহৎ উৎসব হলো ইচ্ছাময়ী কালী মায়ের পুজো। ইচ্ছাময়ী কালী মায়ের পূজো ছয় মাস হত ছোট তরফের বাড়িতে আর ছয় মাস হত বড় তরফের বাড়িতে। এই ইচ্ছাময়ী কালী মায়ের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দাঁইহাটের প্রখ্যাত শিল্পী নবীন ভাস্কর। এই নবীন ভাস্করই ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে রানী রাসমনির নির্দেশে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বিখ্যাত ভবতারিণী মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন । নবীন ভাস্করের তৈরি প্রথম মূর্তিটি রয়েছে কলকাতার গোয়া বাগানের বাড়িতে, দ্বিতীয় মূর্তিটি হলো দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিনী মূর্তি এবং চতুর্থ মূর্তিটি হলো এই মনোহলী জমিদার বাড়ির ইচ্ছাময়ী কালী মায়ের মূর্তি। নবীন ভাস্কর কাঁচামাল হিসেবে কষ্টিপাথর সংগ্রহের জন্য বিহারের জামালপুরে একটি আস্ত পাহাড় কিনে নিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মূর্তির রূপকার হয়ে তিনি ভাস্কর্য শিল্পকে এক উচ্চপর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। দিনাজপুরের মহারানী তার শিল্পনৈপুণ্যে খুশি হয়ে তাকে একটি সোনার বাটালি উপহার দিয়েছিলেন।[৪] প্রতি বছরের পৌষ সংক্রান্তিতে ইচ্ছাময়ী কালী মায়ের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমারোহে পুজো হয়। তবে বর্তমানে এই কালীপূজারও সবটাই হয় বৈষ্ণব মতে। নেই কোন শাক্ত মতের প্রভাব, হয় না কোন বলি।

চিত্র: মনহলী ইচ্ছাময়ী কালী মাতা

প্রবেশদ্বার থেকে ছোট তরফের বাড়ি পার করে ভেতরের দিকে কালীর থান দেখা যায়। এর সাথে তান্ত্রিকের কালী আরাধনার স্থান। একসময় এখানে খোঁরাখুরি করতে কিছু প্রাণীর খুলি বেরিয়ে আসে। জমিদার বংশের উত্তর পুরুষ রণধীর বন্দোপাধ্যায় জানান, এখানে থাকতেন জমিদারদের তান্ত্রিক। তখন প্রাচীন জমিদার ও রাজাদের তান্ত্রিক রাখা হতো। এই তান্ত্রিক কে বলা হতো চৌধুরী তান্ত্রিক। তিনি এসেছিলেন বীরভূমের পাঁকুড় এলাকা থেকে। জমিদারদের উন্নতির জন্য তিনি এখানে তন্ত্রসাধনা করতেন। বেজি, বিড়াল, বন-বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীর খুলি নিয়ে তন্ত্রসাধনা করতেন সেই তান্ত্রিক। তারপর হঠাৎই একদিন তিনি এখান থেকে চলে যান ।তার কোন হদিশ আর পাওয়া যায়নি।

এই মনোহলী গ্রামে রয়েছে একটি পুকুর। যার নাম মল্লিকাহার। পাল বা সেন বংশের এক রাজকুমারী মল্লিকার নাম অনুসারে এই নাম হয়েছে। রাজকুমারী মল্লিকা এখানে আসতেন এবং এই পুকুরে স্নান করে শিব মন্দিরে পুজো দিতেন। সেই শিব মন্দিরটির বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই। শিব মন্দিরটি এখন মাটির তলায় চলে গেছে। শিবরাত্রির দিনে এই মন্দিরে বিশেষভাবে পূজা হতো এবং রাজকুমারী মল্লিকাও পূজা দিতে আসতেন। এই পুকুর থেকে বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। যেগুলি বর্তমানে রয়েছে বালুরঘাট মিউজিয়াম ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে। এছাড়া এখান থেকে সেন আমলের কষ্টি পাথরের বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে।

চিত্র: বর্তমান মনোহলী পোস্ট অফিস ও প্রাচীন জমিদারি এস্টেটের থানা

গঙ্গারামপুর ফোয়ারা মোড় থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে মনোহলী গ্রাম। শহর থেকে দূরে অবস্থিত এই গ্রামে চোখে পড়ে সুন্দর গ্রামীন পরিবেশ। সুবিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের অপূর্ব সৌন্দর্য সহজেই নজর কারে। এই গ্রামেই রয়েছে সেই জমিদার বাড়ি যা মনোহলী জমিদার বাড়ি নামে পরিচিত। রাস্তা দিয়ে জমিদার বাড়িতে ঢুকতেই প্রথমে যেটি চোখে পড়ে সেখানে বর্তমানে মনোহলী গ্রামের পোস্ট অফিস রয়েছে। সে সময় এখানে ছিল জমিদারি এস্টেটের থানা। জমিদারি নিজস্ব পাইক, সিপাহী, বরকন্দাজরা এখানে থাকতো। জমিদার ভবনের দুটি আলাদা ভাগ রয়েছে। যেটি আগে তৈরি হয় তাকে বলা হয় বড় তরফ। জমিদার বাড়ির এই বড় তরফের ভবনটি তৈরি হয় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। অন্য অংশটি হলো ছোট তরফ। জমিদার বাড়িতে রয়েছে জলসাঘর। সেসময় সেখানে চলত নাচ, গান, বিনোদন। এই ছোট তরফের সঙ্গেই রয়েছে দুর্গা মন্ডপ। রাজমহলের পাথর, চুন, সুরকি দিয়ে মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছিল।[৫] ছাদ ছিল লোহার পাটাতনের উপর ঢালাই দেওয়া। এই পাঠাতন গুলি নিচ থেকে দেখা যায়। ছোটো তরফের ভবনের সামনে উঠানে রয়েছে তুলসী মন্দির। উঠোন পেরিয়ে রয়েছে ঘাট বাঁধানো পুকুর। ছোট তরফের বাড়িটি তৈরি হয় ১৮৯০ সালে, তৈরি করেন যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ডপ তৈরি হয় যে শৈলীতে তা হলো গ্রিক ও রোমান মিশ্র শৈলী। এই মন্ডপের খিলানগুলি দেখলেই তা সুন্দরভাবে বোঝা যায়। এই বাড়ি এবং মন্ডপ তৈরি হয় যে স্থপয়িতার নির্দেশে তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার। একজন ব্রিটিশ প্রকৌশলীর পরামর্শ এবং নকশা তেই এই ভবন এবং মণ্ডপটি তৈরি হয়েছিল। যদিও বর্তমানে সমগ্র ভবনটি ভগ্নপ্রায়। বর্তমানে দুর্গা মন্ডপটিকে ঘেরা দিয়ে রাখা হয়েছে।

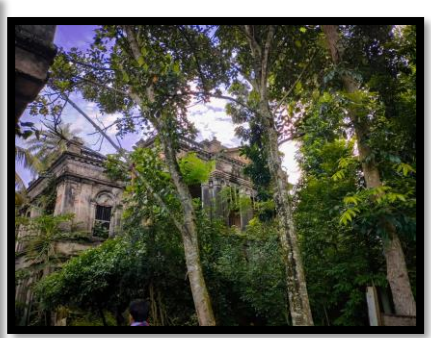

চিত্র: জমিদার বাড়ির কিছু চিত্র

মনোহলী জমিদার পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়। মনোহলী জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশদের অনুগত হলেও যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র মণীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ছিলেন অনুশীলন দলের একজন সদস্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত থাকার অপরাধে মণীশচন্দ্র বহুবার কারাবন্দী হয়েছেন। দিনাজপুরে স্বদেশীদের নেতৃত্বে যে রেল ডাকাতি হয় সেই রেল ডাকাতিতেও মণীশচন্দ্র জড়িত ছিলেন। এমনকি একসময় তাকে ধরার জন্য ব্রিটিশ সরকার হুলিয়া জারি করেন। মনীশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুশীলন দলের সদস্য ছিলেন। নারায়ণচন্দ্র বহুবার ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। একবার দিনাজপুর শহরে যমুনা নদীর উপর একটি ব্রিজে ব্রিটিশ পুলিশ নারায়ণচন্দ্র কে লক্ষ্য করে গুলি করে। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান এবং পুলিশদের থেকে পালাতে নদীতে ঝাপ দেন।

অতীতের সেই গৌরবময় মনোহলী জমিদার বাড়ি আজ অনেকটাই ধ্বংসের পথে। জেলার মানুষজন প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়িটির কথা এক প্রকার ভুলতেই চলেছে। সংস্কার এবং ইতিহাস বিমুখতার জন্য তা মানুষের স্মৃতির নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভবনের পালিশ খসে পড়েছে, ইটগুলি ক্ষয় হয়ে গেছে, জানালার লোহাগুলিতে মরিচা ধরেছে, ঘুণ ধরেছে কাঠে। অনেক স্থানে সৌন্দর্য লুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে যেভাবে আছে এভাবে চললে, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না হলে ভবিষ্যতে হয়ত ধ্বসে পড়বে এই বিশাল জমিদার বাড়িটি। যদিও জমিদার পরিবারের পক্ষ থেকে রক্ষণাবেক্ষণের অনেক ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে । কিন্তু তাই বা আর কতদিন!

তথ্যসূত্র*:*

(১) ধনঞ্জয় রায়, দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ৪২

(২) নির্মল সরকার, দিনাজপুরের না বলা কথা, আত্রাই প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২৮ মার্চ, ২০২২, পৃষ্ঠা- ১২৪

(৩) এই বংশ লতিকাটি তৈরি করতে সমিত ঘোষ- এর লেখা 'দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাকীর্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস' বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

(৪) বর্তমান পত্রিকা, ১৭ জানুয়ারি, বুধবার, ২০২৪

(৫) https://drishtibhongi.in

(৬) ব্যক্তি সাক্ষাৎকার: রণধীর বন্দ্যোপাধ্যায়। জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র হলেন এই রণধীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 424-436
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.030

বাউল মতাদর্শ: উৎস, বিকাশ ও সাধক-শিল্পীদের অবদান

নিরঞ্জন মণ্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত*

Received: 12.11.2024; Accepted: 29.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Baul philosophy is a unique strand of Bengali culture, shaped through spiritual thought, social context, and music. Its origins lie in a blend of folk religious beliefs and the influences of Tantra, Sufism, and Vaishnavism. The Bauls prioritize the exploration of life's fundamental rhythm, emphasizing the doctrines of body and human nature. The development of Baul philosophy was notably influenced during the 18th and 19th centuries. Figures such as the mystic Lalon Shah, Harinath Majumdar, and Bhaba Pagla popularized Baul thought through music and poetry. They stood against social divisions, religious dogma, and superstition, advocating humanistic ideals. Through their practice and music, Baul practitioners and artists led people into a deeper understanding of body metaphysics. Their songs reflect the simplicity of life, insight into the human mind, and the connection with the divine. The philosophical nature of Baul music serves not only as entertainment but also as a medium for spiritual liberation. Today, Baul philosophy is an integral part of Bengali identity. This tradition holds a special place in the rural life of Bengal and within the broader global Bengali culture.

Keywords: Baul, Humanism, Vedas, Upanishads, philosophy**.**

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতানুসারে, বাউল শব্দটি এসছে সংস্কৃত শব্দ বাতুল শব্দ থেকে। বাতুল শব্দটিই প্রাকৃতে বাউল রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আবার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাউল শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, বায়ু শব্দের সঙ্গে 'ল' (আছে অর্থদ্যোতক) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাউল শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। যোগশাস্ত্র অনুসারে, বায়ুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্নায়বিক শক্তি বর্ধিত করা যায়। তাই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা বায়ু নিয়ন্ত্রণের এই সাধনা যারা করেন, তারাই বাউল। আর একজন গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আরবি শব্দ আউলিয়া থেকে আউল এবং আউল থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। প্রসঙ্গত, সুফী সাধকদের একটি সম্প্রদায় আউলিয়া নামে পরিচিত। এই মত মেনে নিলে, বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুফী সাধকদের একটি যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। আহম্মদ শরীফ ও মুহম্মদ আব্দুল হাই তাঁদের গবেষণায় 'ব্যাকুল' থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি – এই মতকেই স্বীকৃতি দান করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে এই যুক্তি দিয়েছেন যে, বাউল সম্প্রদায় সমাজে চিরকালই ব্রাত্য বা অবহেলিত। তাই, উপহাস ছলে তাদের ব্যাকুল(ভাবোন্মাদ) বা বাতুল(অপদার্থ) বলা হয়েছে। অধ্যাপক এস এম লুৎফর রহমানের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অবহট্ট রচনা ও চর্যাগীতিতে উল্লিখিত বাজিল, বাজুল, বাজ্জিল – এই শব্দগুলি বাউল শব্দেরই পূর্বরূপ। তাঁর মতে, বজ্রী শব্দটি থেকে অভিযোজিত হয়ে বাউল শব্দটির উৎপত্তি এইভাবে, বজ্রী > বজ্জির > বাজিল/ বজ্জিল > বাজিল > বাজুল > বাউল। অধ্যাপক আহম্মদ শরীফ এই মতকে স্বীকৃতি দান করেছেন ও তিনি এই মতানুসারে, বজ্রযানী বৌদ্ধ সাধকদের সঙ্গে বাউলের একটি যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করেছেন। আহম্মদ শরীফ বিষয়টিকে আর একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, বজ্রযান সম্প্রদায়কেই যদি ব্রজকুল বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে এই ব্রজকুল সম্প্রদায় থেকেই বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মত গ্রহণ করলে বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে। বেশিরভাগ গবেষকগণ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু, কোন ধর্মসম্প্রদায়ই রাতারাতি সৃষ্টি হতে পারে না, বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভবেরও দীর্ঘ ইতিহাস আছে। আমরা আমাদের আলোচনার

মাধ্যমে বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টির শিকড়ে পৌঁছাবার চেষ্টা করবো। ভারতবর্ষীয় তথা বাংলার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে বাউল সম্প্রদায় কীভাবে উদ্ভূত হল, সেই দীর্ঘ পথকেই আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো।

বাউলদের মতে –

> "আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল সহজ-নিত্য মানব-সত্যের উপরে। কাজেই যতকাল মানব, ততকাল এই সহজ বাউলিয়া মত। বেদ পথ তো সেদিনের। তাহা তো কৃত্রিম। ঋষিরা সেইদিন তাহা রচনা করিয়াছেন। বাউলিয়া মতই অনাদি কালের। বেদের আদি আছে।"[১]

মানব সভ্যতার সৃষ্টি থেকে প্রাকৃতিক নিয়মেই মানব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। তাই বাউলরা মনে করে বেদের মধ্যেও মানব ধর্মের সংমিশ্রণ হয়েছে আর বাউলরা যেহেতু সেই আদি মানব ধর্মের অনুসারী তাই তারা বেদ মানে না বরং তারা বেদের মধ্যে উল্লেখিত মানব ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুসরণ করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়—

> "বাহিরের বেদকে বিদায় দিলেই অন্তরের বেদ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই 'অন্তরবেদ' মানিলে শাস্ত্রের প্রয়োজন আর থাকে না। পূজা-রোজা-নিয়ম-নেমাজ সবই ঘুচিয়া যায়। জাতি-বর্ণ প্রভৃতির ভেদ বুদ্ধিরও অবসান হয়। ইহারই নাম কায়াগত সহজ বেদ। এই বেদই বিশ্বের আকাশে নানারূপে নিরন্তর মূর্তিমন্ত ও ধ্বনিত।"[২]

বাউল সাধনায় বেশ কিছু প্রাচীন ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন – প্রজ্ঞা উপায়, শিবশক্তি ও মানব ধর্ম। এইবার আমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবো তা হল 'মানব ধর্ম'। বাউলদের সাধনার মূলমন্ত্র হল 'মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান'। এই চিন্তাধারা বাউলদের প্রভাবিত করেছে যা ভারতীয় দর্শন ও তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। বাউলদের মানবধর্মের ধারণাটি আদি ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তাধারা ও দর্শন থেকে এসেছে। বৈদিক যুগ থেকেই মানুষের মধ্যে দেবত্বের অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন দর্শন উদ্ভূত হয়েছে। উপনিষদে বিশেষভাবে আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের ধারণাটি আলোচিত হয়েছে, যা বাউল সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সিন্ধু সভ্যতা, যা আজ থেকে প্রায় ৫৫০০ বছর আগে গড়ে উঠেছিল, তখনকার মানুষ বিভিন্ন ধর্মীয় চেতনা ধারণ করতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এই চেতনা মূলত প্রকৃতি ও প্রাণী

কেন্দ্রীক ছিল, যেমন পশু, গাছ, পাখি এবং জলের প্রতি শ্রদ্ধা। সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে এমন কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়, যা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা এবং মানবিক সংহতির ওপর ভিত্তি করে ছিল। যদিও তারা নির্দিষ্ট দেবদেবীর পূজায় বিশ্বাসী ছিল, তবুও তাদের চেতনা মূলত মানবিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। বাউলদের মানব ধর্মের সাধনা অনেকটাই প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল, যা সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় ভাবনার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তাদের মধ্যে মূল বিশ্বাস হলো মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের অবস্থান এবং প্রকৃতির মাধ্যমে সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। এই দর্শন সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের প্রকৃতির প্রতি বিশ্বাসের সাথে মিল রেখে চলে, যা প্রাক-আর্য ধর্মীয় ভাবনার প্রভাব প্রকাশ করে। তবে, সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় জীবন সরাসরি বাউলদের মত মানব ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি; বরং বলা যায়, সেই যুগের প্রাকৃতিক চেতনা ও মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আজকের বাউলদের মানব ধর্মের ধারণা গড়ে উঠেছে। সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় দর্শন ও বাউলদের মানব ধর্মের সাধনা সরাসরি এক নয়; তবু বলা যায়, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রকৃতির সম্মিলনে সৃষ্ট মানবিক ধর্মীয় চেতনা, যা আমরা বাউলদের মধ্যে দেখি, তার শিকড় সিন্ধু সভ্যতার প্রাকৃতিক বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। সহজিয়া দর্শন, যা বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান এবং তান্ত্রিক প্রথার সাথে সম্পর্কিত, বাউলদের মানবধর্মের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। সহজিয়া তত্ত্বের মূলমন্ত্র ছিল দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জন করা। সহজিয়া দর্শন মানুষকে ব্রহ্ম বা পরম সত্যের প্রকাশ হিসেবে দেখে, এবং এই ধারণাটি বাউল সাধনায় মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। সুফি এবং ভক্তি আন্দোলনও বাউলদের মানব ধর্মের সাধনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। সুফি সাধনার মূলে আছে প্রেম ও সমর্পণ, যা বাউল দর্শনের সাথে মিলে যায়। এছাড়া, ভক্তি আন্দোলনও একইভাবে ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করার শিক্ষা দেয়, যা বাউলদের আধ্যাত্মিক পথে অনুপ্রাণিত করে। চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবধারা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ বাউলদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। চৈতন্য দর্শন মতে, ঈশ্বরকে মানুষের মধ্যে খুঁজে পেতে হবে, যা বাউলদের জন্য মানবধর্মের প্রতি অগ্রসর হওয়ার একটি প্রভাবশালী দিক হয়ে উঠেছে। বাউলদের মানব ধর্মের সাধনার মূল

ভিত্তি হলো মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের বসবাস এবং সকলের মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি। বাউলরা বিশ্বাস করে, মানুষকে ভালবেসেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়। এই মানবধর্মের ভাবনা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দর্শনের সাথে মিলে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র বাউল তত্ত্ব গঠন করেছে, যা মানবতার প্রতি গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

এবার আমরা বেদ ও উপনিষদের বিভিন্ন শ্লোকে বাউল সাধনার যে দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো—

ক। ঋকবেদ-এর শ্লোকের বিশ্লেষণ—

আ যদ রুহাব বরুনশ্চ নাবম।
প্র যৎ সমুদ্রম ঈরয়াব মধ্যম।।[৩]

ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি তে বাউল সাধনার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যা আত্মোপলব্ধি ও প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের দিকে ইঙ্গিত করে। শ্লোকটি বোঝায় যে, বরুণ দেবের কৃপায় সমুদ্রের মধ্যস্থলে পৌঁছনো সম্ভব, যা বাউল সাধনার অন্তর্নিহিত ধারণার সাথেও মিলে যায়। বাউল সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য হল আত্ম-অন্বেষণ, যা বাইরের রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার থেকে ভিন্ন। বাউলরা বিশ্বাস করেন, সৃষ্টির গভীরে আত্মা বা পরমতত্ত্বকে অনুভব করতে হলে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং অন্তর্দৃষ্টি ও আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে সেই তত্ত্বের সন্ধান করতে হবে। বাউল দর্শনে 'মানুষের হৃদয়' বা অন্তর্দৃষ্টি হলো এক গভীর সমুদ্রের মতো, যেখানে সব জ্ঞানের মূল নিহিত। শ্লোকটির অর্থ এইরকমভাবে অনুধাবন করা যায়- 'বরুণ দেব, যিনি আকাশে বিরাজ করেন, তাঁর কৃপায় আমরা মহাসমুদ্রের মধ্যস্থলে পৌঁছাতে চাই'। এখানে 'মধ্যম সমুদ্র' একটি রূপক, যা সকল সৃষ্টির মূল নির্যাস এবং প্রকৃত সত্যকে নির্দেশ করে। বাউল সাধনায়ও এই অন্বেষণের রূপ দেখা যায়, যেখানে তারা জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থকে অনুধাবন করতে চায় এবং এই দেহকেই তীর্থ মনে করে আত্মার সন্ধান করে। বাউলদের মতে, দেহের মধ্যে সেই 'মহাসমুদ্র' রয়েছে, যেখানে একনিষ্ঠ ভাবে চর্চা ও সাধনা করে আত্মোপলব্ধি করা সম্ভব। তাই, বাউল সাধনা এবং ঋগ্বেদের এই শ্লোকের মধ্যে মূল ভাবটি অভিন্ন, উভয়েই সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা, প্রকৃতির সঙ্গে মিলন এবং আত্মার সন্ধানের উপর গুরুত্বারোপ করে।

উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা।
বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।।[৪]

ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি বাউল সাধনার কিছু মূল ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ উভয়েই অদ্বৈত, প্রেম, এবং গভীর আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করে। এখানে, বিষ্ণুর পদ বা 'উচ্চতম পদে' পৌঁছানোকে মধুর উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পথের প্রতি অন্তর্নিহিত ভালোবাসা এবং মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে। এই ধ্যানের পথ বাউল সাধনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ বাউলরা বিশ্বাস করে প্রেমের পথে তাদের অন্তরের ভগবান বা আত্মাকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে আসল সত্য লুকিয়ে থাকে। এই শ্লোকের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য যা বাউল সাধনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ১। উচ্চ আদর্শ ও প্রকৃতির সাথে ঐক্য— শ্লোকে বিষ্ণুর পদকে 'মধুর উৎস' বলা হয়েছে, যা প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সাথে মিলনের এক রূপক হিসেবে ধরা যায়। বাউলরা প্রকৃতির এবং সমস্ত জীবের সাথে মিলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক মুক্তি খোঁজেন। ২। প্রেম ও আনুগত্য— শ্লোকের মধুরতা এবং ভক্তির ওপর ভিত্তি করে বিষ্ণুর প্রতি প্রেম এবং আনুগত্য প্রকাশিত হয়। বাউল সাধনাতেও ভক্তি ও প্রেমের চর্চা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যা তাদের জাগতিক সম্পর্ক এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আলোকিত হয়। ৩। মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা— এই শ্লোকে বিষ্ণুর পদে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা মোক্ষের প্রতীক। বাউলরা মনে করেন, মানবদেহেই ঈশ্বরের সন্ধান লুকিয়ে রয়েছে, এবং তাঁরা বিভিন্ন সাধনা ও গান গাওয়ার মাধ্যমে এই মোক্ষ অর্জন করতে চান। সুতরাং, ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি বাউল সাধনার মূল ভাবনাগুলির একটি প্রতিফলন, যেখানে আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং মোক্ষের প্রতি আকর্ষণ এবং আত্মার মিলনের ধারণা একইভাবে প্রকাশ পায়।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি
অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।।[৫]

ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি (ঋগ্বেদ ১০.১২৫.৩) দেবী উষা বা অম্বার থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়, যেখানে 'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈ' উক্তির মাধ্যমে সৃষ্টির সার্বজনীন শক্তি বা মহাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। এখানে বাউল সাধনার কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়, যা মূলত যোগ, ঈশ্বরের সাথে একাত্মতা ও বিশ্বচেতনার ধারণার সাথে

সম্পর্কিত। আমি রুদ্রদের (শক্তিশালী দেবতা) সাথে ঘুরে বেড়াই এবং আমি বসুদের সাথে চলি, আমি আদিত্যদের সাথে এবং সকল দেবতার সাথেও আছি''। এখানে 'আমি' বলতে সার্বজনীন শক্তি বোঝানো হয়েছে, যা দেব-দেবীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় এবং বিশ্বে বিরাজমান। ১. সর্বজনীনতার ধারণা: বাউল সাধনা সৃষ্টিকর্তার মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান করে এবং জীব-জগতের সাথে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করে। ঋগ্বেদের এই শ্লোকও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সকল জীবের একাত্মতার বার্তা দেয়। ২. সাধনার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি: বাউলগণ নিজের মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করার চেষ্টা করে, যা এই শ্লোকের ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে। 'অহম' শব্দটি এখানে আত্মোপলব্ধির কথা বলে, যা বাউলদের অনুশীলনেও গুরুত্বপূর্ণ। ৩. বিশ্বচেতনার সাথে সংযোগ: শ্লোকটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, দেবতা ও প্রাণীর মধ্য দিয়ে এই শক্তি সর্বত্র বিরাজমান, যা বাউল চিন্তাধারায় অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। এইভাবে, ঋগ্বেদের এই শ্লোকটি বাউল সাধনার সার্বজনীনতা, আত্মোপলব্ধি এবং বিশ্বচেতনার বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত।

খ। যজুর্বেদ-এর শ্লোকের বিশ্লেষণ—

কেশ্বন্তঃ পুরুষ আবিবেশ
কান্যন্তঃ পুরুষে আর্পিতানি।[৬]

উপরোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি যজুর্বেদ থেকে গৃহীত এবং এটি 'বাউল সাধনা' বা বাউল দর্শনের সাথে যুক্ত করার মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ধারণ করে। এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করলে বাউল দর্শনের সাথে এর সম্পর্ক উন্মোচিত হয়। ১। 'কেশ্বন্তঃ পুরুষ আবিবেশ' – অর্থাৎ 'পুরুষ বা জীব (আত্মা) সর্বত্র বিরাজমান', জীব আত্মা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বাউল দর্শনেও একইভাবে জীবকে সর্বত্র বিরাজমান এবং পরম সত্তার অংশ হিসেবে দেখা হয়। বাউল সাধকগণ বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টিকর্তা ও আত্মা এক, এবং সেই সত্যটি খুঁজতে তাদের আধ্যাত্মিক পথে সাধনা করতে হয়। ২। 'কান্যন্তঃ পুরুষে আর্পিতানি' – এখানে বোঝানো হয়েছে যে সকল কিছু পুরুষ বা সেই আধ্যাত্মিক চেতনার অংশ হিসেবে নিহিত। বাউল দর্শনে, আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধানই মূল উদ্দেশ্য এবং সব কিছুই এক সর্বোচ্চ চেতনার মধ্যে আবদ্ধ। ৩।সর্বত্র বিরাজমান চেতনা: বাউল সাধনা মূলত একচেতনবাদী ধারণায়

বিশ্বাসী, যেখানে তারা মনে করে যে সৃষ্টিকর্তা বা চেতনা সর্বত্র বর্তমান। উপরের শ্লোকেও পুরুষকে সর্বত্র বিরাজমান বলা হয়েছে, যা এই ধারণাকে প্রতিফলিত করে। ৪। আধ্যাত্মিক প্রেম: বাউল দর্শন আধ্যাত্মিক প্রেমকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং তারা মনে করে এই প্রেমের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চেনার চেষ্টা করে। এই শ্লোকেও সেই প্রেম ও সংযোগের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। ৫। অন্তর্মুখী সাধনা: বাউল দর্শনে বাইরের থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্তরের অনুসন্ধানকে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, আসল সত্য আত্মার মধ্যেই নিহিত। শ্লোকটি বাউল সাধনার এই ধারণাকেই সমর্থন করে যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য আত্মার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই শ্লোকটি বাউল সাধনার মূল ধারণাগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেখানে আত্মার গভীরে যেতে হবে এবং সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে।

গ। উপনিষদ-এর শ্লোকের বিশ্লেষণ—

দ্বা সযুজা সখায়া।[৭]

বাউল সাধনা এক বিশেষ আধ্যাত্মিক পথ, যা আত্মার মুক্তি এবং মানুষের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনে নিবেদিত। এই সাধনার মূল ভাবধারার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে মানব প্রেম, একত্বের বোধ, এবং দ্বৈততা থেকে মুক্তি। বাউলগণ প্রথাগত ধর্মীয় আচরণের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যকে খোঁজে। 'দ্বা সযুজা সখায়া' এই সংস্কৃত শ্লোকটি সরাসরি উপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে, যার মানে হল দুই বন্ধু, বা সহযাত্রী যারা একসঙ্গে আছেন। এই শ্লোকটি বাউল সাধনার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে একাধিক কারণে ১। সহযাত্রীতা ও একত্বের বোধ: বাউল সাধনায় গুরু-শিষ্য বা দুই বন্ধুর মধ্যে যে আত্মিক বন্ধন, তা একেই প্রতিফলিত করে। বাউলগণ মনে করে যে, মানুষ যদি অন্য মানুষের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে, তাহলে তার অন্তর আত্মার সাথে একাত্মবোধ লাভ করতে পারে। ২। দ্বৈততার অভাব: 'দ্বা সযুজা সখায়া' শ্লোকটি দুটি পৃথক সত্তার মিলনের প্রতীক, যা বাউলদের অদ্বৈত বোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাউল সাধনায় আত্মা ও পরমাত্মার মিলন কল্পনা করা হয় দুটি বন্ধুর মত, যারা একে অপরের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। ৩। মানবতাবাদ ও আত্ম পথের সন্ধান: এই শ্লোকের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, আত্মার উন্নতি ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশের জন্য

মানুষকে তার চারপাশের মানুষের সাথে মেলবন্ধন তৈরি করতে হবে। বাউলগণ তাদের গানের মাধ্যমে এই বন্ধুত্ব ও সাম্যের কথা প্রচার করে, যা 'দ্বা সযুজা সখায়া' শ্লোকের ভাবের সাথে মিলে যায়। 'দ্বা সযুজা সখায়া' শ্লোকটি বাউল দর্শনের সহমর্মিতা ও একাত্মতার ভাবকে প্রকাশ করে, যা আত্মার মুক্তির জন্য মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব ও একতার প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিফলিত করে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।[৮]

উক্ত শ্লোকটি কঠ উপনিষদ থেকে গৃহীত, যেখানে আত্ম-সাধনার গভীরতা এবং জ্ঞানের প্রকৃত উপলব্ধি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। শ্লোকটি বাউল সাধনার আদর্শের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ এবং তাদের জীবনদর্শনের কিছু মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। 'এই আত্মাকে কথোপকথন, তর্ক-বিতর্ক, বা প্রচুর শ্রবণ দিয়ে পাওয়া যায় না। যাকে আত্মা নিজে বেছে নেন, সেই ব্যক্তি আত্ম-প্রাপ্তিতে সফল হন। আত্মা স্বয়ং তার শারীরিক রূপকে প্রকাশ করে'। ১। প্রচলিত শিক্ষা বা যুক্তি-বিচারের বাইরে থাকা: শ্লোকটি নির্দেশ করছে যে আত্মজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অর্জন কেবলমাত্র তর্ক বা যুক্তির মাধ্যমে সম্ভব নয়, বরং এটি একটি অন্তর্গত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। বাউল সাধনায়ও একইভাবে মন ও আত্মার গভীরতা অন্বেষণের গুরুত্ব দেওয়া হয়। ২। ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি: বাউল সাধনার প্রধান আদর্শ হল ঈশ্বরকে বাহিরে নয় বরং নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করা। ঠিক তেমনি, এই শ্লোকেও বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে সক্ষম হয়, যাকে ঈশ্বর নিজেই বেছে নেন এবং যার প্রতি তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চান। ৩। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গুরুত্ব: বাউলরা বহির্জগতে নয় বরং অন্তর্জগতে ঈশ্বরের সন্ধান করে। উপনিষদের এই শ্লোকটিও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্বারোপ করে, যা বাহ্যিক বক্তৃতা বা শিক্ষার মাধ্যমে নয় বরং আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে সম্ভব। ৪। আত্ম অনুসন্ধান: এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃত জ্ঞানলাভ তখনই সম্ভব, যখন আত্মা নিজেই নিজের আসল রূপটি প্রকাশ করে। বাউল সাধনায় 'দেহতত্ত্ব' বা শরীরকে 'দেবতা' বলে মানা হয়, যা এই ধারণারই প্রতিফলন। সুতরাং, এই

উপনিষদীয় শ্লোকটি বাউল সাধনার অন্তর্নিহিত ধ্যানধারণার সাথে গভীরভাবে মিলে যায় এবং তাদের আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

বাউল দর্শনের মূল কথা হলো মানবতার চেতনা এবং মানুষের অন্তর্গত জগতের অনুসন্ধান। তারা বিশ্বাস করে যে, মানবদেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার আসল আবাস। বাউলরা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে মানে না, বরং তাঁদের বিশ্বাসের কেন্দ্রে রয়েছে মানবপ্রেম, সহজিয়া সাধনা, এবং দেহতত্ত্ব। (ক) বৈষ্ণব আচার— বাউলরা বৈষ্ণব ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, বিশেষত কৃষ্ণ ভক্তির প্রতি নিবেদিত। এ আচারগুলোর মধ্যে পঞ্চভূত পূজা, দেহতত্ত্বের অনুসন্ধান, এবং সাধন ভজনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। (খ) দেহতত্ত্ব ও সহজিয়া সাধনা— বাউল সাধকরা বিশ্বাস করে যে দেহের ভেতরেই সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্য লুকানো রয়েছে। সহজিয়া সাধনার মাধ্যমে তারা দেহতত্ত্ব উপলব্ধি করে এবং সহজিয়া পথে আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করে। একজন বাউল সাধক হওয়ার জন্য গুরু বা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের নির্দেশনা প্রয়োজন। সাধক গুরু থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে এবং তার আদেশ মেনে সহজিয়া সাধনার পথ ধরে আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা করে। বাউল সাধনায় প্রধানত মনের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ, এবং ভজন ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জন করা হয়। (গ) মনোযোগের অনুশীলন— বাউল সাধনায় মনোযোগ বা ধ্যানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ধ্যানের মাধ্যমে তারা দেহের অভ্যন্তরীণ অনুভূতির ওপর নজর রাখে এবং মনের গভীরে প্রবেশ করে। (ঘ) ভজন ও বাউল গান— বাউল সাধকরা ভজন ও বাউল গানের মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশ করে। গান ও সঙ্গীত তাদের সাধনার একটি প্রধান মাধ্যম, যা দিয়ে তারা মানবপ্রেম ও দেহতত্ত্বের বিষয় প্রকাশ করে। বাউল সাধনার মূল মন্ত্র হলো মানবতাবাদ। একজন বাউল সাধক মনে করে, সকল ধর্মের মূল হলো মানবপ্রেম। তাই তারা প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। তারা ভেদাভেদ মুক্ত হয়ে সমস্ত মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করে। বাউল সাধকরা সাধনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রীতিনীতি পালন করে। সাধনায় তারা নির্জনতা, ব্রহ্মচর্য, এবং উপবাস পালন করে। (ঙ) নির্জন সাধনা— একাকী নির্জন স্থানে সাধনা করা বাউলদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এতে তাদের মনোযোগ বজায় থাকে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি

পায়। (চ) আধ্যাত্মিক মিলন ও মেলা— বিভিন্ন বাউল মেলা ও আধ্যাত্মিক আসরে অংশগ্রহণ করে সাধকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে। বাউল সাধকদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, তাদের সাধনা মানবতাবাদ, সহজিয়া ভাব, এবং প্রেমতত্ত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

বাউল সাধক এবং বাউল শিল্পীদের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে প্রথমে তাদের মূল পার্থক্য এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের দিকটি বুঝতে হবে। বাউল সাধকেরা মূলত আধ্যাত্মিক সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে থাকে এবং তাদের জীবন দর্শন মূলত আত্মিক মুক্তির দিকে ধাবিত। এরা দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের দর্শনকে তুলে ধরে। বাউল সাধকেরা সাধারণত লালন ফকির, ফকির আফজল শাহ, বংশীবদন শাহের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের অনুসরণ করে, যাদের জীবন ও দর্শন মরমী সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা সাধনা ও সংগীতের মাধ্যমে দেহ, আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে। তাদের গান ও সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং মানবাত্মার মহিমাকে তুলে ধরা।

অন্যদিকে, বাউল শিল্পীরা বাউল গানের ধারক ও বাহক হিসেবে বিভিন্ন মঞ্চে বাউল গান পরিবেশন করে এবং এটি পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে করে। যদিও অনেক বাউল শিল্পীর মধ্যে বাউল দর্শন অনুরণিত হয়, তারা সাধারণত আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে পুরোপুরি উৎসর্গিত নাও হতে পারে। বাউল শিল্পীরা মঞ্চ, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদিতে বাউল গান পরিবেশন করে থাকে এবং এতে তারা অর্থ উপার্জনের জন্যও গান পরিবেশন করে। ১। আধ্যাত্মিক সাধনা বনাম পেশাগত দিক— বাউল সাধকেরা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জগতে ডুবে থাকে, যা তাদের সাধনার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, বাউল শিল্পীরা বাউল গানের প্রচারে মনোযোগী হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়। ২। গান ও সাধনার উদ্দেশ্য— বাউল সাধকেরা আত্মিক মুক্তি ও ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে গান করে, যা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অংশ। অপরপক্ষে, বাউল শিল্পীরা গান পরিবেশন করে মূলত বিনোদনের জন্য বা লোকসংস্কৃতির ধারক হিসেবে। ৩।

প্রভাব ও প্রচার মাধ্যম— বাউল সাধকদের প্রভাব সাধারণত তাঁদের শিষ্যগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যারা তাদের দর্শনকে প্রচার করে। তবে, বাউল শিল্পীরা মঞ্চ, টেলিভিশন ও বিভিন্ন আধুনিক প্রচার মাধ্যমে জনপ্রিয়তার কারণে বাউল গানকে একাধিক স্থানে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। ৪। ব্যক্তিগত জীবন ও জীবনযাপন— বাউল সাধকেরা সাধারণত সংসারবিমুখ জীবনযাপন করে এবং শিষ্যসহযোগে নির্জন সাধনায় মগ্ন থাকে। অন্যদিকে, বাউল শিল্পীদের অধিকাংশই পারিবারিক জীবন যাপন করে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বাউল গানের ওপর নির্ভরশীল। বাউল সাধক ও বাউল শিল্পী দুজনেই বাংলার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মধ্যেকার মূল পার্থক্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনা বনাম পেশাগত প্রচার। তবে, দুই শ্রেণির অবদানেই বাউল গান ও দর্শন আজকে বাংলাদেশ ও ভারতের সংস্কৃতির একটি অন্যতম সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত।

তথ্যসূত্র:

১। পূজা মিত্র, *বাউল পদাবলীতে চৈতন্যপ্রভাব*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা. ২৮
২। ঐ, পৃষ্ঠা. ২৯
৩। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *বাংলার বাউল* (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের লীলা বক্তৃতা), নবযুগ সংস্করণ, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, পৌষ ১৪১৬, পৃষ্ঠা. ১২
৪। ঐ, পৃষ্ঠা. ১৩
৫। ঐ, পৃষ্ঠা. ১৩
৬। ঐ, পৃষ্ঠা. ১৯
৭। ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৩
৮। ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৪(বঙ্গাব্দ)।
২।অনুপম হীরা মণ্ডল, *ফকির লালন সাঁই ভাব-সাধনা*, ঢাকা: অবসর, ফেব্রুয়ারি, ২০১২।

৩। আদিত্য মুখোপাধ্যায়, *বিশ্বজয়ী বাউল*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৬।
৪। আনসার উল হোক, *সব লোকে কয় লালন কী জাত*, কলকাতা: নান্দনিক, ২০১৪।
৫। আবদেল মাননান, *লালনদর্শন*, ঢাকা: রোদেলা, ২০২১।
৬। আবীর মুখোপাধ্যায়(সংকলক), *আরশিনগর বাউল ফকির উৎসবের পত্রিকা বিশেষ সংকলন*, শান্তিনিকেতন: বইওয়ালা বুক ক্যাফে, ২০১৯।
৭। আহমদ শরীফ, *বাউল ও সুফিসাহিত্য*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৩।
৮। আহমদ শরীফ, *বাউলতত্ত্ব*, ঢাকা: বুকস্ ফেয়ার, জানুয়ারি, ২০২২।
৯। ওয়াকিল আহমেদ, *লালন গীতি সমগ্র*, ঢাকা: বইপত্র, ২০১৬।
১০। ওয়াকিল আহমেদ, *বাউল গানের ধারা*, ঢাকা: গতিধারা, ২০২৩।
১১। কার্তিক উদাস, *নাটোরের বাউল-ফকির*, ঢাকা: সমাচার, ২০১৮।
১২। পূজা মিত্র, *বাউল পদাবলীতে চৈতন্যপ্রভাব*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯।

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 437-444
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.031

ভারতবর্ষের নাট্য-ঐতিহ্যে থার্ড থিয়েটার

প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী, *প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, উদয়পুর, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 15.11.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The word "theatre" is an imported term, and it is one of the oldest art forms in the world. The ancient Greek drama and our country's Sanskrit theatre have evolved and continued to flow through both ends of the world. To make this important medium of communication more active, experiments are being conducted in countries around the world. Our country is not lagging behind in this new exploration. Along with the first and second theatres, Bengali theatre has also sought the third theatre. Playwright Badal Sarkar is the main leader in this movement. According to Badal Sarkar, to understand the essence of third theatre, we must first understand the concepts of the first and second theatres. The first aspect involves showing the absurdities of history and society through comic plays. The second aspect refers to traditional forms in our rural society, such as Tamasha, Nautanki, Ramleela, and Jatra. 'Third Theatre' is the theatre that exists outside of these two traditions. Those who write plays must consider both the production aspects and the social responsibility of theatre. In three sentences, Badal Sarkar's concept of third theatre can be described: it can be done in various situations, it can be easily transported, and it is not overly dependent on money. The primary goal of third theatre is to transcend the boundaries of the middle and upper classes, and educated people, to become a means of

awakening for the uneducated masses. In this form, both the actor and the audience are on the same level.

Keywords: Third Theatre, Playwright, Audience, Renaissance.

নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজক ইউজেনিও বারবা ১৯৭৬ সালেই সর্বপ্রথম 'থার্ড থিয়েটার' কথাটা সচেতনভাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং এই নামে তিনি নাট্যদলও গঠন করেছিলেন। এরপর পোল্যান্ডের গ্রোটোস্কি এটিকে বলেছিলেন 'Poor theatre' অর্থাৎ 'গরীবের নাটক'। এছাড়াও তিনি বলেছিলেন এটি 'Free theatre' অর্থাৎ 'মুক্ত থিয়েটার'। শহরের জনসাধারণ এখন বাংলা থিয়েটার বলতে গ্রুপ থিয়েটারকেই বোঝেন। বর্তমানে শহরের সবটুকুকে ধরে রেখেছে এই গ্রুপ থিয়েটারই। টিকিট বিক্রি থেকে ওঠা টাকায় এই দলগুলি পরিচালিত হয়। এইরকম নাট্যদলের সন্ধান মিলে বাংলার মফস্বলেও। তবে থিয়েটার শব্দটির সাথে ততোটা পরিচিত নন প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার মানুষজন। থিয়েটারের বিভিন্ন বিষয়কে আত্মস্থ করার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাননি এরা। গ্রামাঞ্চলের এক অন্যতম ও জনপ্রিয় বিনোদনের মাধ্যম হচ্ছে যাত্রা। শহরাঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এটি অভিনিত হলেও যাত্রা গ্রামাঞ্চলেরই সংস্কৃতি। এটি যারা প্রযোজনা করে তাকে অপেরা বলা হয়ে থাকে। যদিও অপেরা কথাটি এসেছে পাশ্চাত্য গীতিনাট্যর থেকে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে শখের নাটকগুলো অভিনিত হয়, সেগুলো মূলত গ্রামবাংলারই সম্পদ।

থিয়েটারের কিছু সামাজিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। একথা কেউই অস্বীকার করার অবকাশ পাবেন না। কারণ প্রতিটি থিয়েটারের উৎসের সাথেই এর সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয় জড়িত। থিয়েটার এমন একটি বোধগম্য মাধ্যম, যা সবথেকে সহজভাবে, একজন পড়াশোনা না জানা মানুষের মধ্যেও তার ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পারে। তাইতো বিভিন্ন সময় আমরা নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের হস্তক্ষেপের কথা শুনতে পাই। এদিক থেকে এটি গল্প, উপন্যাসের চেয়েও সক্রিয়। গান শোনা বা গল্প-উপন্যাস পড়ার সময় আমরা অন্যমনস্ক হতেই পারি। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় নেই। এ যেনো চুম্বক শক্তির মতো তার দর্শককে ধরে রাখে। সংলাপ, গান, বাজনা, লাইট, সেট, মেক্আপ; এগুলো নিয়েই নাটক। নাটকের সাথে কবিতা মিলিয়ে কাব্যনাট্য, গান মিলিয়ে গীতিনাট্য, নাচ মিলিয়ে নৃত্যনাট্য, বাচিক প্রকরণের সাথে বন্ধুত্ব করে হয় শ্রুতিনাট্য। শিল্পের বিভিন্ন শাখার সাথে নাটকের এই বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবই

নাটককে শীর্ষ স্থানে নিয়ে গেছে। নাটকের এই স্বভাব আকৃষ্ট করেছিলো বাদল সরকারের মতো মানুষকে। তিনি জীবনের অনেকটা সময় ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। শেষে নাটকের নেশায় জড়িয়ে পড়েছেন।

বাদল সরকারের খ্যাতি মূলত ছিলো হাসির নাটকের লেখক হিসেবে। তবুও 'ইন্দ্রজিৎ', 'পাগলা ঘোড়া', 'বাকি ইতিহাস' ইত্যাদি নাটক রচনায় তাঁর খ্যাতি যেনো একেবারেই শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে তাঁকে। যদিও বাদল সরকার হাসির নাটককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চান। তিনি একটি আলাপচারিতায় জানিয়েছিলেন প্রকৃত হাসির নাটক লেখার ইচ্ছার কথা।

যদিও বাদল সরকারের নিজস্ব স্বভাব তাঁকে মানুষের প্রশংসাতে বিভোর না করে আরও বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তাঁর চিন্তাভাবনা যেনো একেবারে সাধারণ মানুষের সাথে মিশে গেছে। এ ব্যাপারে সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- ''...এই লোকটা প্রসীনিয়াম থিয়েটারে এখনো দাঁড়ালে একটা জায়ান্ট। কিন্তু যেদিন তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে প্রসীনিয়াম থিয়েটারটা আমার থিয়েটার না... তখনই তিনি প্রসীনিয়াম থিয়েটার ছেড়ে চলে এলেন, যেন মড়া পুড়িয়ে কলসী ভেঙ্গে একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে চলে এলেন।''[১]

বাদল সরকার কলকাতার বিদগ্ধ নাট্যজন হয়েও গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের কাছে গেছেন। লোকনাট্য সাধারণ মানুষের নাটকই হয়ে উঠেছে বাদল সরকারের মতে। তারপরও থার্ড থিয়েটারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে 'থিয়েটারের ভাষা'-তে তিনি মত প্রকাশ করেন যে- ''গ্রামের লোকনাট্য জনপ্রিয়, শ্রমজীবি জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছায়, কিন্তু একদিকে সে নাট্যে পশ্চাদপদ ভাবধারা ও প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যবোধ প্রচারিত হচ্ছে, অন্যদিকে সে নাট্য ব্যবসায়ীদের বিক্রয় পণ্যে পরিণত হচ্ছে -এইখানে বর্তমান কালীন সীমাবদ্ধতা। অপরপক্ষে শহরের মঞ্চ নাট্যের অন্তত একটা অংশ প্রগতিশীল ভাবধারা ও মূল্যবোধ তুলে ধরতে পারছে। কিন্তু তা শহরবাসী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত দর্শকদের মধ্যে সীমিত রয়ে যাচ্ছে; এবং তার মঞ্চ শৈলী এমন যে তাকে সহজে বা সল্প ব্যয়ে দেশের বৃহত্তম জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না -এ নাট্যের সীমাবদ্ধতা এই ক্ষেত্রে।''[২]

আবার আরেক জায়গায় বাদল সরকার বলেছেন-

> "A unfortunate dichotomy between urban and rural life. The dichotomy is expressed in disparities in economic standards, services, educational levels and cultural developments..... Theatre is one of the fields where this dichotomy manifest rated most. The city theatre today is not natural development of the traditional or folk theatre in the urban setting as it should have been."[৩]

এই দুই থিয়েটারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে 'থার্ড থিয়েটার'-

> "Workshop for a theatre of synthesis as a rural urban link."[৪]

এবারে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের তিনটি দিকের বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমে বাদলবাবু বলেছেন যে, নাটক হবে এমন যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় করা যায়। এর মানে নাটককে হতে হবে নমনীয়। তবেই তো বিভিন্ন অবস্থায় এটিকে সহজে অভিনিত করা যাবে। এরপর তিনি বলেছেন, নাটক হবে এমন যা সহজে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। এর মানে নাটক হবে বহনীয়। তবেই তো বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নাটককে অভিনিত করা সহজ হবে। নাটক যদি স্থানান্তরিত না করা যায়, তবে তার মর্মকথা সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পৌঁছাতে পারবে না। তাই নাটককে স্থানান্তরিত করা গেলে বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য তা খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। শেষে বাদল সরকার বলেছেন নাটক হবে এমন যা টাকার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল নয়। এর মানে এটি হবে সুলভ। নাটক যদি খুব কম খরচে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়, তবে এ কাজে আমরা আরও অনেককে একত্রিত করতে পারবো। আর যদি নাটক শুধুমাত্র টাকার উপর নির্ভর করে হয়, তবে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক কারণে অনেকেই অংশগ্রহণ করতে চাইবে না। এর পাশাপাশি নাটক রচয়িতারাও এ ধরণের কাজে উৎসাহ খুঁজে পাবেন না। তাই নাটক বিশেষভাবে টাকার উপর নির্ভরশীল হবে না।

'থার্ড থিয়েটার' মনে করে যে, আমাকে বসে থাকলে চলবে না। আমাকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষজনদের কাছে যেতে হবে। 'থার্ড থিয়েটার' আশা করে না যে মানুষ তার কাছে আসবে। তাই 'থার্ড থিয়েটার'-কে হতে হয় নমনীয়। এর পাশাপাশি এর স্বভাব হবে স্থানান্তরিত করা যাবে এমন। এটি শিবলিঙ্গের মতো অনড় হবে না, তবেই এটিকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নিয়ে

যাওয়া সম্ভব হবে। আর এ কাজে আরও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোতে খরচ না হলে তখন টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করারও কোনও প্রয়োজন হবে না। খুশি মনে নাটক দেখে দর্শকরা যা দিয়ে যাবে, তাতেই থিয়েটার বেঁচে থাকবে। অর্থের ব্যাপার একটা বড় ব্যাপার গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রেও। তাই কোনও গ্রুপ থিয়েটারই শহরের লাভজনক জায়গা ছেড়ে যাবেন না বাংলার গ্রামে-গঞ্জে। তাইতো থার্ড থিয়েটারের উপর দ্বায়িত্ব বেড়ে গেলো। একমাত্র থার্ড থিয়েটারই পারে তার তৃতীয় ভাবনার সূত্র ধরে সঠিক বার্তা সহজ পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

থার্ড থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭১ সালে ১১ই ডিসেম্বর কার্জন পার্কে এক পরীক্ষামূলক অভিনয়ের দ্বারা। তারপর একে একে এগিয়ে এলো অনেক নাট্যদল- বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কস্, ব্রাইট ফিউচার, শিল্পী ফৌজ, স্পতম, শপথ, সিচুয়েট ইত্যাদি।

এবারে থার্ড থিয়েটারে অভিনিত নাটকটিকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলার জন্য অনেক বিষয়েই নজর রাখতে হবে। যেমন- নাটকটি কোথায় অভিনিত হবে, সেটি খেয়াল রাখতে হবে। শহরে অভিনিত হবে নাকি গ্রামে অভিনিত হবে, রাস্তাঘাটে অভিনিত হবে নাকি কোনও বাজারে অভিনিত হবে, সেটি আগে স্থির করে নিতে হবে। কারণ এক এক জায়গায় এক এক পরিবেশ বর্তমান। এরপর খেয়াল রাখতে হবে নাটকটি কোন্ সময় অভিনিত হবে। সকালে অভিনিত হবে নাকি বিকেলে, দুপুরে অভিনিত হবে নাকি সন্ধ্যা-রাতে অভিনিত হবে, সেটিও নাটকের বিষয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

ভাষা হলো ভাব প্রকাশের মাধ্যম। এই ভাষা-মাধ্যমের সাহায্যেই আমরা নিজেদের চিন্তাভাবনাকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নিই। থার্ড থিয়েটারের ক্ষেত্রে ভাষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, যেখানে নাটকটি অভিনিত হবে, সেখানকার মানুষের কাছে এর ভাষা বোধগম্য হবে কিনা। যদি তা না হয়, তবে ভাষার গঠন কিছুটা পরিবর্তন করে নিতে হবে। নয়তো সকল পরিশ্রমই বৃথা হবে।

থার্ড থিয়েটারের প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এরপর দেখতে হবে যেখানে নাটকটি অভিনিত হবে সেখানকার মানুষের লোকবিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি কেমন। যদি নাটক পরিচালকেরা এগুলো মাথায় রেখে নাটককে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন, তবেই তারা সামগ্রিকভাবে সফল হবেন।

প্রসেনিয়াম থিয়েটারে অভিনেতা ও দর্শক আলাদা আলাদা জায়গাতে অবস্থান করে। ফলত অভিনেতারা দর্শকদের দেখতে পান না। আর থার্ড থিয়েটারে যেহেতু দর্শক ও অভিনেতা একই জায়গাতে অবস্থান করে, সেহেতু সেখানে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে মতের আদান প্রদানের অবকাশ রয়েছে। যদিও বাদলবাবু কখনোই তাঁর থিয়েটারকে 'এক্সপেরিমেন্টাল' বলে আখ্যা দেননি। 'কনটেন্ট'-ই মূখ্য ভূমিকা পালন করে তাঁর থিয়েটারে। তিনি বলেছেন-

> ''What আর How, আমাদের ক্ষেত্রে What-টা প্রাথমিক -How-টা সেকেন্ডারী ...আমরা কর্মের এক্সপেরিমেন্ট করিনি, অনুসন্ধান করেছি।''[৫]

-কীভাবে কনটেন্টকে সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তারই অনুসন্ধান।

বাদল সরকার ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। তাই তাঁর চিন্তা থেকে বের হওয়া থার্ড থিয়েটারকে তিনি রাজনৈতিক থিয়েটার হিসেবেই দেখতে বেশি পছন্দ করেন। যদিও পরবর্তীতে তিনি রাজনীতি থেকে বেড়িয়ে আসেন। নিজের চিন্তাভাবনাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর রাজনীতির আশ্রয় নেননি, বরং বেছে নিয়েছেন থার্ড থিয়েটারকে। এই থিয়েটারের বিষয় কী হবে? সে সম্পর্কে বাদল সরকার বলেন-

> ''খুব সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে, কনটেন্ট হল সমাজ পরিবর্তন।''[৬]

বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রকে শ্রেণীশোষণের যন্ত্র বলেছিলেন, একথা সত্য। কারণ আমরা দেখতে পাই এই রাষ্ট্রনামক যন্ত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অনেক বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছে। তাদেরকে ভোলানো হচ্ছে প্রতিনিয়তই। দিনের পর দিন রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদেরকে শোষণ করে যাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষ হয়তো অবগত, নয়তো অবগত নয়। তাদের উপর ক্রমশই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নানারকমের 'টেক্স' বা 'কর'। ফলত সর্বহারারা তাদের সবকিছু আরও দ্রুত গতিতে হারাচ্ছে। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। দিনের পর দিন তাদেরকে কম মজুরিতে রাত-দিন পরিশ্রম করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাইতো তারা একটা সময়ের পর বিপ্লবের পথ অবলম্বন করে। বিপ্লবের মাধ্যমেই তারা রাষ্ট্রকে জানান দিতে চায় যে, আর নয়, অনেক হয়েছে। এবার

সকলকে সচেতন হতে হবে। নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য একত্রে লড়াই করতে হবে। রাষ্ট্র-রাজনীতির মুখোশ খুলে দিতে চায় এই 'থার্ড থিয়েটার'। এটিই ডাক দেয় দিন বদলের। মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়, নতুনভাবে বাঁচতে শেখায়, নতুন করে পথ চলতে শেখায়। যদিও রাষ্ট্র নামক শ্রেণীশোষণের যন্ত্রের ডাকে আমরা বিভ্রান্ত হই। রাষ্ট্র যখন বোঝায় যে, কৃষিজ ফসলের মাধ্যমে ডলার কামানো যেতে পারে, তখন আমরা লালায়িত হই। তখন একবারও ভাবি না যে, এই ডলার আমাদের দেশের ক'জন কৃষকের দিনবদল করতে পেরেছে। দেখা যায় যে, দিনের পর পর কঠোর পরিশ্রম করে, বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে যারা ধান উৎপাদন করে, তাদের পেটেই দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটে না। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। কারও ঘরের চাল নেই, পরিধান করার মতো ভালো বস্ত্র নেই ইত্যাদি আরও অনেক রকমের বঞ্চনার তারা স্বীকার হন। 'থার্ড থিয়েটার' এসবের হিসেব রাখে। 'থার্ড থিয়েটার' মানুষের অধিকার সম্পর্কে খুব সচেতন। এরা চায় মানুষকে মানুষের যোগ্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে, যোগ্য সম্মানটুকু এনে দিতে।

আবারও বাদল সরকার থার্ড থিয়েটারের ভাষা কী হবে, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। এ নিয়ে অনেক গবেষণাও করেছেন তিনি। দ্বিজেন্দ্রলাল স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বলেন-

> ''ভাষা জিনিসটা একটা সঙ্কেত; সঙ্কেতটা একটি সমাজের সব মানুষ আয়ত্ত করেছে ছোটবেলা থেকে; তাই তারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে সেই সঙ্কেতের মাধ্যমে।''[৭]

বাদল সরকার মূলত ভাষা বলতে যা যা বুঝিয়েছেন, সেগুলি হলো- চোখের ভাষা, মুখভঙ্গির ভাষা, অঙ্গভঙ্গির ভাষা, স্পর্শের ভাষা, সুরের ভাষা, সংলাপের ভাষা, ছবির ভাষা ইত্যাদি। 'থার্ড থিয়েটার' যেহেতু মঞ্চহীন, সরঞ্জামহীন, সেহেতু এখানে ভাষাটাই মূখ্য। অঙ্গভঙ্গি ও অঙ্গসঞ্চালন এখানে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানে স্থির দাঁড়ানো মানুষজনও কখনও গাছের ইঙ্গিত দেবে অথবা দেওয়ালের ইঙ্গিত বহন করবে। এছাড়া এ নাটকের সংলাপকে হতে হবে অধিক চিত্তাকর্ষক। কারণ এ থিয়েটারের দর্শক অধিকাংশই কাজের থেকে ঘরে ফেরার পথের মানুষজন। এ নাটকে থাকবে টানটান উত্তেজনা। এই নাটকে- কী জানো? কী জানতে না? কী জেনেছো? কী কথা? কী বলতে চাও? -এগুলোই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার, যা থিয়েটারে দেখানো হয়ে থাকে। এই করে দর্শকদের আগ্রহ আরও জাগিয়ে তোলা হয়।

যদিও থার্ড থিয়েটারের ভবিষ্যত নিয়ে একেবারেই আশাবাদী নন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিরণ মৈত্রের মতো নাট্যব্যক্তিত্বরা। ১৯৮২ সালে ১৭ই জুলাই দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় 'সাম্প্রতিক নাট্যচিন্তা' নামক প্রবন্ধে কিরণ মৈত্র বলেছেন- 'অধুনা আবার থার্ড থিয়েটার নামে কায়দাসর্বস্ব একটা ব্যাপার ঘটছে। ৫০/৬০টা দর্শক বসতে পারে এমন হলে আমরা নাটকের নামে নানারকম জিমন্যাস্টিক, এ্যাক্রোবেটিক কায়দা দেখাচ্ছি। দেখতে মজা লাগে। যদিও শিল্পীরা গলদঘর্ম হয়ে দু'ঘন্টা কসরত করে। কিন্তু ফললাভ হয় না।''৮ যদিও স্পষ্টত এই কথা বলা যাবে না যে ফললাভ হয় না। কারণ ১৯৮২ সালের থার্ড থিয়েটার ২০০৫ সাল পর্যন্ত তার কর্মে অবিচল থেকেছে। আবার এও দেখা গেছে যে, অনেক আগেই পোলান্ডের গ্রোটাস্কি প্রসীনিয়াম মঞ্চকে বাদ দিয়ে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ গড়ে তুলেছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের স্টেজকে দর্শকদের মধ্যে এগিয়ে দিয়েছিলেন উৎপল দত্তের মতো প্রতিষ্ঠিত নাট্যব্যক্তিত্বও। যদিও গণনাট্যের পোস্টার ড্রামা বা পথনাটকের সঙ্গে পার্থক্য আছে থার্ড থিয়েটারের।

তৃতীয় বিকল্পের থিয়েটার 'থার্ড থিয়েটার'। তৎক্ষণাৎ উদ্দেশ্য সাধন নয়, প্রকৃত সত্য উদঘাটনই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। দর্শকদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এপিক থিয়েটারের যোগ্য উত্তরসূরী এই 'থার্ড থিয়েটার'। তবুও 'থার্ড থিয়েটার' কি পারবে সকল স্তরের মানুষকে আপন করে নিতে? এ প্রশ্নের উত্তরই আমাদেরকে নতুন আলো ও নতুন আশার কাছে নিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উল্লেখপঞ্জি:

১) চট্টোপাধ্যায় হীরেন ও রায় কৃষ্ণগোপাল, সাহিত্য-প্রবন্ধ : প্রবন্ধ-সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : মহালয়া, ২০১৪, পৃষ্ঠা-৪৫৪
২) তদেব, পৃ-৪৫৪
৩) তদেব, পৃ-৪৫৫
৪) তদেব, পৃ-৪৫৫
৫) তদেব, পৃ-৪৫৬
৬) তদেব, পৃ-৪৫৬
৭) তদেব, পৃ-৪৫৭
৮) তদেব, পৃ-৪৫৮

ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 445-455
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.032

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আখ্যানের বিনির্মাণ

ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন, *সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান বাংলা বিভাগ, সামসি কলেজ, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ*

Received: 13.11.2024; Accepted: 28.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Manik Bandopadhyay's approach to narrative construction and deconstruction in his short stories represents a pivotal shift in Bengali literature. Through his unique technique of reconstructing the narrative, he embeds a deeper message aimed at challenging contemporary societal norms and addressing the complexities of human existence. Drawing from Jacques Derrida's post-structuralist theories, Bandopadhyay's work explores how power structures manifest within texts and society. His stories often break away from traditional storytelling by focusing on the psychological depth of characters, examining their internal conflicts in response to external societal pressures. Incorporating Freudian psychoanalytic theories, Bandopadhyay explores themes of human desire, particularly sexuality, and its potential to instigate social change. In contrast to many of his contemporaries, Bandopadhyay boldly addresses topics of sexual revolution and societal transformation, demonstrating how personal desires can challenge conventional social norms. His works serve as both a reflection and critique of the period's social fabric, offering new ways to interpret

human experiences and the possibility for societal change. Through innovative narrative techniques, Manik Bandopadhyay not only created compelling stories but also provided a platform for rethinking traditional values, marking a significant contribution to the evolution of Bengali literature.
Key Words: Manik Bandopadhyay, Narrative Construction, Deconstruction, Post-structuralism, Jacques Derrida, Contemporary Literature.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে আখ্যানকে কিভাবে বিনির্মাণ করেছেন; কিংবা বলা ভালো বিনির্মাণের মধ্যদিয়ে সমকালীন পাঠকবর্গকে কি বার্তা দিতে চাইলেন, তা তাঁর ছোটগল্পর পটভূমি লক্ষ্য করলেই সেই তত্ত্বকথা পরিষ্কার। সংস্কৃতে 'আখ্যান' শব্দটির অর্থ বেশ ঘোরালো। তবে আখ্যান বলতে এমনিতেই বোঝায়-কাহিনি, যার মধ্যে থাকে ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্রচিত্রণ। বিনির্মাণবাদী তাত্ত্বিক জ্যাক দেরিদার বিখ্যাত সুত্র হল পাঠ কৃতির বাইরে কোন প্রসঙ্গ নয়, বা থাকেনা। অর্থাৎ যা কিছু ঘটনার ঘটমান তা থাকে আসল পাঠের মধ্যেই। আর এই খানেই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে পাঠের বিনির্মাণ। আসলে বিনির্মাণ শেখায় জ্ঞান ও প্রতাপের কৃৎ কৌশল। যা প্রতিটি স্তরে বিরাজমান প্রতাপের আধিপত্যতা। কিভাবে সামাজিক স্তরে তাঁর দাপট বা শক্তি প্রদর্শন করে, তার দিকেই ইঙ্গিত করে বিনির্মাণবাদ। বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে সামাজিক পিছুটান বাস্তবতা, অন্যদিকে নবচেতনার জোয়ার এই দুই দ্বান্দ্বিক সমন্বয় সম্মুখীন পরিসরে অবচেতন মনন নিয়ে মানবিক অস্তিত্বের সন্ধানে নতুন ভাবে বেঁচে থাকার রসদ দিলেন-ছোটোগল্পে। তাই তাঁর গল্পপটভূমির পরিসর হয়ে ওঠে; লুকিয়ে থাকা জীবন মননের বিচিত্রতা। মানিক ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে তাঁর গল্পে নতুনভাবে বিনির্মাণ করলেন। যা বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন বাঁক বা মোড় বলা যেতে পারে। সমকালীন অন্যান্য গল্পকার বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও, মানিক সেটা করেননি। যৌনতার মধ্যে যে বিপ্লব, সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে সেটা তিনি চাক্ষুষ প্রমাণ করে দিলেন।

বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত শিল্পীব্যক্তিত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৯২৮ সালে 'অতসীমামী' ছোটগল্পের মাধ্যমে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালীন দুই সমালোচক অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন- 'কল্লোলেরই কুলবর্ধন' আর বুদ্ধদেব বসুর মতে- be lated kalloean. কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের প্রেক্ষিত ও পরিসরে মানিকের সাহিত্য নতুন করে আলোচনার দাবী রাখে। কারণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, সামাজিক পরিসরে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিকসত্তার দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত মানিক। অস্তিত্বের সংকট, নৈরাশ্যতা, হতাশা, ও একাকীত্ব ব্যক্তি মানিক কে অন্য এক বাস্তবতার জগত চিনিয়ে দেয়। এখানেই তিনি ফ্রয়েডিয় চিন্তা ধারার সাথে নিজেকে মিলিয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম সেরা অক্ষরশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ শতকের তিরিশের দশকে যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করছেন সে-সময় 'মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর / যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল'। সে ছিল এমন এক সময় যখন মানুষের মূল্যবোধ আদর্শ সমূহ বিনষ্টির পথে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাই তাঁর লেখায় কাহিনির রঙিন জগৎ অনুপস্থিত। আর তাই সে- সময়ের বহু নক্ষত্রখচিত বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে তাঁর উপস্থিতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বলা চলে, বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন, যার–

> "মূলে আছে তার বাস্তব দৃষ্টি, যা সমাজ ও ব্যক্তির সমস্যার গভীরে অনায়াসে পৌছে যায়।"[১]

আর মানিকের নিজের ভাষায়- 'জীবনকে যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ভগ্নাংশ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি।' মানুষের মন পৃথিবীর বিচিত্রতম-জটিলতম এক ধাঁধা। আচরণের সঙ্গে অনেক সময়ই তার মনোভাব মেলে না, আবার ইচ্ছার সঙ্গে কার্য। যে-কোনো বহিরঙ্গ সমস্যাও মানুষের অন্তর্জগতে আলোড়ন তুলতে পারে আবার কোনো অন্তর্গূঢ় সংকটও প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে বহির্জগতের কার্যানুষঙ্গে। মানুষের এই বৈচিত্র্যের কারণ অন্বেষণ মানিক করে গেছেন বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায়-

> 'বিপুল বিপর্যয়ের মুহূর্তেও জীবনের নতুন সূচনার সম্ভাবনা দ্যোতিত হয়ে যায়, হতে পারে। আবার প্রাপ্তির মুহূর্তেও ব্যাখ্যাতীত অপ্রাপ্তির

বোধ কোনও মানুষকে গ্রিক প্রত্নকথার বিখ্যাত চরিত্র সিসিফাসের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে।"[২]

তাই তার ৪৮- বছর জীবনের ২৮ বছর সাহিত্যচর্চা কালের মধ্যে লিখিত ৩৫টি উপন্যাস ও সংকলিত অ-সংকলিত প্রায় ২৫০ টি গল্পের মাধ্যমে মানিক অনুসন্ধান করে গেছেন: কাকে বলে মানুষ? মধ্যবিত্ত সুলভ উন্নাসিকতায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তিনি নিচুতলার দরিদ্র জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, তাদের জীবনকে দেখেছেন পাশ থেকে। দেখেছেন মধ্যবিত্তের ভন্ডামি, ন্যাকামি, গরীবদের প্রতি অবিচার। তার নিজের ভাষায়-

"ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। উভয়স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরালো করে তুলত। ভদ্রজীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটিয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকার, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দারিদ্র্য পীড়িত জীবনে । ... ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভন্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার-অনাচার, বিকারগ্রস্ততা, সংস্কারপ্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে, ভদ্রজীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ ? ভদ্রসমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী মজুর, মাঝি-মাল্লা, হাড়ি-বাগদীদের, রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এ বিরাট মানবতা-- যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে-সাহিত্যে স্থান পায় না?"[৩]

সাহিত্যের এই অভাব মেটাতে মানব-প্রেমিক, জীবন-প্রেমিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করে গেছেন। পরবর্তীকালে মার্কসীয় সাম্যবাদী দর্শন তাকে অনুপ্রাণিত করে এই অবিচারের বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদ তুলে ধরতে । আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগী চোখের স্বপ্ন' নিবন্ধে লিখেছেন –

> "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল মনোবিকলনে সফল রূপকার নন। মানুষের ভান ও সমাজ ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিয়েই তিনি দায়িত্ব পালনের তৃপ্তি অনুভব করেননি। যে-কোনো মাপে বড় শিল্পী বলে তিনি মানুষের ও সমাজের প্রকৃত বিশ্লেষণের কর্তব্য স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নেন। এবং আর একটু এগিয়ে এই অসহনীয় অবস্থানটি পালটে দেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।"[৪]

মানিকের বহুচর্চিত ও বিখ্যাত গল্পগুলি হলো 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'শিল্পী', 'টিকটিকি', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' ও 'দুঃশাসনীয়' প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি ছাড়া অন্যান্য গৌন গল্পগুলিতেও তার বাস্তব দৃষ্টির অসাধারণত্ব, তার মানব-প্রেম, তার সমাজ-বিশ্লেষণ ও মনোবিশ্লেষণের সক্ষমতা সমানভাবে বর্তমান।

লেখক জীবনের একদম প্রারম্ভিক কয়েকটি গল্পে শরৎচন্দ্রের সামান্য প্রভাব নজরে পড়লেও, পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রীয় নির্ভেজাল সারল্য ও সম্পর্কের মাধুর্য মানিকের গল্প থেকে অন্তর্নিহিত হয়। যে-কোনো আপাত-করুণ মধুর ঘটনাকেও মানিক আত্মস্থ করেন মনোবিশ্লেষণের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে। 'যাত্রা' গল্পের প্রধান ঘটনা বিবাহের পর মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। কিন্তু এই ঘটনাকে সামনে রেখে লেখক বর্ণনা করেছেন মানবমনের বিচিত্রগতি, এসেছে বাঙালি পরিবারে নারীর পরিসর। নববধু ইন্দুর বন্ধু ক্ষেন্তির বর্ণনায় আসে বিবাহোত্তর একটি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান-

> "ক্ষেন্তি বলিল, হাসিস্ কি লো? ও বাড়ির পুষি বেড়ালটার পর্যন্ত যখন মন যুগিয়ে চলতে হবে তখন টের পাবি।"[৫]

আর মেয়ের বিয়ে ? সে যে বরপণ, বিবাহের আয়োজন ইত্যাদির পর-

> "মেয়ের শুভবিবাহে শুভ, যে কাহার হইল তাহাই ভাবনার বিষয়"[৬]

বলে মনে হয় মেয়ের বাবার। গল্পটির প্রাসঙ্গিকতা বোধ করি আজকের সমাজেও বিন্দুমাত্র কম হয়নি। হয়তো এখন মূর্ছার ব্যারাম আছে বলেই পুত্রবধূকে ত্যাগ না করে ত্রিশ হাজার টাকায় রফা করে বরের বাবা প্রমাণ করেন যে তারা পাষণ্ড নন। এখানেই সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বচক্ষে দেখালেন পিতৃতন্ত্র প্রতাপ দ্বারা বেষ্টিত সমাজব্যবস্থায় নারীর অবদমিত আখ্যান। কিভাবে কূটাভাস দ্বারা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছেন এবং নিজেই আবার বিরোধিতা করেছেন সেই বাস্তব চিত্র।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিলতার উন্মোচনে তাঁকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি তাঁকে প্ররোচিত করেছে জীবনের বিভিন্ন বঙ্কিম ও রূঢ় অভিজ্ঞতাগুলিকে বিশ্লেষণে ও নানা অসংগতির সূত্র নির্ণয়ে সচেষ্ট হতে। আসলে মানুষ যতই উন্নতি করুক, যতই সভ্য হোক না কেন সে প্রাকৃতিক জীবই তো-- ফলে আদিম প্রবৃত্তিগুলো সবই আজও বহন করে চলেছে। তার আচরণের মূলেও থাকে ক্ষুধা ও কাম প্রবৃত্তি–

> "বাইরের দিক থেকে চরিত্রগুলির আচরণ যেভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক না কেন, তাদের অন্তর্নিহিত চালিকা শক্তি যে এ ক্ষুধা ও অবচেতন মনের যৌন অনুভূতি, অবদমিত কাম"[৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের পটভূমি তেভাগা কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিত হলেও, গল্পের আখ্যানে যৌনতার আকর্ষণ চিত্র একেবারে এড়িয়ে যাইনা পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর অসাধারন ছোটগল্প- 'হারানের নাতজামাই' তাঁর দৃষ্টান্ত। ভুবনকে ধরার জন্য কতনা ফন্দি করেছে মন্মথ, তাই সে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হাসখালি গ্রামে হারানের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। সেই ঘরেই ভুবন লুকিয়ে রয়েছে এরকম সংবাদ মন্মথ পেয়েছে। তাই হারানের গৃহে জোর করে প্রবেশ করতে চাই। কিন্তু ময়নার মার কৌশলে ভুবন রক্ষা পেলেও মন্মথর চারিত্রিক দিক মানিক প্রকাশ করলেন এই ভাবে-

> "ময়নার রঙিন শাড়িও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে চায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষি মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা।"[৮]

শুধু তাই নয়, মেয়েটি মন্মথের কাছে বিদেশী শ্যাম্পন । তাই তাঁর মনে–

> "যে যোয়ান মর্দ মাঝ বয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেরই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ।"[৯]

এখানে গল্পকার মন্মথর দ্বারা সামাজিক পরিসরে যে ইঙ্গিত দিলেন তা সামাজিক ক্ষেত্রে অশ্লীল বলে মনে হবে; কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে একে অশ্লীল বলা যাবেনা। এই যৌনতার মধ্যদিয়েই ভুবনের মতো বিদ্রোহী সত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই পট নির্মাণ আবশ্যিক ছিল। আর তাই সচেতন ভাবে তিনি এই দৃশ্য অঙ্কিত করেছেন। 'কেন লিখি' প্রবন্ধে মানিক জানিয়েছেন-

> "লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না, সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি।"[১০]

অর্থাৎ সেই অজানা কথাই যা আখ্যানের মধ্যে রয়েছে তা বিনির্মাণের দাবী রাখে। এই কারণেই তাঁর ছোটগল্পর পাঠ বিনির্মাণ করা আবশ্যিক। এরকম আরেকটি চিত্র, গ্রাম-বাংলার আকশ বাতাস কম্পিত, নারীর আত্মসম্মানের লড়াই, পুঁজিবাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই- নিয়ে রচিত- 'দুঃশাসনীয়' গল্প। গল্পের পটভূমি নির্মিত বস্ত্রকে কেন্দ্র করে। দুষ্টের শাসনরা কিভাবে বস্ত্র হরণ করে সমাজকে বস্ত্রহীন করে তুলেছে সেই ছবিই এই গল্পের আখান। পুঁজিবাদ গ্রামকে কিভাবে গ্রাস করেছিল তাঁর প্রমাণ এই গল্পের চরিত্র রাবেয়া। যার সঙ্গে জীবন কাটাবে বলে এসেছিল তারই বিরুদ্ধে একরাশ হতাশার ক্ষোভ নিয়ে জলের তলায় শান্তির নীড় করে বসল। এই লড়াই আনোয়ারের বিরুদ্ধে নয়, এই লড়াই পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপের বিরুদ্ধে।

এই সত্যটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সাহিত্যে কখনো ঐতিহ্যের নৈতিকতার দোহাই দিয়ে আড়াল করতে চাননি। মনোবিকার ও যৌন বিকারে বিষাক্ত জীবনের ছবি তিনি তাঁর অনেকগুলি গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আশ্রয়' তার এ রকমের গল্পগুলির একটি। 'ত্রিশ বছরের জোয়ান' বঙ্কু একই দিনে স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছে। কাজ করতে আসে দত্তবাড়িতে, একদিনের জন্য। কিন্তু মালিককন্যা নন্দরানীর উপস্থিতি তার মনে অদ্ভূত ক্রিয়া করে। নন্দরানীর বমি করা দেখে সে ভাবে-

> "জ্বর হয়ে তার বৌ একদিন এমনিভাবে বমি করেছিল।কিন্তু এ তো তার বৌ নয়, এ এমনিভাবে বমি করে কেন?"[১১]

বঙ্কু কম মাইনে, খাওয়ার কষ্ট, গালাগাল সব সহ্য করেও সে বাড়িতে টিকে গেল নন্দরানীর প্রতি তার অদ্ভূত আকর্ষণে। ধীরে ধীরে তার বুদ্ধির জড়তা কাটতে লাগল-

> "কাজটা প্রকৃতির, কিন্তু তাতে নন্দরানীর অজ্ঞাত প্রভাব কি একটুও ছিল না? অবশ্য চাকরের বুদ্ধির জট খুলবার ধৈর্য্য ও ইচ্ছা নন্দরানীর থাকার কথা নয়।বঙ্কু সে পছন্দ করত শুধু এই জন্য যে, বঙ্কু নিজেকে বাড়ির মধ্যে বিশেষ করে তারই চাকর করে রেখেছিব।"[১২]

বঙ্কু বুদ্ধির জড়তাটুকু কেটে যাওয়ার পর বঙ্কু নিজের ভালোমন্দ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল, তার নন্দরানীর প্রতি নির্ভরতা কমে গেল। একদিন ঝগড়া

করে সে কাজও ছাড়ল কিন্ত পরদিন সকালে সে আবার এসে হাজির, এমনকি মাইনের প্রত্যাশাও সে রাখে না, কেবল চায় নন্দরানীর সাহচর্য নন্দরানীর বিয়ে হয়ে গেলে সে সেখানেও গিয়ে হাজির, খেটে যায় বিনা মাইনেতে। সেই আগের মতোই বঙ্কু নির্ভর করে নন্দরানীর উপর। দেখতে দেখতে সময় বয়ে যায়। নন্দরানী-

> "নিজের মোটা শরীরটার দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।
> গড়ানো চাকা গড়িয়েই চলবে অবশ্য, কিন্তু তবু ভয় করে!
> চুল পাকতে দাঁত পড়তে আর বাকী কত!
> বঙ্কু কিন্তু চুলও পেকেছে, দাঁতও পড়ে গেছে কয়েকটা।"[১৩]

এই প্লটকে কেন্দ্র করেই একটা বেশ প্রেমের স্যাতস্যাতে করুণ গল্প লেখা হয়তো যেতে পারত কিন্তু মানিক সেই চেষ্টা বিন্দুমাত্রও করেননি। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন জৈবিক প্রাণীর- বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহ্যানুসরণে যে কেবল হৃদয়-সর্বস্ব নয়। মানিক যে-সময়ের লেখক সে-সময় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত গ্রাম বাংলা। অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত, বস্ত্রসংকট ও খাদ্য-সমস্যায় নাজেহাল গ্রাম বাংলার নিঃস্ব-রিক্ত মৃতপ্রায় চেহারা মানিকের কয়েকটি গল্পে অসাধারণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে পড়া যেতে পারে 'নমুনা' গল্পটিকে। অন্নাভাবে মৃতপ্রায় একটি পরিবার খাদ্য সংগ্রহ করে মেয়ের বিনিময়ে। শৈলের বাবা কেশব সব বুঝতে পেরেও নিজের মানসিক শান্তির জন্য মেয়ে কেনাবেচার দালাল কালাচাঁদের হাতে কন্যাদান করে। যারা নিজেদের সুবিধার জন্য এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে, যারা অগুনতি মানুষের মৃত্যু, তাদের ক্ষুধা, তাদের অসহায়তা নিয়ে ব্যবসা করছে, কালাচাঁদ তাদেরই একজন। সে গ্রামের মানুষদের দারিদ্রকে পুঁজি করে ব্যবসা ফাঁদে নারীদেহের –

> "রাবণের অধিকার বজায় থাকা পর্যন্ত ধার্মিক বিভীষণ বরাবর যে-দৃষ্টিতে কৃশোদরী মন্দোদরীকে দেখত, কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিতেই মেয়েদের দেখে থাকে।"[১৪]

মৃত 'দাদার দু'নম্বর বেওয়ারিশ পত্নীটিকে' সঙ্গে নিয়ে বেশ জমিয়ে চালাচ্ছে তার ব্যবসা। শৈলির জন্য টোপ ফেলা তার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্যেই। কিন্তু আজন্ম লালিত সংস্কার-

> "গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্তঃপুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুল পাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ"[১৫]

তাকে খানিকটা কাবু করে দেয়। শৈলিকে বাড়ি নিয়ে যাবার কথা ভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভ তার মূল্যবোধ নৈতিকতাকে ঢেকে দেয়। শৈলির ঘরে 'লোক আছে' শুনে তার 'মাথায় যেন আগুন ধরে' কিন্তু মন্দোদরীর বাড়িয়ে দেওয়া নোটের বান্ডিল নিয়ে গুণতে গুনতে- "মনে হল সে মন্ত্র-বলে ঠান্ডা হয়ে গেছে।"[১৬] যুদ্ধ-পরবতী বাংলা তথা সমগ্র ভারতে যে চুড়ান্ত মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটে এ যেন তারও ছবি। পিতা জেনে বুঝে সন্তানকে বিক্রি করছে, স্বামী বিক্রি করছে স্ত্রীকে। সবই পণ্য। জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম সামগ্রীর জন্য আবার কখনো স্রেফ লোভে ।

বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নৈতিকতা,আশা, স্বপ্ন এসবের ভেঙে যাওয়া মানুষকে অস্থির করে তুলেছে। মন যেন কোথাও বসতে চায় না; কোনো কাজে, কোনো জায়গায় কোনো ভাবেই যেন তৃপ্তি আসে না। এই অতৃপ্তি বোধের প্রতীক যেন 'লেভেল ক্রসিং' গল্পের নায়ক কেশব। সে ড্রাইভার শহরের, তার বাড়ি শহরতলিতে৷ বাড়িতে তার একান্ত আপন বলার মতো কেউ. নেই। তবু সে পায়ে হাঁটার কষ্টটুকু স্বীকার করে মালিকের বাড়ির সুখাদ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে থাকার আরামটুকু ছেড়ে রোজ শহরতলির ঘরে যায় রাত কাটাতে । রাত্রে শহরে থাকতে সে অস্বস্তিবোধ করে-

> "সেও এই ধোঁকাবাজিতে বিশ্বাস করে- সভ্য জগতের সভ্য জীবনের কোলাহল থেকে দূরে পালিয়ে শান্তি ও স্নিগ্ধতা খোঁজার ধোঁকাবাজিতে ।"[১৭]

সকাল হয়, শহরতলিতে রাত কাটানোর মোহটুকু কেটে যায়, কেটে যায় মায়ার আকর্ষণ-

> "সে অনুভব করে ভিতরে কি যেন প্রচন্ডভাবে চাপ দিচ্ছে, মনে হচ্ছে পাগলের মতো ছুটে চলে যায় লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে শহরের দিকে ।"[১৮]

শহরের কর্মব্যস্ততা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে বসে দূর থেকে ভেসে আসা ললনার গানের সুর তাকে টানতে থাকে।-

> "মায়ার গায়ে পড়া দরদ তার কাছে বিস্বাদ ঠেকে। কিন্তু রাত হলেই তাকে আবার ঠেলবে শহর ফিরে যাওয়ার জন্য শহরতলিতে- সেখানকার শান্ত নিরুত্তেজ জীবন, ল্যাম্পের আলো-আঁধারিতে মায়ার অদ্ভত রকম শান্ত আর মিষ্টি হাসি"[১৯]

তাকে টানবে। এই অস্থিরতাটুকু বোধকরি আধুনিকতার দান। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শশীর কথা যে শহরে প্রবাসী গ্রামে আগন্তুক । অবশ্যই শশী ও কেশবের সমস্যা বা মানসিক এই টানাপোড়েন এক নয় কিন্তু কোথাও যেন সংলগ্নতা থেকে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সময়ের দলিলীকরণ করতে চেয়েছিলেন তার লেখালেখিতে। আর চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি তুলে এনেছেন বিভিন্ন চরিত্র যাদের অবস্থিতি সমাজের বিভিন্ন পরিসরে। মানিক গ্রাম-জীবন কেন্দ্রিক গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন শহরের মজদুরদের নিয়ে, যেমন লিখেছেন মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গল্প, তেমনি রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ গল্পও লিখেছেন। পুনরুক্তির দোষটুকু স্বীকার করে নিয়েও মানিক তার সারাজীবনের লেখালেখির মধ্যে কখনও মার্কস আবার কখনও ফ্রয়েডীয় দর্শনের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করে গেছেন একাধারে উন্নত, বুদ্ধিসম্পন্ন জটিল ও জৈবিক মানুষকে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার, মধ্যাহ্ন থেকে সায়হ্নে: বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, দেজ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০২, পৃষ্ঠা: ৯৬
২. ভট্টাচার্য তপোধীর, উপন্যাসের সময় এবং মুশায়েরা, জানুয়ারী-১৯৯৯ বইমেলা-কলকাতা, পৃষ্ঠা: ২৩৪
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১১ খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ -২০১১, পৃষ্ঠা- ২৯৬
৪. ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, প্রবন্ধ সমগ্র, পৃষ্ঠা -১১২
৫. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, ২য় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তৃতীয় সংস্করণ- ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১৮৬
৬. তদেব: ১৯১
৭. মুখোপাধ্যায় কমল, শিলিন্দ্র- শারদীয়া ১৪১৪, পৃষ্ঠা: ১৯৮

৮. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ৬ খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১৬০
৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৬০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১১ খন্ড, প্রথম সংস্করণ: ২০০১, পৃষ্ঠা: ১৫০
১১. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২য় খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ: ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৩৫৯
১২. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৬৩
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৬৪
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পঞ্চম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১৭৯
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮০
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮৪
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ৯ম খন্ড, প্রথম সংস্করণ: ২০০১, পৃষ্ঠা: ৩৬
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ৪০
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ৪০

Guidelines for Submission to Atmadeep:

The Atmadeep is dedicated to publishing original works, including research papers, book reviews, article reviews, and abstracts of theses. Submission to this journal implies that the work has not been previously published elsewhere and is not under consideration for publication elsewhere.

Comprehensive Submission Guidance:

- Authors, researchers, and writers interested in submitting their papers are encouraged to do so online.
- Submissions should be in Bengali and formatted in Avro Keyboard, using Bensen and font size 14.
- The journal accepts submissions exclusively in the Bengali language.

Details to include:

- Title: Should be concise and informative.
- Authors' Names: Include names followed by designation, postal address (including email ID and phone number).
- Abstract: Abstracts should be in English and should not exceed 250 words.
- Bibliography: আচার্য দেবেশ কুমার, ব্যবহারিক বাংলা ও সাহিত্য গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞান, ইউনাটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৯-২০।
- Email: editor@atmadeep.in

Plagiarism:

Authors are urged to avoid plagiarism. Any detected instances of plagiarism will be the sole responsibility of the authors.

Review Process

- All the manuscript will be preliminary examined by the Editor-in-Chief and then forwarded to the Reviewers & other Editors of the Journal.
- The papers shall only be published after recommendation of the Reviewers & Associate Editors.
- Information regarding the selection or rejection of articles/papers will be only through Email.

- The journal shall publish the article/papers only after completion of the formalities mentioned in selection letter.
- The journal will also not take the responsibility of returning the rejected articles.

At every stage preceding publication, the editors of the journal shall have the right to make corrections (if needed) in articles/papers to suit the requirement of the journal.

N.B.: Papers will be accepted only when accompanied with abstract (to be written in English only). Submission of papers without abstract (in English) or mere submission of an abstract without the paper would lead to non-acceptance of the same.

Publication Ethics

Publication ethics are the principles and guidelines that govern the conduct of authors, reviewers, editors, and publishers in scholarly publishing. Ensuring ethical practices is crucial for maintaining the integrity and credibility of academic research. Here are some key aspects of publication ethics of our journal:

- **Authorship:** All authors should have made significant contributions to the research and agree to be listed as authors. Misrepresentation of authorship, such as ghost authorship or gift authorship, should be avoided.
- **Originality and Plagiarism:** Authors should ensure that their work is original and properly cited. Plagiarism, including self-plagiarism, is unethical and undermines the integrity of scholarly publishing.
- **Data Integrity:** Authors are responsible for the accuracy and integrity of their research data. Fabrication, falsification, and manipulation of data are serious ethical violations.
- **Conflict of Interest:** Authors should disclose any potential conflicts of interest that could influence their research or its interpretation. These may include financial interests, affiliations, or personal relationships that could bias the work.
- **Peer Review:** Peer review plays a critical role in ensuring the quality and validity of published research. Reviewers should

conduct their evaluations objectively and provide constructive feedback.

- **Editorial Independence:** Editors should make decisions based on the merits of the research and without influence from commercial interests, personal biases, or other undue pressures.
- **Publication Ethics Policies:** Journals should have clear and accessible policies on publication ethics, including instructions for authors, ethical guidelines for reviewers and editors, and procedures for handling ethical issues or misconduct.
- **Responsibility of Publishers:** Publishers have a responsibility to support and enforce ethical standards in scholarly publishing. This includes providing resources for editors and reviewers, promoting transparency, and addressing allegations of misconduct.

Publication Charge

The authors should note that there is no submission fee; however, there is a reasonable publication fee for each accepted article to meet the cost of manuscript handling, typesetting, office cum admin expenses, web-hosting charges, up-loading charges, internet expenses, website update and maintenance, electronic archiving and other recurring expenses. The publication fee is obligatory for publication.

- **Indian Authors:** The publication fee for single author per accepted paper is Rs. 1000.00 and Rs. 1200.00 for multiple authors.
- **Foreign Authors:** The publication fee of the accepted paper is $25 for single authored paper and $30 for multiple authored papers
- **Print copy:** Print Copy of the issue can be supplied on payment of Rs. 600.00 per copy. Annual subscription for the print copy is Rs. 3000.00 per Volume (inclusive of postal charges within India) Single print copy can be supplied outside India on payment of 25$ (inclusive international shipping charge) per copy.

আত্মদীপ

পরবর্তী সংখ্যা: ৩১ জানুয়ারী, ২০২৫

Email: editor@atmadeep.in

Novel Insights

A Peer-Reviewed Quarterly Multidisciplinary Research Journal

ISSN: 3048-6572 DOI Prefix: 10.69655

Website: https://www.novelinsights.in Email: editor@novelinsights.in

Publisher: Uttarsuri

Frequency: Quarterly Next Issue: February, 2025

ABOUT UTTARSURI

Uttarsuri is a registered society under the Societies Registration Act XXI of 1860, bearing registration number RS/KARIM/258/L/09 OF 2022-23 dated 30.04.2022, located in Karimganj, Assam, India. The society is also registered with NGO Darpan, bearing the unique ID VO/NGO AS/2022/0314757.

Uttarsuri Publication is a branch of the registered society Uttarsuri. It is registered with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises under registration number UDYAM-AS-18-0012611.

UTTARSURI

Published by:

UTTARSURI

Sribhumi (Karimganj), Assam, India

ISSN24541508